থিয়েটারে সৌমিত্র

মার্চ ২০১১

নাট্যকল্প—৩

পত্রিকাটি ধুলো খেলায় প্রকাশের জন্য

হার্ড কপি দিয়েছেন : অনির্বাণ দে

স্ক্যান ও এডিট করেছেন : সুজিত কুণ্ডু

একটি আবেদন

আপনাদের কাছে যদি এরকমই কোনো পুরোনো আকর্ষণীয় পত্রিকা থাকে এবং আপনিও যদি আমাদের মতো এই মহান অভিযানের শরীক হতে চান, অনুগ্রহ করে নিচে দেওয়া ই-মেইল মারফত যোগাযোগ করুন।

e-mail : optifmcybertron@gmail.com; dhulokhela@gmail.com

নাট্যকল্প—৩

থিয়েটারে সৌমিত্র (বিশেষ সংখ্যা)

কল্যাণী কলামণ্ডলম
কল্যাণী ৭৪১ ২৩৫, পশ্চিমবঙ্গ

Nāṭyakalpa–3: Soumitra in the Theatre (Special Issue)
(an Anglo-Bengali theatre magazine)

প্রকাশকাল: ২৭ মার্চ ২০১১/১২ চৈত্র ১৪১৭
(একান্নতম বিশ্ব-নাট্যদিবস)

প্রচ্ছদপরিকল্পক
শান্তনু দাস

প্রকাশক
সম্পাদক,
কল্যাণী কলামণ্ডলম
বি-৬/৯৮, কল্যাণী ৭৪১ ২৩৫,
নদিয়া, পশ্চিমবঙ্গ

পরিবেশক
নব গ্রন্থ কুটির
●
ওয়ার্ল্ড ভিউ
(যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় শাখা)
●
পাতিরাম বুক স্টল

বর্ণসংস্থাপক
এ এম কম্পিউটার প্রিন্ট্স
বি-১৭/৮১, কল্যাণী ৭৪১ ২৩৫

মুদ্রক
গীতা প্রিন্টার্স
৫১এ ঝামাপুকুর লেন, কলকাতা ৭০০ ০০৯

সম্পাদক
অনির্বাণ দে

মূল্য: একশো কুড়ি টাকা (ভারতে)/একশো সত্তর টাকা (বাংলাদেশে)

সূচিপত্র

প্রকাশকের নিবেদন ৫
সম্পাদকের কৈফিয়ত ৬
ঋণস্বীকার ৮

● নাটুয়ার মুখোমুখি ●

সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে আড্ডা ১১

● নাট্যভাবনা ●

গ্রুপ থিয়েটার ও সাধারণ রঙ্গালয় সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় ৩৭
অভিনয় ও সংগীত সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় ৩৯
অভিনয়: চলচ্চিত্রে ও মঞ্চে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় ৪৫

● নট সৌমিত্র: অতীতের চোখে ●

সৌমিত্রের নাম জীবন উৎপল দত্ত ৫১
নাটকীয় সৌমিত্র তাপস সেন ৫৬
সৌহার্দ্যে, কৌতুকে এবং সংগ্রামে দিলীপ রায় ৬১

● নট সৌমিত্র: বর্তমানের চোখে ●

নাম জীবন *থেকে আত্মকথা: দীর্ঘদিনের এক 'মিতা'-র কথা* লিলি চক্রবর্ত্তী ৭১
প্রাণতপস্বী দ্বিজেন বন্দ্যোপাধ্যায় ৭৫
স্মৃতিরঙ্গে সৌমিত্র শ্যামল ঘোষ ৮৩
সৌমিত্রবাবু: ধৈর্য, নিষ্ঠা ও অধ্যবসায়ের এক আশ্চর্য মিশেল মাধবী মুখার্জী ৯৬
সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়: আমার নাট্যগুরু কৌশিক সেন ৯৯
Man of Many Seasons Ashok Mukhopadhyay ১০৪
এক অসাধারণ নাট্যনির্মাতা মেঘনাদ ভট্টাচার্য ১০৬
অভিনয়ের জাদুকর সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় সুরেশ দত্ত ১১৩
নাট্যমঞ্চ ও চলচ্চিত্রে অপ্রতিদ্বন্দ্বী স্রষ্টা নায়ক সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় নৃপেন্দ্র সাহা ১১৯
জীবন নিয়ে শিল্প: তৃতীয় অঙ্ক, অতএব সৌমিত্র বসু ১২৫
সৌমিত্রকাকুকে যেমন দেখেছি সন্দীপ রায় ১৩০
স্যার অশোক দাশগুপ্ত ১৩৭
অসীমের মাঝেও সীমা: আমার দেখা সৌমিত্রদা জগন্নাথ বসু ১৪০
অভিনয়ের অন্তরে অরুণেন্দ্র মুখোপাধ্যায় ১৪৪
আমার দেখা শেষ ধ্রুপদি অভিনেতা রজতাভ দত্ত ১৫৩
পেশাদার থিয়েটারের আঙিনায় সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় দেবাশিস রায় চৌধুরী ১৬০

নাট্যকল্প-৩

আমার সৌমিত্র-দর্শন সিদ্ধার্থ চক্রবর্ত্তী ১৭৪
রাজকুমারের গল্প অতনু বর্মন ১৮১
বাংলা পেশাদার মঞ্চের এক অভিমন্যু দানী কর্মকার ১৮৬

● মানুষ সৌমিত্র: ঘরের চোখে ●

সেইসব দিন সম্বিৎকুমার চট্টোপাধ্যায় ১৯৩
সত্যিসত্যিই আজ আমি 'খুবই খুশি' অনুরাধা সিনহা ১৯৬
আমার পুল্‌দা অভিজিৎ চট্টোপাধ্যায় ২০১
বাপি সৌগত চট্টোপাধ্যায় ২০৩
আমার বাপি, আমার পরিচালক পৌলমী বোস ২০৫

● মানুষ সৌমিত্র: বাইরের চোখে ●

পাদপূরণ সুভাষ মুখোপাধ্যায় ২১১
সৌমিত্র ও আমি: বন্ধুত্বের অর্ধশতক পেরিয়ে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ২১৩
আমহার্স্ট স্ট্রিট থেকে গৌরমোহন মুখোপাধ্যায় ২১৬
মনে হয় যেন সেদিনের কথা অদ্রীশ বর্ধন ২২২

● সৌমিত্র-চিত্র ●

পারিবারিক অ্যালবাম ২২৫
নাটকের অ্যালবাম ২২৬

● সৌমিত্র-তথ্য ●

চট্টোপাধ্যায় পরিবারের বংশপঞ্জি ২৩৩
সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের একটি প্রায়-সম্পূর্ণ নাট্যপঞ্জি অনির্বাণ দে ২৩৫

নাট্য-পত্র ২৪৮
নাট্যকল্প পত্রিকায় ব্যবহৃত শব্দাবলির বানানরীতি এবং অন্যান্য ব্যবহারবিধি ২৪৯

প্রকাশকের নিবেদন

আজ থেকে পনেরো বছর আগে, ৯ জুন ১৯৯৫ তারিখে, সালে কিছু উদ্যমী যুবক-যুবতী তাদের আবেগ ও ভালোবাসা নিয়ে আত্মপ্রকাশ করে কল্যাণী কলামণ্ডলম নামে। কোনো উপরওয়ালার নির্দেশ বা কোনো সুপরিকল্পিত ভাবনা দ্বারা তৈরি হয়নি সেদিনের কলামণ্ডলম। আমাদের প্রধান ভাবনা ও উদ্দেশ্য নাট্যকলার শিক্ষা এবং তার মধ্যে বিচরণ। আমাদের কাজের পদ্ধতি হল—উদ্যম না-হারিয়ে পরিশ্রমী কাজের চেষ্টা করে যাওয়া। আমাদের একমাত্র লক্ষ্য নাট্যকলার ভাষাসৃষ্টির মাধ্যমে নিজেদের মনের ভাব সমাজের সম্মুখে উপস্থিত করা। সংস্কৃতিচর্চার মধ্য দিয়ে নিজেদের চিন্তা, চেতনা ও মননের উন্নতির সঙ্গেসঙ্গে সমাজপরিবর্তনের চেষ্টা আমরা করব।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মের সার্ধশতবর্ষে আমাদের নতুন প্রযোজনা ঘরে-বাইরে। আমাদের বিগত প্রযোজনাগুলি হল—*এবং ইন্দ্রজিৎ*, *ঢোঁড়াই চরিত মানস*, *সওদাগরী আইন*, *রোমিও জেনেট*, *মলুয়া সুন্দরীর পালা*, *মানু(ষ)ষী*, *পাগলীর ডাঙা* ও *অয়দিপাউস তুরান্নস*। বড়োদের নাটকের পাশাপাশি আজ আমরা ছোটোদের নিয়েও নাট্যচর্চায় নিয়োজিত। তারই সূত্রে বিগত ছ-বছর ধরে আমরা শিশু-কিশোর নাট্যকর্মশালা ও নাট্যোৎসব সংগঠিত করে চলেছি। নতুন সংযোজনা শ্রুতি-অঙ্গন বিভাগ। তার কাজ অদূর ভবিষ্যতে আরও বিকশিত হবে—এই আমাদের আশা।

আমাদের নাট্যপত্রিকা *নাট্যকল্প* ২০০৫ থেকে প্রকাশিত হয়ে চলেছে। এই ছ-বছরে আমরা এ পর্যন্ত দুটি সংখ্যা প্রকাশ করতে সমর্থ হয়েছি। তৃতীয় সংখ্যাটি এবার প্রকাশিত হচ্ছে একটি বিশেষ সংখ্যা হিসাবে। এই সংখ্যার বিষয় 'থিয়েটারে সৌমিত্র'। নাট্যব্যক্তিত্বরূপে অভিনেতা সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের অবদান বিস্তারিতভাবে খরা থাকল এতে।

সাহস আর পরিশ্রমকে পাথেয় করে আমাদের পথচলা। লক্ষ্য অনেক দূরে, জানি না কতদূর এলাম। আমরা দায়বদ্ধ; আমাদের কাজের ভালোমন্দ-বিচারের ভার আপনাদের হাতে।

শান্তনু দাস
সম্পাদক ও নির্দেশক,
কল্যাণী কলামণ্ডলম

সম্পাদকের কৈফিয়ত

অবশেষে *নাট্যকল্প*–৩ প্রকাশিত হল। একটি সংগ্রহযোগ্য বিশেষ সংখ্যা হিসাবে এটি অগণিত বইপ্রেমী, নাট্যপ্রেমী ও গবেষকদের গ্রন্থাগারের আলমারিতে স্থান পাবে—এই দুঃসাহসী স্বপ্ন নিয়েই কল্যাণী কলামণ্ডলম পরিবারের গর্বের মুখপত্রের তৃতীয় সংখ্যাটি পৃথিবীর আলো দেখল। আমাদের স্বপ্ন বাস্তবায়িত হলে পনেরো বছরের কিশোর এই নাট্যদল ক্রমশ পরিণত যৌবনের দিকে এগিয়ে যাবে—এও আমাদের আশা।

বিশেষ সংখ্যা যখন, তখন বিষয়টিকেও নিশ্চয়ই বিশেষ হতে হবে! তা বইকি, এই বিশেষ সংখ্যার বিষয় একজন বিশেষ মানুষের জীবন ও কর্ম। মানুষটি আমাদের অতিপ্রিয়। তিনি সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়।

কিন্তু মানুষটি তো তাঁর নামের চেয়েও দীর্ঘকায়—কি শরীরে, কি মননে, কি প্রতিভায়, কি অভিজ্ঞতায়! কোনো রাখঢাক না-করে নির্দ্বিধায় এ কথাও বলে ফেলতে পারি যে, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও সত্যজিৎ রায়ের পর প্রতিভার বহুমুখিতার বিচারে সেরা বাঙালির নাম সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়। এ শুধু আবেগের কথা নয়, ছিয়াত্তর বছরের এই 'তরুণ' মানুষটি প্রতিমুহূর্তে নতুন-নতুন রূপে এ কথার প্রমাণ দিয়ে চলেছেন—সমস্ত প্রতিদ্বন্দ্বিতা, বিতর্ক আর উপেক্ষাকে দূরে ঠেলে দিয়েই।

হ্যাঁ, যে-কথা বলছিলাম—এই বিশাল আকাশছোঁয়া মহীরূহের সমস্ত শাখাপ্রশাখার নাগাল পাওয়া তো এই ক্ষুদ্র পরিসরের অণুপত্রিকার সাধ্য নয়! তাই যে-শাখাটি শক্ত ভিত্তিরূপে দাঁড়িয়ে থেকে এই তরুবরের বাকি ডালপালা ও ফুলফলের বিস্তারণে সাহায্য করেও সবচেয়ে বেশি উপেক্ষিত, তাঁর সেই নাট্যজীবনই *নাট্যকল্প* পত্রিকার এই সংখ্যার বিষয়। চলচ্চিত্রতারকা সৌমিত্র নিয়ে চর্চা, উত্তমকুমার বনাম সৌমিত্র, ইত্যাদি তো অনেক হল! এবার আমরা তাই নাট্যব্যক্তিত্ব সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের জীবন ও কর্ম নিয়ে গভীর অনুসন্ধানে ব্রতী হয়েছি। নাট্যপত্রিকা হিসাবে এটুকুই আমাদের অধিকার, সেইসঙ্গে দায়িত্বও।

নাট্যকল্প–২-এর দীর্ঘ সম্পাদকীয় লিখে ফেলার পর কথা দিয়েছিলাম যে, পরের সংখ্যায় কথা বাড়িয়ে আর পাঠকদের বিরক্তি উৎপাদন করব না। সে-কথা অবশ্যই রাখব। তবে কথার রাশ টানার আগেই একটা বেদনাদায়ক সংবাদ এল। এ-বেদনা যতটা নাট্যামোদী পাঠককুলের, বোধহয় তার চেয়েও বেশি ব্যক্তিগতভাবে এই পত্রিকা-সম্পাদকের এবং দলগতভাবে কল্যাণী কলামণ্ডলমের। এ শুধু স্বজন-হারানোর শোক নয়, এ-বেদনা অপ্রাপ্তিরও—এক অপূর্ণ আকাঙ্ক্ষার বেদনা। দিলীপদা, আপনি এত খুশি হয়ে কথা দিলেন, এত বড়ো মুখ করে আমরা সবাইকে বলে বেড়ালাম; অথচ আপনি কথা রাখলেন না!

আমাদের নাট্যকর্মী জয়ন্ত চৌধুরী যখন বিখ্যাত অভিনেতা ও নির্দেশক দিলীপ রায়ের সঙ্গে টেলিফোনে যোগাযোগ করেছিলেন তখন দিলীপদা বলেছিলেন, "তোমাদের এতদূরে কষ্ট করে আসতে হবে না লেখা নিতে। আমি নিজে কল্যাণীতে কিছুদিনের জন্য থাকব, আর ওখানে বসেই লিখব সৌমিত্রকে নিয়ে। কল্যাণী শহরের মনোরম পরিবেশ আমার বেশ লাগে।" এর এক সপ্তাহের

মধ্যেই দুঃসংবাদটা নিজেই দিলেন দিলীপদা—তাঁর ফুসফুসে কর্কট বাসা বেঁধেছে! তাঁর এক-দেড় মাসের বিশ্রামের পর জয়ন্তদা আমাকে জানালেন, "উনি একটু সুস্থ হয়েছেন। কিন্তু লিখতে পারবেন না এখন। তাই তোমাকেই একটা দিন ঠিক করে যেতে হবে ওঁর কাছে। উনি মুখে বলবেন। তুমি অনুলিখন করে নিয়ো।" সেইমতো পনেরোই অগস্টের ছুটিতে সকালে তাঁর বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা দিয়ে কলকাতা পৌঁছেও গেলাম। কিন্তু ভগ্নদূত হিসাবে জয়ন্তদা আবার আমাকে খবর দিলেন, "দিলীপদা আজকেই hospitalised হয়েছেন। উনি নিজেই আমাকে বললেন, আজ নয়। একটু সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরলে তখন যেতে হবে।"

কিন্তু দিলীপদা আর হাসপাতাল থেকে বাড়ি ফেরেননি। দোসরা সেপ্টেম্বর চলে গেলেন। সেদিন সান্ধ্য মহলায় এই দুঃসংবাদটাও দিলেন জয়ন্তদাই। আমাদের জন্য কিছু না-লিখতে পারলেও এই পত্রিকায় তাঁর লেখা না-বেরোলে তাঁর ও আমাদের সাধ যে অপূর্ণ রয়ে যাবে! তাই অনুজপ্রতিম অভিনেতা সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় সম্পর্কে দিলীপ রায়–রচিত পুরোনো একটা লেখার পুনর্মুদ্রণ করা হল এই সংখ্যায়।

প্রয়াত উৎপল দত্ত, তাপস সেন ও সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের লেখাও পুনর্মুদ্রণ করা ছাড়া উপায়ান্তর ছিল না। এ ছাড়া *আজকাল*-সম্পাদক অশোক দাশগুপ্ত নিজের ব্যস্ততার কারণেই তাঁর একটি পুরোনো লেখা পাঠিয়ে দিয়েছেন আমাদের কাছে। অবশ্য সিংহভাগ লেখাই নতুন। তবে লেখকেরা তাঁদের নিজেদের কাজের ক্ষেত্রে এতটাই ব্যস্ত যে, কেউ-কেউ নিজের হাতে লেখার সময় না-দিতে পেরে বাধ্য হয়েছেন সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে অনুলিখন লেখাতে। এত ব্যস্ততা সত্ত্বেও এই বিদগ্ধ মানুষদের সহযোগিতায় আমরা মুগ্ধ হয়েছি। প্রায় সমস্ত লেখাই সৌমিত্রবাবুর নাট্যজীবনসংক্রান্ত। তবে আলোচনার প্রয়োজনে কোনো-কোনো ক্ষেত্রে অনিবার্যভাবেই তাঁর চলচ্চিত্রাভিনয়, সাহিত্যসাধনা, সংগীতচর্চা, ইত্যাদি অন্যান্য প্রতিভার কথাও এসে পড়েছে। আবার, তাঁর পারিবারিক সদস্য ও বন্ধুদের স্মৃতিচারণমূলক লেখায় ব্যক্তিগত কথাই বেশি এসেছে। তবে এগুলোর কোনোটাই সৌমিত্রবাবুর নাট্যজীবনের অনুসন্ধানে অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়েনি, বরং তারা সেই অনুসন্ধানে পাঠককে বাড়তি উৎসাহ জোগাবে।

বহু মানুষ নানাভাবে এই পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত হয়ে আমাদের কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন। তাঁদের ধন্যবাদ দিয়ে দূরের মানুষ করে দিতে চাই না। যথাস্থানে তাঁদের নাম উল্লিখিত হয়েছে। তবে মিটিলদি (সৌমিত্রবাবুর সুযোগ্যা কন্যা পৌলমী বোস) ও দ্বিজেনদা (অভিনেতা দ্বিজেন বন্দ্যোপাধ্যায়) না-থাকলে এই বিশেষ সংখ্যার কাজ শুরুতেই থমকে যেত—এ কথা বলাই বাহুল্য। জয়ন্তদার কথা তো আগেই বলেছি। তবে তিনি শুধু ভগ্নদূতের কাজই করেছেন এমন ভাবলে তাঁর প্রতি অন্যায় করা হবে। আর আমাদের দলের সম্পাদক (secretary) ও নির্দেশক (director) শান্তনু দাস উৎসাহ, তাগাদা ও পরামর্শ না-দিলে এই সংখ্যার প্রকাশই অসম্ভব হয়ে যেত।

অনির্বাণ দে

ঋণস্বীকার

- যেসমস্ত স্বনামধন্য বিদগ্ধ মানুষ তাঁদের অমূল্য সময় ব্যয় করে আমাদের এই অনামি নাট্যপত্রিকার পাঠকদের জন্য নির্দ্বিধায় তাঁদের সুচিন্তিত ও সুখপাঠ্য রচনা উপহার দিয়েছেন, সেইসমস্ত লেখকের কাছে আমরা চিরকৃতজ্ঞ। যাঁরা ব্যস্ততার কারণে নতুন কিছু লিখে উঠতে না-পারলেও পুরোনো লেখা পুনঃপ্রকাশের অনুমতি দিয়েছেন এবং যাঁরা ব্যক্তিগত আলাপচারিতার সময় বের করে তাঁদের বক্তব্য অনুলিখন করার সুযোগ করে দিয়েছেন, তাঁদের কাছেও আমরা অশেষভাবে ঋণী।

  বিভিন্ন সময়ে বহু গুরুত্বপূর্ণ প্রামাণিক নথি, দুর্লভ আলোকচিত্র, দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ ও পত্রপত্রিকা, অজানা তথ্য, প্রয়োজনীয় অনুমতি এবং মূল্যবান পরামর্শ দিয়ে যেসব মানুষ ব্যক্তিগতভাবে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়ে পত্রিকার এই সংখ্যাকে সমৃদ্ধ করেছেন, তাঁদের নাম নীচে উল্লেখ করা হল:

  আশালতা দেবী
  অনুরাধা সিনহা
  অভিজিৎ চট্টোপাধ্যায়
  মঞ্জুশ্রী চট্টোপাধ্যায়
  পৌলমী বোস
  তুহিন কুমার রায়
  অশোক পালিত
  লিলি চক্রবর্ত্তী
  সন্দীপ রায়
  কৌশিক ঘোষ
  অরুণেন্দ্র মুখোপাধ্যায়
  দেবাশিস মুখোপাধ্যায়
  অরূপ মুখোপাধ্যায়
  শোভা সেন
  জয়ন্তী সেন
  জয় সেন
  সুমিতা বন্দ্যোপাধ্যায়
  অনসূয়া রায় চৌধুরী
  রঞ্জন মিত্র
  আত্রেয়ী ঘোষ
  অম্বর মিত্র
  শঙ্কর ভৌমিক
  বন্ধু প্রসাদ

- নিম্নলিখিত পত্রপত্রিকা ও প্রতিষ্ঠান প্রয়োজনীয় ছাড়পত্র দিয়ে আমাদের ধন্যবাদর্হ হয়েছেন:

  আজকাল
  এপিক থিয়েটার
  সপ্তর্ষি প্রকাশন
  GBC Enterprise
  প্রতিভাস
  সৃষ্টি প্রকাশন
  করুণা প্রকাশন
  Society for the Preservation of Satyajit Ray Films ('Ray Society')

- যাঁদের সহযোগিতা ছাড়া এই পত্রিকাটিকে সুলভ মূল্যে পাঠকের হাতে পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হত না, সেই বিজ্ঞাপনদাতাদের আমরা ধন্যবাদ ও অভিনন্দন জানাই।

নাটুয়ার মুখোমুখি

সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে আড্ডা

৪ জুলাই ২০১০। কল্যাণী থেকে *নাট্যকল্প* পত্রিকার তরফে আমরা পৌঁছে গেলাম গল্ফ গ্রিন আর্বান কমপ্লেক্সে। এটাই তাঁর পাড়া। তিনি আমাদের সময় দিয়েছেন ঠিক বিকেল তিনটেয়। পাছে দেরি হয়ে যায়, তাই কোনো ঝুঁকি না-নিয়ে আমরা দুপুর দেড়টার মধ্যেই উপস্থিত তাঁর পাড়ায়। মনের মধ্যে একটা উত্তেজনা তো ছিলই—আনন্দ আর উদ্‌বেগের। বাড়ি খুঁজে নিতে পাঁচ মিনিটও লাগল না। কিন্তু এত আগে তো তাঁকে বিরক্ত করা চলবে না। অথচ প্রচণ্ড গরমে একটু ছায়া তো চাই? সেটাও পাওয়া গেল তাঁর বাড়ির দশ হাতের মধ্যেই। তখন বিশ্বকাপ ফুটবলের উন্মাদনায় কাঁপছে কলকাতা। পাড়ায়-পাড়ায় ব্রাজিল বনাম আর্জেন্তিনার লড়াই চলছে। তার মধ্যেই আশ্রয় পেলাম গল্ফ গ্রিনের 'মারাদোনা ফ্যান ক্লাব'-এর সুসজ্জিত শিবিরে। দেখতে দেখতে ঘড়ির কাঁটা যখন প্রায় তিনটে ছুঁতে চলেছে, আমরা হাজির হলাম তাঁর বাড়ির দোরগোড়ায়। দারোয়ান সাহেবকে দিয়ে খবর পাঠানো হল অন্দরমহলে। ঠিক তিনটেয় নিজের হাতে দরজা খুললেন আমাদের স্বপ্নের রাজকুমার সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়। বললেন—"আসুন। ভেতরে এসে বসুন।" তাঁর সুসজ্জিত ড্রইং রুমে প্রবেশ করলাম আমরা। পরিচয়পর্বের পরই সাক্ষাৎকার শুরু করব আমরা। আমাদের অনির্বাণ বসল তাঁর বাঁদিকের সোফায় (কারণ তিনি নিজেই বললেন, ডান কানে তাঁর শুনতে বেশ অসুবিধে হয়), আর ক্যামেরা হাতে বিশ্বজিৎ বসল তাঁর মুখোমুখি বড়ো সোফাটায়। কিন্তু এ যে আর নিছক সাক্ষাৎকার রইল না, আমরা পেলাম অকপট এক আড্ডাবাজ মানুষকে—যিনি নিজের হাসি-বিরক্তি-ক্ষোভ লুকোতে জানেন না! পুরো আড্ডাটা ক্যামেরাবন্দি করল বিশ্বজিৎ। লিখিত অবস্থায় সেই আড্ডাই আজ 'নাট্যকল্পক'দের চোখের সামনে।

অনির্বাণ : আমরা নদিয়া জেলার একটি নাট্যদল। আপনিও তো আদতে নদিয়া জেলারই মানুষ?

সৌমিত্রবাবু : হ্যাঁ, আমাদের আদিবাড়িটা নদিয়া জেলার কৃষ্ণনগরে।

অনির্বাণ : ওখানেই তো বড়ো হয়েছেন?

সৌমিত্রবাবু : না, ওইখানেই সবটা বড়ো হইনি। বাবা বদলির চাকরি নিয়েছিলেন; ফলে অনেক জায়গায় ঘুরতে হয়েছে আমাদের।

অনির্বাণ : কোন্ বয়স অবধি আপনারা নদিয়ায় ছিলেন?

সৌমিত্রবাবু : *(একটু ভেবে)* প্রায় দশ বছর বয়স অবধি।

অনির্বাণ : আচ্ছা, নদিয়া জেলার কৃষ্ণনগরের সেই ছোট্ট পুলু—আপনার ডাকনাম তো পুলু—আর এখনকার কলকাতাবাসী এত বড়ো অভিনেতা সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়—দুজনের মধ্যে কোনো ফারাক আছে কি? মানে, মানুষ হিসেবে?

সৌমিত্রবাবু : না, একেবারেই নেই। কী-করে থাকবে? *(একটু হেসে)* একই তো লোক!

অনির্বাণ : ঠিক, থাকার কথাও নয়। আচ্ছা, আপনারা যখন কৃষ্ণনগরে থাকতেন তখন আপনার স্কুলজীবনের কোনো বিশেষ ঘটনা আছে যেটা আপনার

মনে পড়ে? সেটা মজার হতে পারে, বা মনে রাখার মতো হতে পারে।

সৌমিত্রবাবু : না, তেমন কিছু মনে পড়ে না। আর ইশকুলে—মানে কৃষ্ণনগরে যদ্দিন ছিলাম—তখন তো খুবই ছোটো ছিলাম!

অনির্বাণ : স্কুলের কোনো ঘটনা সেরকমভাবে কিছু মনে নেই? বন্ধুদের কথা?

সৌমিত্রবাবু : *(চা খেতে খেতে একটু ভেবে নিয়ে)* স্কুলের কিছু ঘটনা মনে নেই। আমার এইটুকুই মনে আছে, ক্লাস ফাইভ অব্দি আমাদের কো-এডুকেশন ছিল।

অনির্বাণ : আচ্ছা।

সৌমিত্রবাবু : *(একটু থেমে)* মেয়েবন্ধু ছিল অনেক—এটুকুই মনে আছে। আর খেলাধুলো করতাম—

অনির্বাণ : তখনকার কোনো বন্ধুর সঙ্গেও আর যোগ নেই বোধহয়? মানে, সেই ছোটোবেলার?

সৌমিত্রবাবু : এখন আদ্দেক বন্ধু নেই-ই! আর যারা আছে, অনেকদিনই তাদের সঙ্গে যোগ নেই। আমি তো দশ বছরের পরে ওখান থেকে বেরিয়ে পড়েছি, না?

অনির্বাণ : আচ্ছা, তারপরে কোথায় গেলেন ওখান থেকে?

সৌমিত্রবাবু : তারপরে প্রথমে বারাসত, তারপরে হাওড়া, হাওড়া থেকে দার্জিলিং, দার্জিলিং থেকে আবার অল্প কিছুদিনের জন্যে— ছ-আট মাসের জন্যে— কৃষ্ণনগর, তারপর আবার হাওড়া। হাওড়া থেকেই ম্যাট্রিকুলেশন পাস করেছিলাম।

অনির্বাণ : আমি যদ্দূর জানি, আপনার সাত বছর যখন বয়স—চৌত্রিশ সালে বোধহয় আপনার জন্ম?

সৌমিত্রবাবু : *(মাথা নেড়ে)* পঁয়ত্রিশ।

অনির্বাণ : পঁয়ত্রিশ, না? আচ্ছা। তাহলে আপনার ছ-বছর বয়সে রবীন্দ্রনাথের মৃত্যু হয়েছিল। আপনার কি সেই সময়টা মনে আছে? মানে, রবীন্দ্রনাথ চলে গেলেন—তখন আপনার কোনো বিশেষ অনুভূতি?

সৌমিত্রবাবু : না, সেরকম কিছু মনে নেই। তবে রবীন্দ্রনাথ মারা যাবার পরের দিন যা দেখেছিলাম সে তো আমার লেখাতেই আছে! *প্রতিদিন তব গাথা* বলে আমার যে-বইটা আছে তাতে রবীন্দ্রনাথের বিষয়ে লেখা আছে।

অনির্বাণ : আর-একটা জিনিস আমি শুনেছি যে, আপনার ঠাকুরদার সঙ্গে

ঠাকুরবাড়ির কোনোরকম যোগ ছিল—

সৌমিত্রবাবু : ঠাকুরবাড়ির কিছু না, উনি ঠাকুর এস্টেটের উকিল ছিলেন।

অনির্বাণ : মানে সেটা কোথাকার? কোন্ অঞ্চলের?

সৌমিত্রবাবু : ঠাকুর এস্টেট মানে বিশেষ করে শিলাইদহে।

অনির্বাণ : মানে বাংলাদেশে?

সৌমিত্রবাবু : তখন তো আর বাংলাদেশ ছিল না!

অনির্বাণ : হ্যাঁ, তখন তো অবিভক্ত বাংলা।

সৌমিত্রবাবু : তখন ওটা আমাদের নদিয়া ডিস্ট্রিক্টেই ছিল।

অনির্বাণ : দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, পঞ্চাশের মন্বন্তর, তারপরে হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা—এরকম অনেক খারাপ অভিজ্ঞতা আপনার জীবন দিয়ে গেছে, মানে এগুলো দেখেছেন আপনি। আপনার বড়ো-হওয়াটা এই সময়ের ভেতর দিয়েই। পরবর্তীকালে আপনার জীবনকে—অভিনয়জীবনকেই বলুন বা জীবনযাত্রাকে—কোনোভাবে কি প্রভাবিত করেছে কিংবা ধাক্কা দিয়েছে এই ব্যাপারগুলো?

সৌমিত্রবাবু : জীবনযাত্রাকে প্রভাবিত করেছে বলে আমি বুঝতে পারব না, বলতেও পারব না সেইজন্যেই। কিন্তু এগুলো সব আমার স্মৃতিতে রয়েছে। তার থেকে আমার understanding of life, understanding of our country তৈরি হয়েছে—এটুকুই বলতে পারি।

অনির্বাণ : তা এগুলো আপনার শৈল্পিক সত্তায় কোনোরকম প্রভাব ফেলেনি কি? নিশ্চয়ই ফেলেছে?

সৌমিত্রবাবু : সেগুলো তো আর আমি বলতে পারব না! *(একটু হেসে)* অন্য লোকেরা বুঝতে পারবে।

অনির্বাণ : আর-একটা জিনিস শুনেছি যে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর যখন ব্রিটিশরা আনন্দোৎসব করছিল, আপনি ইউনিয়ন জ্যাক পুড়িয়ে ফেলেছিলেন! সত্যিই এরকম কিছু ব্যাপার ঘটেছিল?

সৌমিত্রবাবু : হ্যাঁ, সে তো ইশকুলে—তবে *(একটু বিরক্ত হয়ে)* সেটা তো খুবই সামান্য ঘটনা! সেটার দ্বারা আপনারা কী প্রমাণ করতে চাইছেন?

অনির্বাণ না না, কিছু প্রমাণটমান নয়। Just জানবার জন্যই—

সৌমিত্রবাবু : না না, কী জানতে চাইছেন তার থেকে?

অনির্বাণ : সেই ঘটনাটা যদি একটু বিশদে বলেন যে, কীভাবে কী হয়েছিল।

সৌমিত্রবাবু : কিছু মনে নেই। *(একটু হেসে)* উনিশশো পঁয়তাল্লিশ সালের ঘটনা এখন মনে থাকার কথা নয়।

বি. ও অ. : *(হেসে)* তা অবশ্য ঠিক।

সৌমিত্রবাবু : কীভাবে কী মনে নেই। তা ছাড়া ওটাকে যদি দেশপ্রেমের সঙ্গে যুক্ত করে ভাবেন, ওর থেকে অনেক বেশি অন্যান্য কাজ আমাদের বাড়িতে হয়েছে। আমাদের পরিবারেই আমার বাবা জেল খেটেছেন, দাদু জেল খেটেছেন। সুতরাং *(হেসে)* ওটা কোনো ঘটনাই নয়।

বিশ্বজিৎ : এমনিতেই স্যারের কাজকর্মের মধ্যে একটা দেশপ্রেমের বার্তা থাকেই।

অনির্বাণ : আর-একটা কথা আপনি বলেছেন। সেই শিখ সৈনিকের ঘটনা, যা আপনাকে 'বাঙালি' থেকে 'ভারতীয়' করে তুলেছিল—

সৌমিত্রবাবু : বলেছি মানে, আমার নতুন নাটক থেকে আপনারা ওগুলো পেয়েছেন।

অনির্বাণ : হ্যাঁ, ওখানেই পেয়েছি।

সৌমিত্রবাবু : *(হেসে)* তাহলে আর ওগুলো আমাকে জিজ্ঞেস করছেন কেন?

অনির্বাণ : *(হেসে)* জিজ্ঞেস করছি elaborately ওগুলো বলবার জন্য।

সৌমিত্রবাবু : না, আর elaborately কিছু বলার নেই, ওইটুকুই।

অনির্বাণ : আচ্ছা, তাহলে নতুন একটা কথা বলি—আপনার সঙ্গে নাট্যাচার্য শিশির ভাদুড়ীর যোগ ছিল। আপনি তো ওঁর সঙ্গে কাজ করেছেন? তাঁর বিষয়ে যদি কিছু কথা বলেন। মানে, আপনার অভিজ্ঞতা।

সৌমিত্রবাবু : শিশির ভাদুড়ীর সঙ্গে আমার তিন বছরের যোগ ছিল। যেদিন তাঁর থিয়েটার বন্ধ হয়ে যায় সেইদিন তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয়ের সুযোগ আসে। অভিনেত্রী শেফালিকা 'পুতুল' তাঁর কাছে নিয়ে গিয়ে আমায় পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন। সেই তখন থেকে তাঁর মৃত্যু অব্দি—এই শেষ তিন বছর আমি তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে পেরেছিলাম। আমার বেশিরভাগ অভিনয়সংক্রান্ত বা থিয়েটারসংক্রান্ত ধ্যানধারণার প্রাথমিক ভিত্তিটাই গঠিত হয়েছিল ওঁর সংস্পর্শে এসে, বা ওঁর থিয়েটার দেখে। এবং আমার নিজের চোখে যত অভিনয় আমি দেখেছি দেশে-বিদেশে, ওঁর মতো অভিনেতা আমি আজ পর্যন্ত দেখিনি।

অনির্বাণ : ওঁর কোনো নাটকে—

সৌমিত্রবাবু : *(থামিয়ে দিয়ে)* ওঁর মতো অভিনেতা আমি আজ অব্দি দেখিনি বলতে, কোথাও দেখিনি। আমি ওঁর দুজন ছাত্রের কথা বলতে পারি যাঁদের

ভেতরে আমি বড়ো অভিনেতা কাকে বলে দেখেছি। তাঁরা দুজনেই ওঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু এবং ছাত্র।

অনির্বাণ : কারা?

সৌমিত্রবাবু : যোগেশ চৌধুরী এবং মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য।

বিশ্বজিৎ : স্যার, তাহলে কি শ্রেষ্ঠ বাঙালি অভিনেতা বলতে আপনি শিশির ভাদুড়ীকেই বলবেন?

সৌমিত্রবাবু : *(তীব্র প্রতিবাদ করে)* না, সেটা আমি কী-করে বলব? তাঁর আগের অভিনেতাদের তো আমি দেখিনি! আমি আমার দেখা মানুষদের কথা বলছি, মানে আমি যাঁদের চোখে দেখেছি।

অনির্বাণ : শুধু বাঙালি নয়, আপনি নিশ্চয়ই সবার কথাই বলছেন?

সৌমিত্রবাবু : হ্যাঁ।

বিশ্বজিৎ : তার মানে, স্যারের-দেখা ভারতীয় অভিনেতা যাঁরা আছেন তাঁদের মধ্যে তিনি best। তাই তো, স্যার?

সৌমিত্রবাবু : না না, ভারতীয়টারতীয় বলছি না, আমি যাঁদের চোখে দেখেছি।

অনির্বাণ : *(বিশ্বজিৎকে)* অন্য দেশের অভিনেতাদেরও তো দেখেছেন!

সৌমিত্রবাবু : হ্যাঁ, অন্য দেশের নাটকও তো দেখেছি!

বিশ্বজিৎ : মানে overall?

সৌমিত্রবাবু : বললাম যে, এ-দেশের মধ্যে ওঁর দুজন ছাত্রকে দেখেছি যাঁদের আমি বড়ো অভিনেতা বলতে পারি—মহান অভিনেতা—great actors!

অনির্বাণ : মানে, যাঁরা ওঁর কাছাকাছি পর্যায়ে যেতে পেরেছেন?

সৌমিত্রবাবু : সেইরকম একই ধরনের। ওঁর ব্যাপ্তিটা হয়তো তাঁদের ছিল না, কিন্তু দুজনেই অসাধারণ অভিনেতা। এ ছাড়া আমি ওঁর ধারেকাছে যেতে পারে এরকম কোনো অভিনেতা আমি বাঙালির মধ্যেও দেখিনি।

অনির্বাণ : ওঁর কোনো নাটকে কি আপনি নিজে কাজ করেছেন?

সৌমিত্রবাবু : ওঁর নাটকে মানে ওঁর production-এ কাজ করেছি—গিরিশ ঘোষের নাটক *প্রফুল্ল*-তে।

অনির্বাণ : ওঁর সঙ্গেই তো করেছেন?

সৌমিত্রবাবু : হ্যাঁ।

অনির্বাণ : সেখানে আপনি কী অভিনয় করেছিলেন?

সৌমিত্রবাবু : আমি ছোটো ভাই, উনি বড়ো ভাই। উনি যোগেশ, আর আমি সুরেশ

করেছিলাম।

বিশ্বজিৎ : এটা তো সামাজিক নাটক—গিরিশ ঘোষের।

অনির্বাণ : বেতার-ঘোষক হিসেবেও আপনি কাজ করেছেন। চলচ্চিত্রেও অভিনয় করেছেন। নট-নাট্যকার-নাট্যাভিনেতা আপনি—

সৌমিত্রবাবু : *(থামিয়ে দিয়ে)* বেতার-ঘোষণা আর চলচ্চিত্রে অভিনয়—এ-দুটো জীবন এক করলে কিন্তু খুব মুশকিল!

অনির্বাণ : *(মৃদু প্রতিবাদ করে)* এক করছি না—

সৌমিত্রবাবু : সাড়ে তিনশো ছবি করেছি। আর *(হেসে)* বেতার-ঘোষক হিসেবে মাত্র এক বছর কাজ করেছি!

অনির্বাণ : আমি আসলে সবটাই বলছি।

বিশ্বজিৎ : আচ্ছা, সাড়ে তিনশো হয়ে গেছে!

সৌমিত্রবাবু : হ্যাঁ, পঞ্চাশ বছরেরও ওপর আমি অভিনয় করছি।

অনির্বাণ : হ্যাঁ, এবার আমি বলছি যে, আপনার এত রকমের কাজ, মানে multifaceted background আপনার। নট-নাট্যকার আপনি। আবার পত্রিকাও সম্পাদনা করেছেন। আবৃত্তি করেন। নিজেও কবি। তো, এত রকমের সৌমিত্র-র মধ্যে—

সৌমিত্রবাবু : কোনোটাই এত রকমের নয়!

অনির্বাণ : অবশ্যই এত রকমের।

সৌমিত্রবাবু : একেবারেই এত রকমের নয়, একই লোক। *(হেসে)* রবীন্দ্রনাথ কি আর অনেক রকমের রবীন্দ্রনাথ?

অনির্বাণ : একই মানুষের বিভিন্ন সত্তা, বিভিন্ন ভুমিকা—

সৌমিত্রবাবু : তাঁর বিভিন্ন কাজ, তাঁর চরিত্রের বিভিন্ন দিক—এই বলা যায়।

অনির্বাণ : সবথেকে প্রিয় কাজ কোন্‌টা, এতগুলো কাজের মধ্যে?

সৌমিত্রবাবু : বলতে পারছি না। আমি জানি না।

বিশ্বজিৎ হেসে ওঠে।

সৌমিত্রবাবু : না, বলতে পারছি না। আমি সবগুলো কাজ করে বেশিরভাগগুলোতেই আনন্দ পাই।

বিশ্বজিৎ : আসলে আমার মনে হয়, যখন যেটায় আনন্দ পাওয়া যায়, সেই কাজটাই—

সৌমিত্রবাবু : লেখার সময়ে লিখে সবথেকে বেশি আনন্দ পাই। অভিনয় করার সময়ে

অভিনয়—

অনির্বাণ : আচ্ছা।

সৌমিত্রবাবু : অভিনয়টা আমার সবথেকে প্রাথমিক কাজ। তবে সিনেমা বা থিয়েটার বা অন্য যে-কোনো মাধ্যমে অভিনয় করার থেকেও আমি নাটক পরিচালনা করেই সবথেকে বেশি আনন্দ পাই।

অনির্বাণ : সবথেকে বেশি?

সৌমিত্রবাবু : হ্যাঁ।

অনির্বাণ : আর-একটা কথা হল—আপনার এই স্পষ্ট ও বিশুদ্ধ উচ্চারণশৈলী, বাচনভঙ্গি, চরিত্রানুগ অভিনয় কী-করে করতে হবে, কীভাবে কথা বলতে হবে, কণ্ঠস্বরের ওঠানামা—এই সব ব্যাপারটা নাটকের ক্ষেত্রে আপনার যতটা দেখা গেছে সেটা কি আবৃত্তির জন্য অনেক বেশি উন্নত হয়েছে?

সৌমিত্রবাবু : না, এমনিতেই তো ওগুলো শিখতে হয়! নাটক বা আবৃত্তি যে করে না তাকে কি উচ্চারণটা শিখতে হবে না? তাকেও শিখতে হবে। আবৃত্তি আমায় help করেছে, অনুশীলনে সাহায্য করেছে।

অনির্বাণ : আর-একটা কথা—অভিনয়ের ক্ষেত্রে আপনার পারিবারিক support কতটা ছিল? মানে, আমি আগের থেকেই—আপনার বাবার আমল থেকেই—বলছি।

সৌমিত্রবাবু : খুবই ছিল। আমাদের বাড়িতে বরাবরই অভিনয়ের একটা পৃষ্ঠপোষকতা ছিল, প্রশ্রয়ও দেওয়া হত।

অনির্বাণ : আপনার বাবাও অভিনয় করতেন?

সৌমিত্রবাবু : হ্যাঁ, বাবা অভিনয় করতেন।

অনির্বাণ : স্টেজে করেছেন?

সৌমিত্রবাবু : হ্যাঁ, স্টেজেই করতেন। তবে পেশাদার নয়।

অনির্বাণ : Amateur?

সৌমিত্রবাবু : হ্যাঁ, তখন amateur theatre-ই ছিল।

অনির্বাণ : পরবর্তীকালে—মানে, আপনার পরবর্তী জীবনেও—পারিবারিক support পেয়েছেন? এখনও পান নিশ্চয়ই?

সৌমিত্রবাবু : হ্যাঁ, এটা আমার কাছে স্বতঃসিদ্ধ প্রায়। তারা support করেছে। শুধু অভিনয় বলে নয়—এই যে আপনি একটু আগে বললেন, "আপনি এত রকমের কাজ করেন।"—এই এত রকমের কাজ করার সময়

কোত্থেকে আসে? পারিবারিক support না-পেলে তো হয় না? তারা সেই সময়টা দেয় বলেই আমি পারি।

বিশ্বজিৎ : অবশ্যই।

সৌমিত্রবাবু : *(একটু ভেবে)* আমার পরিবার বলতে শুধু আমার স্ত্রী নয়, আমার ছেলে, মেয়ে—যাদের নিয়ে আবার পরিবার—প্রত্যেকেই।

অনির্বাণ : ঠিক, তাঁদের থেকে সময় বের করেই তো আপনাকে কাজগুলো করতে হয়। আপনার কন্যা পৌলমী বোস। উনিও তো আপনার পেশাই বেছে নিয়েছেন—

সৌমিত্রবাবু : পরবর্তীকালে।

অনির্বাণ : নৃত্যশিল্পী ছিলেন তো?

সৌমিত্রবাবু : হ্যাঁ, basically ও dancer। ভরতনাট্যম নাচত, খুবই অসাধারণ নাচত।

অনির্বাণ : হ্যাঁ, সেরকমই শুনেছি। দেখার সুযোগ খুব-একটা হয়নি, কিন্তু শুনেছি। একটা মজার জিনিস আমার মনে হয়েছে—কোনো serious question নয় এটা—আপনার ডাকনামের সঙ্গে আপনার কন্যার নামের একটা অদ্ভুত মিল পাই, মানে 'পুলু' নামটার সঙ্গে। *(একটু হেসে)* সত্যি কি কোনোভাবে নামটা প্রভাবিত হয়েছে? 'পৌলমী'-র মধ্যে কি 'পুলু' নামটাই লুকিয়ে আছে?

সৌমিত্রবাবু : বলতে পারব না। ওদের নামগুলো ওদের মা-র দেয়া। পৌলোমী[১] হচ্ছে ইন্দ্র-র স্ত্রী শচি-র আর-এক নাম।

অনির্বাণ : আপনি অনেকগুলো মাধ্যমে অভিনয় করেছেন, যেমন—চলচ্চিত্র ছাড়াও আপনি যাত্রা করেছেন, professional theatre করেছেন, group theatre করেছেন—

সৌমিত্রবাবু : *(প্রতিবাদ করে)* আমি ওই group theatre versus professional theatre-এ বিশ্বাস করি না। এটা লেখা উচিত।

---

১ যদিও সৌমিত্র-তনয়া তাঁর নিজের নামের বানান 'পৌলমী' লেখেন, ইন্দ্রপত্নী শচি-র অপর নাম কিন্তু আসলে পৌলোমী, অর্থাৎ পুলোমা ঋষির কন্যা। পৌলমীদেবী নিজেও এই অসংগতির কথা জানেন। যাই হোক, তাঁর ক্ষেত্রে আমরা 'পৌলমী বোস' নামটিই ব্যবহার করব।

—সম্পাদক

অনির্বাণ : আচ্ছা, তাহলে শুধু থিয়েটার বলি?

সৌমিত্রবাবু : হ্যাঁ, আমি থিয়েটারে বিশ্বাস করি। থিয়েটার এক এবং অবিভাজ্য। থিয়েটারের qualitative পার্থক্য হতে পারে—ভালো থিয়েটার, খারাপ থিয়েটার, মাঝারি থিয়েটার; কিংবা হতে পারে খানিকটা- ভালো, খানিকটা- খারাপ থিয়েটার। কিন্তু group theatre, professional theatre—ওসব দিয়ে কিছু বোঝায় না।

অনির্বাণ : ঠিক যেমন art cinema আর commercial cinema?

সৌমিত্রবাবু : 'বাণিজ্যিক থিয়েটার' বলে একটা কথা আছে। এটার মতো ভুল কথা আমি খুব কম শুনেছি। এগুলো লিখবেন।

অনির্বাণ : অবশ্যই।

সৌমিত্রবাবু : কারণ থিয়েটার বাণিজ্য ছাড়া হয় না।

অনির্বাণ : সত্যি কোনো পার্থক্য নেই?

সৌমিত্রবাবু : *(জোর দিয়ে)* থিয়েটার বাণিজ্য ছাড়া হয় না।

অনির্বাণ : ঠিক যেরকম আমার মনে হয় art cinema আর commercial cinema—

সৌমিত্রবাবু : ও তো bogus ব্যাপার একটা!

অনির্বাণ : কোনো মানে হয় না।

সৌমিত্রবাবু : আরে, একটা থিয়েটার দেখাতে গেলে তাকে বাণিজ্য করতেই হয়। লোক তো দেখবেই! টিকিট কাটবে তো তারা?

অনির্বাণ : মানে, বাণিজ্য না-হলে তখনই বলা হয় art cinema কিংবা art thieatre?

সৌমিত্রবাবু : না, তা নয়। আসল কথা, এঁরা বাংলাই জানেন না যাঁরা এটা বলেন। সব থিয়েটারই বাণিজ্যিক। ব্যক্তির, না কি গোষ্ঠীর বা দলের—তার ওপর মালিকানার তফাত হয়। কিন্তু *(দৃঢ়ভাবে)* থিয়েটার বাণিজ্যিক ছাড়া হতে পারে না।

বিশ্বজিৎ : আমার যেটা মনে হয়, শিল্পী তো তাঁর শিল্পটা দেখাবেনই মানুষকে—

সৌমিত্রবাবু : হ্যাঁ।

বিশ্বজিৎ : সেখানে আমি বেশি মানুষকে দেব, কম মানুষকে দেব—এটা তো হতে পারে না!

সৌমিত্রবাবু : শুধু তাই নয়, আপনারাই বলুন-না—এই যে 'group theatre', সেটা

'অবাণিজ্যিক' কী-করে হয়?

অনির্বাণ : সেটা হতেই পারে না।

সৌমিত্রবাবু : ধরুন মানলাম যে, তাঁরা শিল্পই করতে চাইছেন, বাণিজ্য করতে চাইছেন না—

অনির্বাণ : মানে nonprofit organisation? সেই হিসেবেও যদি ভাবি—

সৌমিত্রবাবু : Nonprofit হতে পারে কি, যদি তাঁদের বেশি বিক্রি হয়ে যায়?

আবার বিশ্বজিৎ হেসে ওঠে।

সৌমিত্রবাবু : সেটা তো falacy! বাণিজ্য করা মানে, আমি জিনিস বিক্রি করে পয়সা আনছি। সেদিক থেকে তো কোনো ব্যত্যয় হচ্ছে না! আমার মালিকানার ব্যত্যয় হতে পারে—আমার দল বা group ওই টাকাটার মালিক, কোনো ব্যক্তি নয়। *(হেসে)* এই তফাতটা হতে পারে। এবং দ্বিতীয় কথা, ওইটে—ওই তফাতটুকু—ধরলেও, যদি বাণিজ্য করি তাহলে শিল্পই প্রাধান্য পাচ্ছে, এমন গ্যারান্টি কি দিতে পারছি?

বিশ্বজিৎ : Exactly!

সৌমিত্রবাবু : সেটা তো নির্ভর করবে শিল্পীর ওপর!

অনির্বাণ : আর শিল্পী যখন ওটা করবেন, সেখানে কি শিল্পটা কম দেবেন? সেটা নিশ্চয়ই নয়।

সৌমিত্রবাবু : যে-কাজটা হচ্ছে তার পেছনে যদি একজন সত্যিকারের ভালো শিল্পী থাকেন তবেই সেটা শিল্প হয়, নইলে হয় না। ওখানে ওই so-called 'বাণিজ্যিক থিয়েটার'-এও যা, এখানেও তাই। এই যে প্রায় তিনহাজার theatre group আছে, তাদের অধিকাংশের নাটকই তো বসে দেখা যায় না, পাতে দেওয়া যায় না!

বিশ্বজিৎ : একদম ঠিক।

সৌমিত্রবাবু : 'Group theatre' বললে যেন একটা পইতে এসে যায়! সঙ্গেসঙ্গেই যেন—

বিশ্বজিৎ : একটাকিছু করছি।

সৌমিত্রবাবু : হ্যাঁ, আমাদের জাতপাতের দেশ তো, সেইজন্যেই।

অনির্বাণ : এই যে 'group theatre' নামটা—আমি just জানতে চাইছি—সত্যি কি বিদেশেও আছে?

সৌমিত্রবাবু 'Group theatre' নামটা বিদেশ থেকেই এসেছে।

অনির্বাণ : Group theatre সত্যি কি বিশেষ কোনো—

সৌমিত্রবাবু : হ্যাঁ, group theatre movement একটা হয়েছিল আজ থেকে চল্লিশ-পঞ্চাশ বছর আগে।

অনির্বাণ : সেই হিসেবেই যদি ভাবি, তাহলে তো group theatre বলে কিছু-একটা হচ্ছেই?

সৌমিত্রবাবু : হ্যাঁ, group theatre movement বলে একটা আলাদা ধারা হয়েছিল, আমেরিকায়।

অনির্বাণ : সেটা আমরা ঠিক কী দেখে বুঝব? মানে, group theatre কি না?

সৌমিত্রবাবু : সেটা আমি ঠিক বুঝি না। সেইজন্যেই তো বলছি, ওসব তো বাইরে-থেকে-নেওয়া ছিন্ন ব্যাপার, কোনো মানে হয় না।

অনির্বাণ : বিদেশ থেকে ধার করা?

সৌমিত্রবাবু : হ্যাঁ। আর বলুন তো, পৃথিবীর বেশিরভাগ দেশে যে থিয়েটার হয় সেখানে কোন্ থিয়েটার দেখে লোকে সে-দেশের থিয়েটারকে চেনে?

আমরা নিরুত্তর।

সৌমিত্রবাবু : সে-দেশের professional theatre। তাকে 'commercial theatre' বলে ছাপ্পা মারার কোনো মানে নেই, কারণ থিয়েটার মাত্রেই commercial। *(হেসে)* তুমি যদি commerce না-কর তাহলে তুমি থিয়েটার করতে পারবে না; তোমাকে তবে ঘরে বসে তোমার দু-একজন বন্ধুকে দেখাতে হবে।

অনির্বাণ : তার মানে 'professional theatre' কথাটাতে কোনো আপত্তি নেই?

সৌমিত্রবাবু : একেবারেই আপত্তি নেই। একজন সরোদবাজিয়ে professional ছাড়া হয়? আলাউদ্দিন খাঁ professional ছিলেন না? আলি আকবর খাঁ, রবিশঙ্কর—এঁরা professional নন? ওখানে কি 'amateur বাজিয়ে' বলে কিছু আছে?

অনির্বাণ : না।

সৌমিত্রবাবু : তাহলে এখানে কেন থাকবে?

বিশ্বজিৎ : একদম ঠিক, স্যার; কারণ আমার মনে হয়, professional না-হলে কোনো ক্ষেত্রেই এগোনো যায় না।

সৌমিত্রবাবু : Professional হলে আমার সঙ্গেসঙ্গে দায়িত্ব হয় to be excellent।

বিশ্বজিৎ : Exactly!

অনির্বাণ : শুধু যে টাকা পাওয়া তাই নয়, তার বিনিময়ে আমাকেও কিছু দিতে হবে।

সৌমিত্রবাবু : টাকাটা তো তার—কী বলব?—তার professionalism নয়!

অনির্বাণ : ঠিক।

সৌমিত্রবাবু : একজন কামার কি কুমোর—সেও তো একজন professional। সে ওই pot-টা ভালো করে হাতে করে তৈরি না-করলে তার মাল বিক্রি হবে না।

অনির্বাণ : হুঁ।

সৌমিত্রবাবু : তাই তাকে ভালো করতেই হবে। *(হেসে)* আসলে এইসব ধারণাগুলো আমাদের ভয়ংকর ভুল।

অনির্বাণ : এবার আমি যদি বলি থিয়েটার আর যাহ্‌—যাত্রাকে একটা আলাদাভাবে—

সৌমিত্রবাবু : যাত্রা আলাদা বই-কি?

অনির্বাণ : আলাদা মানে একটা অন্য চোখে দেখা। "ওটা তো যাত্রা!"—এই যে ব্যাপারটা?

সৌমিত্রবাবু : ওটা খুব বাজে কথা।

অনির্বাণ : সেটা তো ঠিক নয়?

সৌমিত্রবাবু : হ্যাঁ, ওটা বাজে কথা। কিন্তু এটা অত্যন্ত দুঃখের যে, আমাদের যে যাত্রা form-টা ছিল, সেটা গত চল্লিশ-পঞ্চাশ বছরের মধ্যে একেবারে নষ্ট হয়ে গেছে।

অনির্বাণ : Group theatre সেটাকে বের করে দিয়েছে?

সৌমিত্রবাবু : না না, group theatre তাকে বের করেনি, তারা নিজেরাই বেরিয়ে গেছে। তারা তো আলাদাই ছিল! তারা তাদের form-টাকে রক্ষা করতে পারেনি, নষ্ট করে ফেলেছে।

অনির্বাণ : হ্যাঁ।

সৌমিত্রবাবু : তারা সিনেমার অনুকরণ করে, থিয়েটারের অনুকরণ করে, এবং সেই অনুকরণেও একটা hybrid বস্তুর সৃষ্টি হয়, কিছুই তৈরি হয় না।

অনির্বাণ : Originality-ও নেই, এবং—

সৌমিত্রবাবু : এবং সেটা bad theatre।

অনির্বাণ : আপনি তো এত রকমের অভিনয় করলেন। চলচ্চিত্রে করলেন, ছোটোপর্দাতেও করেছেন অনেককিছু।

বিশ্বজিৎ : Serial—

অনির্বাণ : হ্যাঁ, serial আর telefilm দুটোই। তাছাড়া যাত্রা করেছেন, থিয়েটার করেছেন। তো, এত রকমের মধ্যে আপনার সবচেয়ে কঠিন কোন্‌টা মনে হয়েছে? সবথেকে বেশি কঠিন?

সৌমিত্রবাবু : সবই কঠিন।

বিশ্বজিৎ : এবং কোন্‌টা আনন্দদায়ক বেশি, স্যার?

সৌমিত্রবাবু : আমি থিয়েটার, সিনেমা—সবেতেই আনন্দ পাই যদি করার মতো কিছু থাকে তবেই।

বিশ্বজিৎ : মানে একইরকম আনন্দ?

সৌমিত্রবাবু : না, একই কী-করে হবে? আমি যখন একটা ছোটো ছবি আঁকি, আবার যখন বড়ো oil painting করি, *(হেসে)* তখন কি এক রকমের আনন্দ হয়?

অনির্বাণ : তাহলে কোন্‌টায় বেশি? সেটাই প্রশ্ন।

সৌমিত্রবাবু : না, কোনোটাতেই বেশি নয়। আমি সিনেমাতেও অভিনয় করতে অসম্ভব ভালোবাসি।

অনির্বাণ : আচ্ছা। সে তো অবশ্যই!

সৌমিত্রবাবু : কিন্তু বললাম যে, যে-কাজটা আমার নিজের সবথেকে ভালো লাগে সেটা হচ্ছে—

অনির্বাণ : পরিচালনা।

সৌমিত্রবাবু : মানে complete theatre তৈরি করা, অর্থাৎ direct করা। তাতে লেখা আমার থাকে, এমনকি যখন সুবিধে থাকে তখন তার music পর্যন্ত আমিই তৈরি করি। সম্পূর্ণটা তৈরি করা আর-কি।

অনির্বাণ : পুরো স্বাধীনতাটা থাকে বলে?

সৌমিত্রবাবু : স্বাধীনতা সব জায়গাতেই থাকে। অভিনয় করার সময়ে কি স্বাধীনতা থাকে না?

অনির্বাণ : নিজের ইচ্ছেটা—

সৌমিত্রবাবু : *(থামিয়ে দিয়ে)* নিজের ইচ্ছেও থাকে। সবই থাকে অভিনয় করার সময়েও। কিন্তু সম্পূর্ণ সৃষ্টির দায়িত্ব থাকে পরিচালনার ক্ষেত্রে।

বিশ্বজিৎ : Right!

অনির্বাণ : আর-একটা প্রশ্ন হচ্ছে যে, উৎপল দত্ত propagandist theatre-এ

বিশ্বাস করতেন, আমরা জানি। উনি বারবার ঘোষণাও করেছেন এ কথা যে, রাজনীতির বাইরে থিয়েটার হয় না। আপনিও কি থিয়েটারের এই রাজনীতিকরণের পক্ষে? মানে, রাজনৈতিক থিয়েটার সম্বন্ধে আপনি কী মনে করেন?

সৌমিত্রবাবু : থিয়েটার একহাজার রকমের হতে পারে। থিয়েটার রাজনৈতিক হতে পারে, নাও হতে পারে। আমাদের শেক্সপিয়ারের পরে যিনি পৃথিবীর সবচেয়ে বড়ো নাট্যকার, তিনিও তো রাজনৈতিক থিয়েটারই করেছেন—বের্টোল্ট ব্রেখ্‌ট।

অনির্বাণ : তাতে কোনো অসুবিধে নেই নিশ্চয়ই?

সৌমিত্রবাবু : কীসের অসুবিধে?

অনির্বাণ : আবার এমনও নয় যে, থিয়েটার মানেই তাতে রাজনীতি থাকতেই হবে। এমন নিশ্চয়ই নয়?

সৌমিত্রবাবু : বললাম তো, একহাজার রকমের থিয়েটার হতে পারে। শিল্প বাঁধাধরা রকমের হয় না। শুধু থিয়েটার কেন, সব শিল্পই নানা রকমের হতে পারে।

অনির্বাণ : ইদানীংকালে যেটা হয়েছে—বা করার চেষ্টা হচ্ছে, আমি আগেই বলে দিচ্ছি—খবরের কাগজেই বলুন অথবা অন্য কোথাও—এই যে 'আমরা' বনাম 'ওরা' ইত্যাদি—এর ফলে কি নাটকশিল্প বা অভিনয়শিল্পের মধ্যে কোনো খারাপ কিছু হয়েছে?

সৌমিত্রবাবু : বলতে পারব না। আমি সকলকার থিয়েটার তো দেখে বেড়াচ্ছি না, তাই কোথায় কী হচ্ছে, না-হচ্ছে *(হেসে)* আমার পক্ষে বলা সম্ভব নয়। আমার উপর এসবের কোনো প্রতিক্রিয়া নেই—এটুকু বলতে পারি।

অনির্বাণ : আমি বলছি যে, ব্যক্তিগতভাবে সঙ্গে কারও সঙ্গে খারাপ কিছু নিশ্চয়ই হচ্ছে না? যে, নিশ্চয়ই "আপনার সঙ্গে অভিনয় করব না, কারণ আপনি—"

সৌমিত্রবাবু : না না, ওসব বাজে কথা।

অনির্বাণ : হচ্ছে না, সেটাই বলছি। এবার বলুন তো, আপনি যে *তৃতীয়* অঙ্ক, *অতএব* লিখলেন, সেটা ঠিক কী কারণে বা কেন লিখলেন?

সৌমিত্রবাবু : থিয়েটার করব বলে! *(খুব হেসে)* আর কীসের জন্যে?

বিশ্বজিৎও হেসে উঠল।

অনির্বাণ : এটা তো অন্য রকমের, না? আপনার অন্যগুলোর মতো তো নয়!

সৌমিত্রবাবু : না না, অন্যগুলোও একেকটা একেক রকমের।

অনির্বাণ : এটা নিজের জীবন লিখে লেখা—

সৌমিত্রবাবু : হ্যাঁ, আত্মজীবন নিয়ে লেখা। সেটাই তো একটা নতুন experiment। *(হেসে)* এই আর-কি! একটা experiment করব বলেই—

অনির্বাণ : এটা মনে হল কেন যে, আত্মজীবনী থিয়েটার দিয়ে করা যায়? এটা কি কোনো—

সৌমিত্রবাবু : *(থামিয়ে দিয়ে)* না, আত্মজীবনী থিয়েটার দিয়ে করা নয়, ঠিক উলটো— *(হেসে)* থিয়েটার আত্মজীবনী দিয়ে করা যায় কি না।

আবার হাসি বিশ্বজিতের।

অনির্বাণ : এটা লেখা হয়ে গেল মানে কি এই যে, আপনি আত্মজীবনী আর লিখবেন না? মানে, আপনার ইচ্ছে আছে কি আর, নতুন আত্মজীবনী লেখার?

সৌমিত্রবাবু : না না, prose আত্মজীবনী লেখার কোনো ইচ্ছে নেই।

অনির্বাণ : ইচ্ছে নেই? তাহলে এটাই আত্মজীবনী হয়ে থাকল?

সৌমিত্রবাবু : *(বিরক্ত হয়ে)* এটাই মানে? এটা তো সামান্য একটুখানি! *(হেসে)* আমার জীবনটা তো আর ওইটুকুন নয়?

বিশ্বজিৎ : *(হেসে)* নিশ্চয়ই নয়।

অনির্বাণ : ঠিক সেইজন্যেই প্রশ্ন যে, আপনি আত্মজীবনী লিখবেন না?

সৌমিত্রবাবু : না, আত্মজীবনী—মানে prose আত্মজীবনী—লেখার যে *(একটু ভেবে)* বা যেসমস্ত—কী বলব?—constraints বা regulations, সেগুলো আমার পক্ষে নেওয়া সম্ভব নয়।

অনির্বাণ : Constraints বলতে? ঠিক বুঝলাম না।

সৌমিত্রবাবু : Constraints তো থাকেই? কিছু বলার বাধা থাকে।

অনির্বাণ : মানে, সবটা সত্যি বলা যায় না সবসময়?

সৌমিত্রবাবু : হ্যাঁ, সেইজন্যেই। তাহলে লিখে লাভটা কী?

অনির্বাণ : *(হেসে)* তাহলে লুকোতে হবে আর-কি!

সৌমিত্রবাবু : *(একটু অন্যমনস্ক হয়ে)* হ্যাঁ?

অনির্বাণ : বললাম, তাহলে লুকোতে হবে?

সৌমিত্রবাবু : লুকোতে হবে নয়। সবটা বলা গেল না যখন, তাহলে আমার লিখে দরকারটা কী? প্রাথমিক প্রশ্নটা করছি।

বিশ্বজিৎ : যেহেতু সব বলতে পারবেন না, সেই কারণে—

সৌমিত্রবাবু : আমি যা-যা বলতে পারছি সে তো আমার কাজের মধ্যে ধরাই থাকছে সব! আমার প্রায় সমস্ত প্রবন্ধ আত্মজীবনীমূলক। যা-যা প্রবন্ধ লিখেছি তাদের মধ্যে বেশিটাই—

অনির্বাণ : অভিজ্ঞতার কথা?

সৌমিত্রবাবু : হ্যাঁ, আত্মজীবনীমূলক। সেগুলো আমার জীবনের একেকটা অংশ সব। আবার তাহলে নতুন করে ওটা লিখতে যাব কেন?

অনির্বাণ : আত্মজীবনী লেখার সার্থকতা আপনি তাহলে দেখেন না খুব-একটা?

সৌমিত্রবাবু : *(মাথা নেড়ে)* না না, কেন দেখব না? লেখার ক্ষমতা *আমার* নেই। বাকি সামাজিক যেসমস্ত constraints বা regulations আছে সেগুলোকে অগ্রাহ্য করে লেখার ক্ষমতা আমার নেই।

অনির্বাণ : Recently আপনার যে-নাটকটা চলছে—*তৃতীয় অঙ্ক, অতএব*—সেটা না-দেখলে সত্যিই জানতাম না যে, এত রকমের অসুখ আপনার শরীরে বাসা বেঁধেছে! এটা সত্যিই জানতাম না, *একসঙ্গে* এতরকম! এই যে আড্ডা-শুরুর একটু আগে আপনি আমাদের বললেন-না যে, ডান কানে শুনতে অসুবিধে হচ্ছে? নাটকেও বলেছেন আপনি—'ডান কান লিমিটেড'। তো, সত্যি কী-করে এত অসুখ নিয়েও, এতকিছু শারীরিক অসুবিধে নিয়েও, আপনি এতটা বেশি কর্মক্ষম *এখনও*? দেখে তো বোঝা যায় না!

সৌমিত্রবাবু : না না, তার মানে তো আমি সবসময় অসুস্থ হয়ে থাকছি না! সুস্থও তো থাকছি অনেকসময়? বেশিরভাগ সময়টাই সুস্থ থাকছি।

অনির্বাণ : কোনো অসুবিধে হয় না?

সৌমিত্রবাবু : না, অসুবিধে হবে না কেন? অসুবিধে তো হতেই পারে! অসুবিধে হলেই যে কাজ বন্ধ দিতে হবে তার তো কোনো মানে নেই?

অনির্বাণ : সত্যি, আমাদের খুব অদ্ভুত মনে হয় যে, আপনি কী-করে এখনও পারেন এতকিছু সত্ত্বেও? সেটাই আমাদের প্রশ্ন।

সৌমিত্রবাবু : *(অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে)* না, যতদিন কর্মক্ষমতা থাকছে ততদিন কাজ করব—এটাই তো স্বাভাবিক!

অনির্বাণ : তার জন্যে যে শারীরিক ও মানসিক বলের দরকার সেটা কোত্থেকে আসে? এটাই আমাদের কাছে একটা বিস্ময়ের ব্যাপার।

সৌমিত্রবাবু : *(হেসে)* সেটা আমি জানি না। সে আর আমি কী বলব?

বিশ্বজিৎ : *(গম্ভীরভাবে)* জীবনীশক্তি।

অনির্বাণ : আর-একটা জিনিস বলি। আপনার জীবন নিয়ে খুব বেশি চর্চা তো হয় না আমাদের দেশে! আমরা দেখেছি, আমাদের দেশে অনেককে নিয়েই—মানে নিজেদের লোককে নিয়ে—চর্চা হয় না। আমার মনে হয়েছে, আপনাকে নিয়েও খুব বেশি হয়নি।

বিশ্বজিৎ : খুব বেশি কেন, হয়ইনি।

অনির্বাণ : আপনার জীবন নিয়ে—

বিশ্বজিৎ : স্যার তো জাতীয় পুরস্কার পেলেন এই সেদিন! তাই বলছি, হয়ইনি।

অনির্বাণ : হ্যাঁ, সেটাই। কিন্তু বিদেশি উদ্যোগে—আমরা জানি—১৯৯৮-তে বোধহয়—*The Tree* বলে একটা তথ্যচিত্র হয়েছে আপনাকে নিয়ে। সেটা নিয়ে আপনার অভিজ্ঞতা কীরকম একটু বলবেন? আসলে অনেকেই তো জানেই না!

সৌমিত্রবাবু : না, অভিজ্ঞতার কথা আর বলার কী আছে? আমার উপর ছবিটা হয়েছিল। French একজন ভদ্রমহিলা ছবিটা করেছিলেন। Catherine Berge হল এই director-এর নাম। তিনি আমার—মানে আমার কাজের—একজন গুণগ্রাহী।

অনির্বাণ : সেটা নিয়ে তো বেশিকেউ জানেই না! তাই আমি চাইছি, লোকে একটু জানুক, মানে তারা যেহেতু একদমই জানে না। এই ছবিটা তো কেউ দেখবে বলেও মনে হয় না।

সৌমিত্রবাবু : দেখতে পাবে কী-করে?

অনির্বাণ : পাওয়াই যায় না?

সৌমিত্রবাবু : এমনি কলকাতা আর দিল্লির film festival-গুলোতে দেখানো হয়েছিল।

অনির্বাণ : CD বা অন্য-কোনো form-এও নেই?

সৌমিত্রবাবু : নেই মানে, কোথায় আর পাওয়া যাবে? ওরা তো commercially বিক্রিটিক্রি করেনি!

অনির্বাণ : তথ্যচিত্র তো একটা? আমার মনে হয় যে, কিছু মানুষ জানুক—এটা খুব দরকার। সেই হিসেবেই বলছি, আমাদের জানার জন্যে আপনি কিছু বলুন।

সৌমিত্রবাবু : না, *(হেসে)* এই বিষয়ে আমার তো বলার কিছুই নেই!

অনির্বাণ : আমরা তো দেখিনি, সেইজন্যেই বলছি।

সৌমিত্রবাবু : না-দেখলে আমিই বা সেটা describe করব কী-করে? *(হেসে)* আমার ওপর ছবিটা করেছিল—এই আর-কি।

অনির্বাণ : বিশ্বজিৎদা যেটা বলছিল, চলচ্চিত্রে আপনার National Award তো এই সেদিন এল! যখন সত্যিকারের আপনার peak form তখন আসেনি, অনেকদিন পরে এল এই National Award! আপনার কি মনে হয় নাটকের ক্ষেত্রেও আপনি একইরকমভাবেই বঞ্চিত? দেরি করে পাচ্ছেন, বা আদৌ পাননি কোনো সম্মান বা পুরস্কার যেটা আগেই পাওয়া দরকার ছিল?

সৌমিত্রবাবু : সংগীত নাটক অকাদেমির award তো পেয়েছি! অনেকদিন আগেই পেয়েছি। মানে, নব্বইয়ের দশকে। কিন্তু সত্যিকথা বলতে কি, সংগীত নাটক অকাদেমির award তবু একটা যোগ্যতার নিরিখেই দেওয়া হয়—দু-একজনের হয়তো সামান্য তারতম্য হয়—কিন্তু film-এ National Award-এর কোনো অর্থ আমি খুঁজে পাই না; এটাকে আমি কোনো মূল্যই দিই না। হয়তো আমার মানসিক—মানে কী বলব?—একটা পরিবর্তন অনেকদিন ধরে হচ্ছে বলে আমি গ্রহণ করেছি; অর্থাৎ দশ বছর আগে দিলে আমি নিতাম না।

অনির্বাণ : সেইজন্যেই কি পদ্মশ্রী আপনি নেননি?

সৌমিত্রবাবু : হ্যাঁ, এবং যে-কারণে পরে পদ্মভূষণ নিলাম।

অনির্বাণ : হ্যাঁ।

সৌমিত্রবাবু : সেটার কারণ হচ্ছে, এখন তার reality-টা বদলে গেছে; আর দ্বিতীয় কথা, আমি একদম সম্পূর্ণ এইজন্যে নিয়েছি যে, আমি না-নিলে আমাকে যাঁরা ভালোবাসেন—আমার দেশের লোক—তাঁরা দুঃখ পাবেন।

বিশ্বজিৎ : অবশ্যই স্যার।

সৌমিত্রবাবু : তাঁরাই চান যে, আমি নিই। তাঁদের কথা ভেবেই আমি নিয়েছি। আমি নিজে এগুলোতে কোনো মূল্যই আরোপ করি না। এগুলো মূল্যহীন, প্রায় rubbish বলা যায়।

বিশ্বজিৎ : কাজটাই আসল। তাই তো স্যার?

সৌমিত্রবাবু : তার চেয়েও আমার কাজের বড়ো প্রাপ্তি বা সবথেকে বড়ো পুরস্কার

হচ্ছে দেশের লোকের ভালোবাসা।

অনির্বাণ : না, এগুলোতে উৎসাহও তো কিছু পাওয়া যায়?

সৌমিত্রবাবু : কে পায় জানি না! আমি পাই না, আমার বিরক্তি হয়।

আবার বিশ্বজিতের হাসি।

অনির্বাণ : ফরাসি সরকারও তো আপনাকে সম্মান দিয়েছে?

সৌমিত্রবাবু : হ্যাঁ।

অনির্বাণ : সেটা exactly কী সম্মান?

সৌমিত্রবাবু : Commandeur de l'Ordre des arts etdes lettres।

অনির্বাণ : সেটা ঠিক কারা দেয়?

সৌমিত্রবাবু : French government। সেখানকার সর্বোচ্চ পুরস্কার সেটা। তবে তারও categories আছে।

অনির্বাণ : ওটা কি শিল্পের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ?

সৌমিত্রবাবু : শিল্প ছাড়াও অন্যান্য কিছুতেও থাকতে পারে, আমি জানি না। সাধারণত শিল্পীদেরই দেওয়া হয়। শিল্পী মানে, 'Commandeur' যখন তাকে বলা হচ্ছে তখন তাকে অন্যভাবে দেখা হচ্ছে; সে arts & letters-এর একজন সর্বোচ্চ সৈনিক—এই হিসেবেই দেওয়া হয়।

অনির্বাণ : ফ্রান্সের সম্মান, তারপর আপনার ওপর তথ্যচিত্রটাও French! তার মানে সে-দেশে আপনার বেশ ভালোই জনপ্রিয়তা আছে?

সৌমিত্রবাবু : *(তাচ্ছিল্যের সঙ্গে)* থাকতে পারে।

অনির্বাণ : ইতালি থেকেও তো পেয়েছেন lifetime achievement award?

সৌমিত্রবাবু : হ্যাঁ।

অনির্বাণ : আর-একটা জিনিস এই প্রসঙ্গেই বলি। আমি নাট্যাভিনয়ের ক্ষেত্রে আবার ফিরে আসছি, যেহেতু নাটকটাই আমাদের মূল বিষয়। তো, বিদেশি কোনো ভাষায় বা আমাদের দেশেরই অন্য-কোনো ভাষায়—যদিও মূলত বাংলাতেই আপনি করেন—নাট্যাভিনয়ের কোনো প্রস্তাব পেয়েছেন কখনও? যে, "আপনি করুন।"

সৌমিত্রবাবু : খুব solid কোনো প্রস্তাব কখনও আসেনি।

অনির্বাণ : আমাদের দেশেও পাননি?

সৌমিত্রবাবু : না। *(তাচ্ছিল্যের সঙ্গে)* হ্যাঁ, দু-একবার কথা হয়েছে দু-একজনের সঙ্গে। *(একটু ভেবে)* নাসিরউদ্দিন একবার বলেছিল, "এসো দাদা, একটা

ইংরেজিতে করো।'' *(হেসে)* এমনি গল্প-আড্ডার মধ্যেই।

অনির্বাণ : আপনি এখনও অব্দি বাংলাতেই করেছেন?

সৌমিত্রবাবু : মানে সিনেমা অন্য ভাষায় করেছি—ইংরেজিতে করেছি; কিন্তু থিয়েটার বাংলাতেই করেছি।

অনির্বাণ : সিনেমা কোন্‌গুলো?

সৌমিত্রবাবু : অনেকগুলোই করেছি। চারটে-পাঁচটা।

অনির্বাণ : নামগুলো বলবেন?

সৌমিত্রবাবু : *La Nuit Bengali*।

অনির্বাণ : ও আচ্ছা!

বিশ্বজিৎ : অসাধারণ।

সৌমিত্রবাবু : *(বিশ্বজিতের দিকে তাকিয়ে)* হ্যাঁ?

বিশ্বজিৎ : অসাধারণ বইটা, স্যার।

সৌমিত্রবাবু : *(একটু ভেবে)* তারপরে—

অনির্বাণ : ওটা কে পরিচালনা করেছেন? *La Nuit Bengali*?

সৌমিত্রবাবু : *(অনেকটা ভেবে)* নামটা ভুলে গেছি। Nicolas Klotz না কী নাম, ভুলে গেছি।

অনির্বাণ : আর?

সৌমিত্রবাবু : তারপরে *(একটু ভেবে)* আরও করেছি। *(অনেকটা ভেবে)* Italian একজন পরিচালকের *Vrindavan Film Studios*। তারপরে *Shadows of Time* বলে একটা German production-এ করেছি।

অনির্বাণ : এগুলোতে কি ইংরেজি ভাষায় করেছেন, না কি ওদের ভাষায়?

সৌমিত্রবাবু : ইংরেজি ভাষায়।

অনির্বাণ : আপনাকে যদি এমন বলা হয় যে, আন্তর্জাতিক নাট্যজগতের কোনো-একটা বিশেষ নাটকের বিশেষ কোনো চরিত্র—আপনি যেটা করতে পারলে খুব গর্বিত হতেন—এরকম কিছু আছে কি?

সৌমিত্রবাবু 'আন্তর্জাতিক নাট্যজগৎ' ব্যাপারটা আমি বুঝলাম না।

অনির্বাণ : মানে আমি বলছি, বিশ্বের যে-কোনো দেশের নাটকে। শুধু ভারতীয় বলছি না, পুরো বিশ্বের নাট্যজগতের কোনো চরিত্রে। আপনি তো অনেক নাটক দেখেছেন?

সৌমিত্রবাবু : আমি তো *(হেসে)* ইংরেজি ছাড়া অন্য-কোনো বিদেশি ভাষা জানি না!

অনির্বাণ : আচ্ছা, ইংরেজি নাটকেরই কোনো চরিত্র যেটা আপনার করতে খুব ইচ্ছে?

সৌমিত্রবাবু : সে তো অনেক চরিত্র আছে—বহু চরিত্র।

অনির্বাণ : আপনার পছন্দের কোনো চরিত্র?

সৌমিত্রবাবু : *(একটু বিরক্ত হয়ে)* বহু চরিত্র আছে। কয়েকহাজার নাটক পড়েছি সারাজীবনে। *(হেসে)* তার মধ্য থেকে কি বিশেষ-একটা ওরকমভাবে বের করা যায়?

অনির্বাণ : কোনো স্বপ্নের চরিত্র নেই?

সৌমিত্রবাবু : অনেক আছে স্বপ্নের চরিত্র। একটামাত্র স্বপ্নের চরিত্র থাকা মানে আমি খুবই—কী বলব—*(হেসে)* দরিদ্র শিল্পী বলতে হয়।

স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে বিশ্বজিতের হাসি।

অনির্বাণ : আপনার-লেখা আর-কোনো নাটক আছে যা আমরা সামনে দেখতে চলেছি?

সৌমিত্রবাবু : এক্ষুনি করতে পারব না, কেন-না এখন আমাকে ওই মিনার্ভা নাট্যসংস্কৃতির জন্যে একটা নাটকে অভিনয় করতে হবে। সেটা হয়ে গেলে দেখি এ-বছরের শেষে যদি কিছু করা যায়।

অনির্বাণ : সেটা কী? মিনার্ভাতে যেটা হবে?

সৌমিত্রবাবু : কী নাটক এক্ষুনি *(হেসে)* বলব না।[২]

অনির্বাণ : *(একটু অপ্রস্তুত হয়ে)* বলবেন না?

সৌমিত্রবাবু : না।

বিশ্বজিৎ এবারও হেসে ওঠে।

অনির্বাণ : আপনার লেখা এখন চলছে? নিজে যেটা লিখছেন?

সৌমিত্রবাবু : না, লেখা হয়ে গেছে।

অনির্বাণ : আর-একটা জিনিস বলছি যে, এখন দেখতে পাচ্ছি সত্যজিৎ রায়ের গল্প-অবলম্বনে অনেক থিয়েটার হচ্ছে ইদানীংকালে। *অনুকূল* হয়েছে একটা। *পটলবাবু ফিল্ম স্টার* হয়েছে। ফেলুদাও হয়েছে তার মধ্যে।

---

২. সৌমিত্রবাবু সুমন মুখোপাধ্যায়-নির্দেশিত *রাজা লিয়ার* (শেক্সপিয়ারের *King Lear* নাটকের অনুবাদ) প্রযোজনার কথা বলছেন। আমাদের আড্ডার প্রায় চার মাস পরে মিনার্ভা থিয়েটারে নাটকটি প্রথম মঞ্চস্থ হয়।

অপ্সরা থিয়েটারের মামলা-তে ফেলুদাও আছে স্টেজে। আপনি তো বড়োপর্দা, ছোটোপর্দা, এমনকি বোধহয় আকাশবাণীতেও ফেলুদা করেছেন, যেমন *বাক্স-রহস্য*?

সৌমিত্রবাবু : হ্যাঁ।

অনির্বাণ : তো, অন্যান্য সবরকম ফেলুদাই করেছেন। আপনার মনে হয়নি কখনও যে, মঞ্চে ফেলুদা করি?

সৌমিত্রবাবু : না।

অনির্বাণ : একদম না?

সৌমিত্রবাবু : এইজন্যই মনে হয় না যে, খুব খুঁজে হয়তো দু-একটা গল্প বের করা যাবে যেগুলো chamber play-র মতো, অর্থাৎ যেগুলোকে থিয়েটারের সীমার মধ্যে আনা যায়। আর বাকিগুলো একদম সিনেমার বিষয়বস্তু; অর্থাৎ এত locations, এত জিনিস—এগুলোর মজাটাই থিয়েটারে আসবে না।

অনির্বাণ : মানে সেগুলো থিয়েটারে আনা সম্ভব নয়?

সৌমিত্রবাবু : হ্যাঁ, কোনো-একটা গল্প পাওয়া যেতেই পারে। কিন্তু সেটা কে করবে? আর আমার সেটা করতে ইচ্ছেও করে না, frankly speaking।

অনির্বাণ : আচ্ছা, আপনাকে যদি আবার নতুন করে জীবন শুরু করতে হত, আপনি কী-কী করতেন আর করতেন না যেগুলো already করে ফেলেছেন?

সৌমিত্রবাবু : যদি ইচ্ছের কথা বলা যায় তাহলে যা-যা করিনি সেগুলো করতাম।

অনির্বাণ : সবকিছু?

সৌমিত্রবাবু : হ্যাঁ। *(হঠাৎ অসম্মত হয়ে)* না না, সবকিছু মানুষ করে উঠতে পারে না।

অনির্বাণ : যা-যা করেননি বলতে ঠিক কী-কী?

সৌমিত্রবাবু : আমি তো মাটির ভাঁড় তৈরি করিনি; সেটা করতাম। *(হেসে)* কিংবা sculpture করতাম, যা করিনি। এসব কাজ করতাম। *(একটু ভেবে)* গান করতাম হয়তো।[১] এরকম বলছি যে, যেগুলো করিনি সেগুলো করতাম। আর সেগুলো তো আমার দূরতর ইচ্ছা! Normal course-এ আমি যা, আমি তা-ই। তার বাইরে তো আমি নিজেকে ভাবতে পারি না?

অনির্বাণ : অনেকসময় হয়-না যে, একটাকিছু করার ইচ্ছে ছিল, কিন্তু বাস্তবে সেটা করে উঠতে পারিনি?

সৌমিত্রবাবু : সেরকমভাবে অনেককিছুই তো আছে! *(অনেকটা থেমে)* ওই তো

বললাম এক কথায় যে, যেগুলো করিনি তার কিছুকিছু করার চেষ্টা করতাম।

অনির্বাণ : আমাদের পত্রিকার জন্য, পত্রিকার পাঠকদের জন্য, আজকের নাট্যকর্মীদের জন্য আপনি কোনো বার্তা দিন। মানে, কিছু-একটা বলুন।

সৌমিত্রবাবু : *(একটু ভেবে)* আমি ওই একটাই কথা বলব—আমাকে যে-জিনিসটা খুব পীড়া দেয়, দুঃখ দেয়, সেটা হল থিয়েটারে নানারকম ছোটো-ছোটো খাঁচা তৈরি করা। কোনোটা 'আর্ট থিয়েটার', কোনোটা 'শৈল্পিক থিয়েটার', কোনোটা 'বাণিজ্যিক থিয়েটার'। এটা 'রাজনৈতিক থিয়েটার', ওটা 'অরাজনৈতিক থিয়েটার'। এই বিভাগগুলো আমাকে পীড়া দেয়। সেইগুলো থেকে মুক্ত হওয়ার চেষ্টা করতে বলব আজকালকার নাট্যকর্মীদের। থিয়েটার এক এবং অবিভাজ্য। থিয়েটারের quality-র তফাত হতে পারে, উৎকর্ষের তারতম্য থাকতে পারে। কিন্তু থিয়েটার সামগ্রিক অর্থে কী, সারা পৃথিবীতে কী, তার দিকে তাকিয়ে পথচলার চেষ্টা করতে হবে। আর যে-কাজটা করছি সেটা ভালোবেসে করতে হবে। ভালোবেসে করলে তার ভেতরে বৈচিত্র্য, তার ভেতরে experiment—সবই আসতে থাকবে। ভালো না-বাসলে ওটা mechanical থেকে যাবে।

বিশ্বজিতের ক্যামেরার memory card *শেষ হয়ে যায়।*

এবার বিশ্বজিৎ কিছু প্রশ্ন করে।

বিশ্বজিৎ : স্যার, রবীন্দ্রনাথের নাটকের কি আরও বেশি চর্চার প্রয়োজন আছে বলে আপনার মনে হয়?

সৌমিত্রবাবু : রবীন্দ্রনাথের নাটকের? হয় তো অনেক! হয়েছে তো!

বিশ্বজিৎ : সেটা হয়েছে। তবে তাঁর এই সার্ধশতবর্ষ বলেই আমার জানার ইচ্ছে।

অনির্বাণ : সেটা কি যথেষ্ট? সেটাই ও জানতে চাইছে।

বিশ্বজিৎ : আপনার কি মনে হয় না যে, তাঁর নাটকের আরও বেশি চর্চার প্রয়োজন?

সৌমিত্রবাবু : আরও বেশি চর্চা? *(একটু হেসে)* মানে দ্যাখো, তাহলে তো দেশের মানুষ বলত যদি তাঁরা আরও বেশি নাটক দেখতে চাইত! রবীন্দ্রনাথের নাটকের কিন্তু একটা বিশেষ গড়ন আছে।

বিশ্বজিৎ : মানে, সংলাপের pattern-টা একটু অন্যরকম।

সৌমিত্রবাবু : সংলাপটংলাপ তো আছেই, গড়নটাই আলাদা। সেটা আপামরের

ভালো-লাগার মতো জায়গায় নেই। এটা clear করে বলাই ভালো। রবীন্দ্রনাথ তাঁর সমকালের শেক্সপিয়ার নন—এটা অস্বীকার করে কোনো লাভ নেই। শেক্সপিয়ার যেমন রবীন্দ্রনাথের মতো কোনোদিন গান লিখতে পারতেন না, *(হেসে)* সেরকমই রবীন্দ্রনাথও কখনও শেক্সপিয়ারের মতো নাটক লিখতে পারতেন না।

বিশ্বজিৎ : অবশ্যই।

সৌমিত্রবাবু : মানে, আপামরের জন্য। তার ভেতরের idea, অর্থাৎ ভাবনা, চিন্তা, মনন এবং কল্পনার যে-বিস্তার, সেগুলো বিশেষভাবে initiated দর্শক ছাড়া অন্যদের পক্ষে appreciate করা মুশকিল।

আমাদের আরও দু-একটা বিষয়ে আলোচনা হয়েছিল।

তবে সেগুলো off-the-record থাকাই ভালো।

সাক্ষাৎকার-গ্রহণ ও রেকর্ডিং: অনির্বাণ দে ও বিশ্বজিৎ কর্মকার
লিপিবদ্ধকরণ: অনির্বাণ দে

নাট্যভাবনা

গ্রুপ থিয়েটার ও সাধারণ রঙ্গালয়

সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়

বাংলা রঙ্গমঞ্চের ইতিহাসগত পর্বভাগ করতে অনেকেই দুটি মহান প্রতিভাধরের নামে দুটি যুগকে চিহ্নিত করেন—গিরিশ যুগ আর শিশির যুগ। এই দুজনেই যুগস্রষ্টা হিসাবে শ্রদ্ধেয়। শিশিরকুমার ভাদুড়ীর মৃত্যুর সঙ্গেসঙ্গে একটি যুগাবসান হয় ঠিকই, কিন্তু শিশির-পরবর্তী থিয়েটারের নতুন লক্ষণগুলি শিশিরকুমারের জীবনকালেই প্রকাশ পেতে আরম্ভ করেছিল। সাধারণ রঙ্গমঞ্চের তৎকালীন রুগ্‌ণ দশা কাটাতে থিয়েটার-ব্যবসায়ীরা চিত্রতারকাসমৃদ্ধ ভূমিকালিপিতে জোর দিলেন। থিয়েটার তার ব্যাবসায়িক শর্তকে উপেক্ষা করে চলতে পারে না এ কথা যেমন ঠিক, তেমনি শুধুমাত্র ব্যাবসায়িক দৃষ্টিতে যে-থিয়েটার চলে সে-থিয়েটার দেশের সংস্কৃতির ক্ষেত্রে, রুচির ক্ষেত্রে, মূল্যবোধের ক্ষেত্রে কোনোকিছুই দিতে পারে না। শিশির-পরবর্তী বাংলায় পাবলিক থিয়েটার শুধুমাত্র ব্যবসায়ী দৃষ্টিভঙ্গি থেকে চালিত হতে আরম্ভ করে এই সংকটের মধ্যেই প্রবেশ করেছিল। শুধুমাত্র ব্যবসায়ী দৃষ্টিভঙ্গি থেকে রঙ্গালয় পরিচালনা করার অনিবার্য পরিণতি হিসেবে থিয়েটারে 'অলীক কুনাট্য ও ক্যাবারে' প্রভৃতি সস্তা বিনোদনের স্থানই বড়ো হয়ে উঠল। জীবনবোধে সমৃদ্ধ নাটক, শিল্পবোধে উজ্জ্বল প্রযোজনা—সত্যি কথা বলতে—পাবলিক থিয়েটার থেকে বিদায় নিয়েছিল।

শিশিরকুমারের জীবনের শেষ পর্বেই ভারতীয় গণনাট্য সংঘ ও বহুরূপী, লিট্‌ল থিয়েটার গ্রুপ, প্রভৃতি গোষ্ঠীর আত্মপ্রকাশ হয়। জীবনমুখী ও নিরীক্ষামূলক থিয়েটারের সন্ধানে সাধারণ রঙ্গালয়ের বাইরে জোরদার নাট্য-আন্দোলন দানা বেঁধে ওঠে। গত তিরিশ বছরে এই আন্দোলনের অনেক বিস্তার হয়েছে। 'গ্রুপ থিয়েটার' নামে আজ এর পরিচিতি। এমনকি অনেকের কাছেই মননশীল শিল্পগুণান্বিত ভালো থিয়েটার আর গ্রুপ থিয়েটার সমার্থক হয়ে দাঁড়িয়েছে।

শিশিরকুমারের সময় পর্যন্ত কলকাতার সাধারণ রঙ্গালয়ই ছিল বাঙালির নাট্যসাধনার পীঠস্থান। ব্যাবসায়িক শর্ত পালন করেও মননে-চিন্তায়-শিল্পীচেতনায় এই থিয়েটার উদ্বুদ্ধ ছিল। দেশের আপামর জনসাধারণ ও শিল্পী-বুদ্ধিজীবী-গুণীজন একইসঙ্গে এই থিয়েটার থেকে আনন্দ পেতেন। শিশির-পরবর্তী যুগে এসে দর্শকের চাহিদা দ্বিধাবিভক্ত হয়ে গেছে। চিন্তাশীল ও চিন্তাহীন থিয়েটারের এই ফারাক তৈরি হয়েছে তিন দশক ধরে। ভালো থিয়েটারের সন্ধানী যে-দর্শক, তাঁরা পাবলিক থিয়েটারের দিকে ভুলেও আসেন না; আর দেশের গরিষ্ঠ দর্শক, যাঁরা পাবলিক থিয়েটারে চিত্তবিনোদন করেন, তাঁরাও বেশিরভাগ সময়ে ভালো থিয়েটারের ছায়া মাড়ান না। সাধারণ রঙ্গালয় যেমন মূঢ় প্রমোদবিতরণের মাধ্যম হয়ে দাঁড়িয়েছে (তাও অক্ষম মাধ্যম, কেন-না সবসময় যে তা বিনোদনে সক্ষম হচ্ছে না, তা তো ফ্লপ নাটকের

সংখ্যাধিক্য থেকেই বোঝা যায়), তেমনি গ্রুপ থিয়েটারও বেশিরভাগ সময়ে গরিষ্ঠ দর্শকের আনুকূল্যবর্জিত হয়ে ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র গোষ্ঠীর অহং তৃপ্ত করছে এবং অবশ্যম্ভাবী রক্তাল্পতায় ভুগছে। বলা বাহুল্য, আপামর জনসাধারণের কাছে উন্নততর থিয়েটারকে নিয়ে-যাওয়ার গণনাট্য যুগের আকাঙ্ক্ষা গ্রুপ থিয়েটারের কাছে আজ প্রায় নিরর্থক সাধ্যাতীত স্লোগানে পরিণত হয়েছে।

কিন্তু গত তিন দশকের মধ্যেও মিনার্ভায় উৎপল দত্ত—পরিচালিত লিট্‌ল থিয়েটার গ্রুপ, রঙ্গনায় অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়—পরিচালিত নান্দীকার একটি সত্যকেই তীক্ষ্ণভাবে সজাগ করে তুলেছিল যে, থিয়েটারকে আদতে গরিষ্ঠ দেশবাসীর কাছে পৌঁছোতে হবে, এবং গরিষ্ঠ দর্শক সাধারণ রঙ্গালয়েই নাটক দেখতে আসেন; অতএব ভালো থিয়েটারের জন্য লড়াইটা শেষপর্যন্ত সাধারণ রঙ্গালয় থেকেই করতে হবে।

আজ বোধহয় নাট্যকর্মীদের এই কথাগুলো ভাববার সময় এসেছে। সময় এসেছে 'গ্রুপ থিয়েটার', 'ব্যাবসায়িক থিয়েটার', ইত্যাদি মার্কাগুলো কিছুটা বিস্মৃত হয়ে ভালো থিয়েটারের কাজ যাতে এবং যেখানে ভালো করে হয় সেইদিকে তাকানোর; শত্রুর অধিকৃত দুর্গ কী-করে পুনরধিকার করা যায় সেই কথা ভাবার।

অভিনয় ও সংগীত

সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়

অভিনয়ের সঙ্গে সংগীতের সম্পর্ক নিয়ে কোনো আলোচনা আরম্ভ করলে প্রথমেই মনে হয়—এই দুটি কাজ এত ভিন্নজাতের যে এদের মধ্যে সম্পর্ক-আবিষ্কারের চেষ্টাটা একটু কষ্টকল্পনা হচ্ছে না তো? এটা অপ্রয়োজনীয় মানসিক ব্যায়াম নয় তো? তারপর মনে হয়—এটা মানসিক পেশিসঞ্চালন যদি হয়ও, তবু এই আলোচনা থেকে এমন একটা সূত্রপাত তো হতেও পারে যার থেকে ভবিষ্যতে সংশ্লিষ্ট কলাদুটির ক্ষেত্রে যোগ্য লোক নতুনতর আলোকপাত করতে পারেন। তা ছাড়া একটি কলাবিদ্যার পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসন্ধানের জন্যেই হয়তো অন্যান্য কলাবিদ্যার আলোচনা অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে। সেই কারণেই সংগীতকলার সঙ্গে অভিনয়কর্মের সম্পর্ক-অন্বেষণও অন্তত তত্ত্বালোচনার ক্ষেত্রে খানিকটা চিন্তাবর্ধক হিসেবে কাজ করতে পারে। কিন্তু আমি তাত্ত্বিক নই, সংগীতজ্ঞ তো নই-ই। সুতরাং এই দুই কলার সংজ্ঞা, প্রকৃতিভেদ, রূপভেদ, সাদৃশ্য, পারস্পরিক সম্বন্ধনির্ণয়—এইসব তাত্ত্বিক প্রশ্নের মীমাংসা করে আনুপূর্বিক একটা গবেষণা-প্রবন্ধ রচনা করে ফেলব, এমন মেকদার আমার নেই। অভিনয় করতে করতে কখনো-কখনো যেসব কথা মনে এসেছে সেইসব অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে সংগীত ও অভিনয়ের সম্বন্ধ-অনুসন্ধানীর আমি সঙ্গী হতে পারি মাত্র।

সংগীত আর অভিনয়ের সাদৃশ্য খুঁজতে গেলে বোধহয় খুব বেশিদূর এগোনো যাবে না। দুটোই—ইংরেজিতে যাকে বলে পারফর্মিং আর্টস—তারই আওতায় পড়ে; অর্থাৎ যেসব শিল্পকলা দর্শক-শ্রোতার সামনে সরাসরি কলাকারের দ্বারা পরিবেশিত ও তাৎক্ষণিক, সংগীত ও অভিনয় সেই কলাগোষ্ঠীর মধ্যেই পড়ে। বাইরের সাদৃশ্য বোধকরি ওইখানেই শেষ। কণ্ঠসংগীতশিল্পী আর অভিনেতা দুজনেই তাদের দেহযন্ত্র ব্যবহারের মধ্যে দিয়ে তাদের আপন-আপন শিল্প পরিবেশন করে বটে, কিন্তু ওই দুই কলাবিদের পরিবেশিত কলার মধ্যে মিল খুঁজতে যাওয়া ভাস্কর্য ও চিত্রকলার মধ্যে মিল খোঁজার থেকেও বেশি বিভ্রান্তিকর। দু-রকমের পদ্ধতিতে দু-রকমের প্রকরণে হলেও ভাস্কর্য ও চিত্রকলা মোটামুটিভাবে যে-রূপসৃষ্টির প্রয়াস করে তার মধ্যে তবু সাদৃশ্য থাকতে পারে। ভাস্কর্য হয়তো মানুষকে গড়ছে; চিত্রকলাও মানুষকে আঁকছে। ভাস্কর্যও প্রকৃতির কাছ থেকে তুলে এনে গাছপালা-পশুপাখিকে রূপের মধ্যে বন্দি করছে; চিত্রকলাও তাই। বিমূর্ত শিল্পরীতিতেও এই দুই মাধ্যমের মধ্যে সাদৃশ্য হয়তো থেকে যেতে পারে, কিন্তু সংগীত আর অভিনয়ের মধ্যে মাধ্যমগতভাবেই আকাশপাতাল তফাত। গানের মতো পুরোপুরি না-হলেও—কারণ দেহের বা মুখের আচরণ

ও অভিব্যক্তিও অভিনয়ের একটা বড়ো আশ্রয়—অভিনয়কেও নির্ভর করতে হয় কণ্ঠজাত শব্দের ওপর। কিন্তু গানের শব্দ সুরের মধ্যে আশ্রয় পায়; অভিনয়ের শব্দ অবলম্বন করে থাকে ভাষাকে। প্রধানত ভাষার মাধ্যমেই মানুষের চিন্তা, মানুষের ভাবাবেগ, প্রভৃতি অভিনয়ের মধ্যে বিকশিত হয়। মানবজীবনের সরাসরি ভাবপ্রকাশের বাহনই হল ভাষা। ভাবের, চিন্তার সর্ববাদী স্বীকৃত প্রতীক (symbol) হল ভাষা। ভাষার ওপর মূলত দাঁড়িয়ে থাকে বলে অভিনয়কে যদিবা প্রতীকী বলা যায়, কিন্তু বিমূর্ত কখনোই বলা যায় না। সংগীত আদতেই বিমূর্ত—abstract। মানুষের মনের চিন্তা, কল্পনা, ভাবাবেগ সরাসরি সুর হয়ে ওঠে না। শব্দের পৃথিবীতে, আমরা জানি, দুটো জাত আছে। এক জাতের শব্দ সাংগীতিক, আর-এক জাতের শব্দ অসাংগীতিক। সংগীতকলার জন্মই ওই সাংগীতিক শব্দের বিশিষ্টতার জন্যে। এই বিশিষ্টতাই সংগীতকে অন্য সমস্ত শিল্পকলার থেকে স্বতন্ত্র করেছে। এই বিশিষ্টতাই এই কলাকে বিমূর্ত করেছে। মানুষের চিন্তা, কল্পনা, আবেগ তাই সরাসরি সংগীতের মধ্যে স্ব-রূপে প্রকাশ পায় না। তার নির্যাস, তার সৌরভ, তার শোভাসার সাংগীতিক শব্দের বিমূর্ততার মধ্যে ব্যঞ্জনা পায়। তাই মাধ্যমগতভাবে সংগীতের সঙ্গে কোনো শিল্পকলারই সাদৃশ্য নেই। অন্য শিল্পকলা কোনো-না-কোনোভাবে রূপসৃষ্টির কার্যে নিযুক্ত। মানুষের দুঃখ, সুখ, ভয়, শোক, লাভ, ক্ষতি, উল্লাস, বিষাদ, মানুষের অতীত-বর্তমানের অবস্থান, ভবিষ্যতের কল্পছবি—মোট কথা, পরিবেশ, পরিকল্পনা, উপজীব্য, উপকরণ—সব নিয়ে যে-মানবজীবন, তারই কোনো-না-কোনো রূপসৃষ্টির কার্যেই অন্য শিল্পকলা নিয়োজিত আছে। এমনকি মানুষের শুদ্ধ কল্পনাও যখন তারা মূর্ত করতে চায় তখনও তারা রূপেরই আশ্রয় নেয়। দশভুজার মূর্তি থেকে পিকাসোর ছবি, হেনরি মুরের ভাস্কর্য এই সত্যেরই সাক্ষ্য দেবে। কিন্তু সংগীত অ-রূপকে ব্যক্ত করে বলেই তা বিমূর্ত।

সাদৃশ্য না-থাকলেও সংগীতের সঙ্গে অভিনয়ের কি কোনো সম্বন্ধই নেই? অভিনয় যে নাট্যকলা ও চলচ্চিত্রের অন্যতম প্রধান অবলম্বন, সেই নাট্যকলা ও চলচ্চিত্রশিল্প তো সমস্ত কলাবিদ্যার মিলনক্ষেত্র। সেখানে অভিনয়ের সঙ্গে সংগীতের যে সম্বন্ধ গড়ে উঠবেই, এ আর বিচিত্র কী? খুব সোজাসুজিভাবেই তো আমাদের লোকনাট্যে-যাত্রায়, চিন-জাপানের নাট্যকলায়, কিংবা ইউরোপের অপেরায়, এমনকি থিয়েটার-সিনেমার মিউজিকাল্‌সেও অভিনয় আর সংগীত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধের মধ্যে জড়িত হয়ে আছে। এইসব নাট্যের জন্যে অভিনেতাকে অনেকসময়েই গানবাজনায় যে-পারদর্শিতা অর্জন করতে হয় তা শুদ্ধ সংগীতচর্চার মানদণ্ডেও খুব উঁচুতেই জায়গা পাবে। শ্যালিয়াপিনের মতো শিল্পীকে বড়ো

অভিনেতা বলব, না কি বড়ো গায়ক বলব?

থিয়েটারের ঐতিহ্য চলচ্চিত্রেও বহুদিন অবধি বহমান ছিল। বিদেশের সিনেমায় এবং আমাদের দেশের সিনেমাতেও এমন বহু অভিনেতা-অভিনেত্রী ছিলেন যাঁরা খুব ভালো গান জানতেন, এবং নিজেদের মুখের গান নিজেরাই গাইতেন। প্লেব্যাক প্রথার দৌলতে সিনেমায় আমরা যেমন অনেক গুণী গাইয়ের কণ্ঠমাধুর্যকে পেয়েছি, তেমনি এই প্রথার জন্যেই সিঙ্গিং স্টারদেরও হারিয়েছি। প্লেব্যাক প্রথার সুবিধা হল, সুরহীন অভিনেতার জন্যেও সুরেলা গলার বিভ্রম তৈরি করা যায়। বিনোদনের ক্ষেত্রে তার দাম আছে। কিন্তু এই প্রথার অসুবিধা হল, শিল্পীর নিজের গলার গান শুনতে পাওয়ার যে-উপরি লাভ, বিভিন্ন শিল্পীর ভিন্নভিন্ন গায়নের যে-বৈচিত্র্য, সেটা আর আমরা উপভোগ করতে পাই না।

এই প্লেব্যাক প্রসঙ্গে একটা কথা এইখানে মনে হচ্ছে যে, এমনকি প্লেব্যাক-করা গানে ঠোঁট নেড়ে গলা মেলাতে গেলেও অভিনেতার অন্তত কিছুটা সংগীতবোধ থাকা দরকার। যারা একটু-আধটু গাইতে পারে তারা ওই কাজটা অনেক বেশি স্বাচ্ছন্দ্যের সঙ্গে করে এবং অভিনয়টাও তাতে ভালো হয়।

অভিনেতার পক্ষে সংগীতের শিক্ষা থিয়েটারে প্রভূত কাজে দিতে পারে। অভিনেতা-অভিনেত্রীদের যেসব শিক্ষা পাওয়া অবশ্যকর্তব্য, আমার মনে হয়, গান গাইবার শিক্ষাটা তার মধ্যে অত্যাবশ্যক হওয়া উচিত। গান-জানা অভিনেতা-অভিনেত্রী যথেষ্ট সংখ্যায় কলকাতার থিয়েটারে নেই বলেই বহু ধরনের নাটক আমাদের থিয়েটারে হতে পারে না। *আলিবাবা*, *আবুহোসেন*, *বাল্মীকি প্রতিভা* আমাদের থিয়েটারে আর তো করাই যায় না! ব্রেশ্‌টের নাটকের সত্যিকারের অভিনয় এখানে বোধহয় এই কারণেই সম্ভব নয়। অথচ সংগীতময় নাটক যে থিয়েটারকে কতখানি উদ্‌বেলিত করতে পারে, *চরণদাস চোর* দেখেও তো কলকাতার দর্শক তা বুঝতে পারেন।

গানের শিক্ষা অভিনেতার পক্ষে শুধু যে গীতপ্রধান নাটকের ক্ষেত্রেই প্রয়োজন হয়, এমন মনে হয় না। অভিনেতার সবথেকে বড়ো হাতিয়ার যে কণ্ঠস্বর ও বাক্‌পটুতা, তার ক্ষেত্রেও এই শিক্ষা কাজে লাগতে পারে। বিভিন্ন স্বরগ্রামের মধ্যে দিয়ে গলাকে নিয়ে যেতে অভিনেতার যে স্বরসাধনা হয় তার থেকে অভিনেতার কণ্ঠের ব্যাপ্তি বাড়ে। কোন্ স্বরগ্রামে গলা কীভাবে যেতে পারে তার ধারণা তৈরি হয়। শ্বাসনিয়ন্ত্রণের দক্ষতাও বাড়তে পারে। কতটা তীব্রভাবে বা কতটা মোলায়েমভাবে স্বরকে ছুঁলে কণ্ঠস্বর কী ধরনের ভাব বা আবেগকে ব্যক্ত করতে পারে তার কিছুটা বোধ গানের চর্চা থেকেও তৈরি হতে পারে। আমি নিজে

গাইয়ে নই। তবু অভিনয়ের জন্যে আমি যেসব স্বরচর্চা করে থাকি, তার মধ্যে অল্প বয়েস থেকেই একটা অভ্যাস আমার ছিল। একটা-কোনো কবিতার এক-একটা লাইন হারমোনিয়ামের এক-একটা স্বরের সঙ্গে মিলিয়ে আমি অভ্যাস করেছি। এখনও করি। নিজের গলার যে-স্বাভাবিক স্কেল, তার নীচের সা থেকে ওপরের সা—এই একটা অক্টেভ, এবং সেই স্কেলের নীচে খাদের দিকে এবং ওপরে চড়ার দিকে আরও দুই অক্টেভে গলা কতটা নিয়ে যাওয়া যায়, কবিতার লাইনগুলি সুরে নয়, স্বরে বলে আমি অভ্যেস করি, কারণ তিন অক্টেভের গলা তৈরি করা অভিনেতার লক্ষ্য হওয়া উচিত।

এ ছাড়াও ওইভাবে একদমে কতগুলি লাইন বলা যায়, কত দ্রুত বা কত ধীরে বলা যায়, কত দ্রুত গলা উঠিয়ে নিয়ে যাওয়া বা নামিয়ে আনা যায়—এসব স্বরচর্চা আমি সুরকে কানে রেখে হারমোনিয়ামের রিডের সঙ্গে গলা মিলিয়েই করি। আমার বিশ্বাস, এইভাবে স্বরচর্চা আমার কাজে এসেছে। আমার গলার ব্যাপ্তি, তীব্রতা, জোয়ারি এতে কিছুটা বেড়েছে বলেই আমার ধারণা। এমনকি কেন জানি না মনে হয়, বয়েসের সঙ্গেসঙ্গে মানুষের কণ্ঠের যে তরুণতা ক্রমশ হারিয়ে যায়, সুরের চর্চা করলে তাকেও খানিকটা ধরে রাখা যায়।

সংগীতের আর-একটি ব্যবহার আমি একবার একটি চলচ্চিত্রাভিনয়-শিক্ষার বিদ্যায়তনে দেখেছিলাম। সেখানে একটি ক্লাস হত যেখানে বিভিন্ন ধরনের যন্ত্রসংগীতের রেকর্ড চালিয়ে দিয়ে ছাত্রছাত্রীদের বলা হত সেই সংগীত তাদের মধ্যে যে-ধরনের প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করছে সেটা তারা শারীরিক ভঙ্গি, গতি বা আন্দোলনের দ্বারা ব্যক্ত করার চেষ্টা করুক। সেই সংগীতের সঙ্গে movements-গুলি নাচও হতে পারে, কিন্তু নাচ হতেই হবে এমন নয়। সম্পূর্ণ স্বাধীন, স্বতোৎসারিত movement-এর দ্বারা সংগীতের ব্যঞ্জনাকে নিজের দেহের মধ্যে ব্যক্ত করতে বলার মধ্যে দিয়ে যে-শিক্ষাটা আসলে অভিনয়শিক্ষার্থীকে দেবার প্রয়াস করা হয়, সেটা ব্যালে, নানান নৃত্যশৈলীতেই রয়েছে—সংগীতের প্রভাব নটের শরীরের মধ্যে আত্মস্থ করা এবং তাই দিয়ে আত্মসচেতনতার স্নায়ুচাপ দূর করা। শরীরের অত্যধিক সচেতনতা এবং তজ্জনিত টেনশন অভিনেতার মনকে শৃঙ্খলিত করে রাখতে পারে। সেটা কাটানোর জন্যে যে দেহ অভিনেতার কলাপ্রকাশের মাধ্যম, সেই দেহযন্ত্রকে সাংগীতিক ও সাবলীল করে তোলার জন্যে সংগীতের এই ব্যবহার আমার খুব ভালো লেগেছিল। আত্মসচেতনতার অস্বাচ্ছন্দ্য কাটিয়ে মনকে শান্ত (relaxed) ও অভিনয়ের চরিত্রে নিবিষ্ট (concentrated) না-করতে পারলে দেহ অভিনেতার বশে থাকে না। সেদিক থেকে সংগীতের মধ্যে দিয়ে relaxation ও concentration অর্জন করার শিক্ষা অত্যন্ত ফলদায়ক। সংগীতের প্রয়োগে

মানসিক স্বাস্থ্যের আধুনিক চিকিৎসার সঙ্গেই এই প্রক্রিয়ার তুলনা চলে।

শুধু গান নয়, এমনকি আবহসংগীত যেখানে যাত্রা-থিয়েটার-সিনেমার এক খানি প্রয়োজনীয় অঙ্গ, সেখানে সংগীতের অন্তত প্রাথমিক বোধ থাকলে শুধু পরিচালকের নয়, অভিনেতারও নিশ্চয়ই সাহায্য হয়। নাটকে বা ছবিতে কোথায় সংগীত থাকবে বা থাকবে না, সেই বিবেচনা অভিনয়কে কিছুটা প্রভাবিত করতে পারে বই-কি! বিশেষত নাটকের প্রযোজনায় যেখানে-যেখানে সংগীত ব্যবহার করা হয়, সেখানে রিহার্সালের সময় থেকেই সংগীতের সঙ্গে সময় হিসেব করে অনেকসময় সংলাপ বলতে হয়। সেখানে বস্তুত অভিনয়ের সময়ে অভিনেতা আবহসংগীত শুনছেন। সংগীত সেখানে অভিনেতাকে প্রযোজনার অভিপ্রেত ভাবের অভিব্যক্তিতে সাহায্য করতে পারে, প্রেরণা দিতে পারে।

সংগীতের এই প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ ছাড়াও হয়তো অভিনয়ের মধ্যে সংগীতের আর-এক ধরনের অপ্রত্যক্ষ প্রতিভাস থেকে যেতে পারে। ভালো গানবাজনা অন্তত শ্রোতা হিসেবেও যে-অভিনেতা শুনে আসছে, তার মনের মধ্যে সংগীতের এক প্রচ্ছন্ন পলি কি পড়ে না? অভিনেতার মনসিজ চরিত্র গড়ার সময়ে সেই পলিমাটি কি কোনো কাজেই আসে না? কখনো-কখনো সেইসব দুর্লভ অভিনয় কি আমাদের চোখে পড়ে না যা দেখলে মনে হয় এই অভিনয়কর্মের মধ্যে যেন একটা সংগীতের গঠন আছে, সুরের স্পন্দন আছে?

তবে যে-জিনিসটা সত্যিসত্যিই সংগীত আর অভিনয় উভয়ক্ষেত্রেই উপস্থিত, সেটা হল ছন্দ! ছন্দই সমস্ত শিল্পকলার প্রাণবস্তু। জীবনের সুষমার মূলেই হল ছন্দ। মানুষের শ্রমে-বিশ্রামে-কর্মে-ক্রীড়ায়, মানুষের যাবতীয় ক্রিয়ার মধ্যেই তো ছন্দ। মনের ভাবপ্রকাশের সবথেকে বড়ো যে-মাধ্যম—ভাষা—তার গঠনের মধ্যেও হাজার রকমের ছন্দ। শুধু কাব্যভাষায় নয়, গদ্যে, এমনকি মানুষের মুখের কথাতেও অমোঘ অভ্রান্ত ছন্দ। অভিনয়ের ক্ষেত্রে এই ছন্দবোধকে ব্যাখ্যা করা হয়তো দুরূহ, কিন্তু চিনতে ভুল হয় না। অভিনয়ের মধ্যে মানুষের বাক্যরীতির ছন্দ, বিবিধ কর্মের ছন্দ বারবার ফুটে ওঠে। স্বতঃস্ফূর্ত উপস্থিতি ছাড়াও দক্ষ অভিনেতা সচেতনভাবেই তার ছন্দবোধকে অভিনয়ের মধ্যে ব্যবহার করতে পারে। চলাফেরায়, অঙ্গচালনায়, কথার ওজন কমবেশি করায়, কথার বিভিন্ন লয় সৃষ্টি করায়, বিরাম বা যতি বা স্তব্ধতার বিচিত্র ব্যবহারে অভিনেতা অভিনয়ের মধ্যে ছন্দের সঞ্চার করতে পারে।

সংগীতের মধ্যে এই ছন্দ সুনির্দিষ্ট, বিধিবদ্ধ, শাস্ত্রসম্মত। অভিনয়ে তেমন নয়। নয় বলে অভিনেতার অসুবিধে হয় বই-কি! সেই ছন্দবোধ আয়ত্ত করার বিধিবদ্ধ রাস্তা থাকলে

তা আয়ত্ত করাও সহজতর হত, এবং তার বিচারেরও অন্তত একটা মানদণ্ড পাওয়া যেত। তাল-পরিমাপের জন্যে এমনকি যন্ত্রও তো তৈরি হয়ে গেছে বহুকাল! কিন্তু অভিনেতার এই ছন্দবোধ আয়ত্ত করার কোনো নির্দিষ্ট বিধিবদ্ধ উপায় নেই। সংগীতের তালের দিকে কান পেতে, কবিতার ছন্দের দিকে কান পেতে, অপরাপর শিল্পকলার রূপের দিকে তাকিয়ে থেকে সে এই ছন্দ একটু-একটু করে জারিয়ে নেয়। জীবনের দিকে তাকিয়ে, মানুষের দিকে তাকিয়ে, প্রাণীজগতের—এমনকি উদ্ভিদজগতের—চঞ্চলতার দিকে চোখ মেলে সে এই ছন্দকে বুঝতে চেষ্টা করে। তারপর যেখানে রক্তের আদিতাল হৃৎপিণ্ডের মধ্যে বেজে চলেছে, শ্বাসপ্রশ্বাসের প্রাথমিক ছন্দ বুকের তলা থেকে উৎসারিত হচ্ছে, সেই 'আপন হৃদয়গহনদ্বারে কান পেতে' থাকতে থাকতে কোন্‌দিন হয়তো সৃষ্টির অমোঘ ছন্দের রহস্য তার কাছে ধরা পড়ে।

[*সপ্তর্ষি প্রকাশন-প্রকাশিত চরিত্রের সন্ধানে (প্রথম সংস্করণ: ২০০৬) গ্রন্থ থেকে লেখক ও প্রকাশকের অনুমতিক্রমে (প্রয়োজনীয় সম্পাদকীয় পরিমার্জনা-সহ) পুনঃপ্রকাশিত হল।*]

অভিনয়: চলচ্চিত্রে ও মঞ্চে

সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়

একজন অভিনেতার চরিত্রসৃষ্টিতে চলচ্চিত্র ও রঙ্গমঞ্চ—এই দুটি শিল্পমাধ্যমের কোন্‌টি কেমনভাবে সাহায্য করে?

এর খুব সোজাসুজি উত্তর দিয়ে বোঝানো মুশকিল। আমি বরং অভিনেতার দিক থেকে এই দুটি মাধ্যম কীরকম আলাদা সমস্যা, আলাদা দাবি নিয়ে উপস্থিত হয়, সেই কথাটা আলোচনা করার চেষ্টা করছি।

প্রথমেই বলা ভালো, অভিনেতার একদিকে নাট্যকার বা চিত্রনাট্যকার, অন্যদিকে দর্শক। যে-লেখাটি আশ্রয় করে অভিনেতা অভিনয় করবেন, যে-লেখাটির ব্যাখ্যা করবেন, বিশ্লেষণ করবেন, রূপ ফুটিয়ে তুলবেন, সেটি অভিনেতার একদিকে; আর একদিকে যাঁদের জন্য করবেন, অর্থাৎ দর্শক। নাটক বা চিত্রনাট্য, অভিনেতা ও দর্শক—এই তিনই হল অভিনয়ের আদিশর্ত। এখন ধরুন, গ্রিক নাটকে কি যাত্রায় এই তিন শর্ত পূরণ করলেই অভিনয় সম্ভব হয়। নাটক আছে, দর্শক আছে, অভিনেতা আছে—তাহলেই অভিনয় হবে। কিন্তু আধুনিক থিয়েটারে তা হবার জো নেই। সেখানে শুধুমাত্র অভিনেতা আর তার আশ্রয় নাটকটি হলেই চলবে না, সেই অভিনয় দর্শকের কাছে পৌঁছোনোর আগে বেশকিছু প্রকরণের দরকার হয়ে পড়ে। মঞ্চ চাই; মঞ্চ আলোকিত হওয়া চাই; স্থানকালপাত্রকে ব্যঞ্জিত করে মঞ্চসজ্জা, দৃশ্যপট, আহার্য, ইত্যাদি চাই; এবং আধুনিক থিয়েটারে আধুনিক জীবনের আনুষঙ্গিক শব্দাবলি ও সংগীত চাই আবহসৃষ্টির জন্যে। তাই আধুনিক থিয়েটারে শুধু নাট্যকারের সংলাপ নয়, এইসব প্রকরণকে মনে রেখে ব্যবহার করেই অভিনয়কর্মটা সম্পন্ন করতে হয়। তবে এতসব প্রকরণ অভিনেতার সঙ্গে জড়ো হলেও অভিনয়টা দর্শকের কাছে পৌঁছোয় প্রত্যক্ষভাবেই, সোজাসুজি। যদিও মাঝখানে প্রসিনিয়ামটা—অর্থাৎ অদৃশ্য চতুর্থ দেওয়ালটি—দর্শকের সঙ্গে খানিকটা দূরত্ব তৈরি করে দেয়।

কিন্তু এই অভিনয়ও তো একটা ঘরের মধ্যে আটকা পড়ে থাকে। তাকে দেখতে হলে দর্শককে আসতে হবে সেই ঘরে। এবং কিছুটা ভ্রাম্যমাণ হয়ে নানা জায়গায় ঘোরার ব্যবস্থা হলেও সে অভিনয় ব্যাপারটা যতসংখ্যক দর্শকের কাছে পৌঁছোবে তা খুব-একটা বিশাল নয়। পৌঁছোনোর পথে আবার অনেক বাধা, অনেক হাঙ্গামা। কিন্তু অভিনয়টা যদি ক্যামেরা আর শব্দধারক যন্ত্রের সাহায্যে চলমান চিত্রের মধ্যে বন্দি করে 'ক্যান'-এ ভরতি করে ফেলা যায় তাহলে একই

অভিনয় অনেক অনেক বেশিসংখ্যক মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হয়। ক্যামেরা ও শব্দযন্ত্র তাই এইদিক থেকে অভিনয়কে চলে বেড়াবার পা তৈরি করে দিয়েছে, বহু লোকের কাছে পৌঁছোবার যান হয়ে উঠেছে যন্ত্র।

অন্যদিকে আবার চলচ্চিত্রে ধৃত হবার জন্যে ক্যামেরা, শব্দধারক যন্ত্র—এইসব নতুন প্রকরণ যোগ হবার ফলে অভিনয়ের কারুকর্মে, শৈলীতে নতুন-নতুন সব দাবি তৈরি হয়েছে। ক্যামেরার চোখ দিয়েই দর্শক সিনেমার অভিনয় দেখেন বলে সার্থকভাবে কাহিনিটা বিবৃত করতে ক্যামেরাকে কখনও কাছে, কখনও দূরে, কখনও নীচে, কখনও ওপরে, কখনও স্থির, কখনও চলমান হয়ে অভিনয়কে চিত্রায়িত করতে হয়। এই কারণেই শট থেকে শটের পারম্পর্যে ছবি তৈরি হয়। এইটেই এডিটিংয়ের মূলকথা। আর এই শটগুলি বা তাদের বৈচিত্র্য ও সীমাবদ্ধতা আছে বলেই—এক কথায়, এডিটিং আছে বলেই—সিনেমার অভিনেতার সামনে একটা নতুন প্রকরণ এবং নতুন চ্যালেঞ্জ এসে উপস্থিত হয়। সেটাই এই মাধ্যমের বিশিষ্টতা।

ছোটো-ছোটো বহু শটে সিনেমা ভাগ করা। তার অভিনয়ও ছোটো-ছোটো শটে ভাগ করা। মঞ্চের অভিনয়ও প্রবেশপ্রস্থান, দৃশ্য থেকে দৃশ্যান্তরে ভাগ করা; কিন্তু কয়েক-সেকেন্ডের-শটে-ভাগ-করা সিনেমার অভিনয়ের সঙ্গে তার অনেক তফাত। তার ওপরে মঞ্চের অভিনয়ের মহলা বা প্রস্তুতিপর্ব হয়ে গেলে নাট্যানুষ্ঠানের সময়ে মোটামুটি সময়ের ক্রম অনুসরণ করেই অভিনয়টা চলতে থাকে; ফলে আবেগ-অনুভূতির ক্রমবিবর্তনটা অভিনেতার পক্ষে ধরে-রাখাটা তত বড়ো সমস্যা নয়। কিন্তু সিনেমার শুটিং যখন হয়, তখন একটা ঘরের সেট একবারই তৈরি হয়, কিম্বা বহির্দৃশ্য নেওয়ার সময়ে এক সমুদ্রতীরে একসঙ্গেই সমুদ্রসমীপের সমস্ত দৃশ্যই গ্রহণ করে ফেলা হয়, কেন-না সিনেমা তৈরি করতে অনেক টাকা লাগে—এক সেট বারবার তৈরি করা ব্যয়সাপেক্ষ। এক আউটডোরে বারবার যেতে হলে বাজেট বেড়ে যাবে।

এখন ধরুন, সেই ঘরের সেটে হয়তো ছবির প্রথম দিকের একটি দৃশ্য আছে, মাঝের দিকের একটি দৃশ্য আছে (যা পর্দায়, ধরুন, মনে হতে পারে এক বছর পরের ঘটনা), এবং শেষের একটি দৃশ্য আছে (যা ছবিতে পাঁচ-সাত বছর পরেও ঘটছে বলে আমরা দেখতে পারি)। এই দৃশ্যগুলি পরপর একদিনেই তোলা হয়ে গেল। কিন্তু প্রথমের ঠিক পরে যে-দৃশ্যটি ছবিতে দেখা যাবে সেটি হয়তো আবার তোলা হল একেবারে শুটিয়ে শেষদিকে, ছ-মাস বা এক বছর পরে। সিনেমার অভিনেতাকে তাই সমগ্র ছবির ধারণাটিকে যতদিন ধরে ছবি তৈরি হবে ততদিন বুকে করে বেড়াতে হবে। নইলে অংশবিশেষের অভিনয়ের সময়ে সমগ্রতার সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখা যাবে না। এই ধারণ করে রাখার ক্ষমতা চলচ্চিত্রাভিনেতার একটা বড়ো পরীক্ষা।

মঞ্চের অভিনেতার এ-সমস্যা নেই। মহলায় একটু-একটু করে একটা ইমারত তৈরি

করে নেওয়া তার কাজ। কিন্তু তৈরি হয়ে গেলে ভেঙে ফেলে এক বছর বা ছ-মাস পরে ইমারতের খানিকটা অংশ নতুন করে তৈরি করার দায়িত্ব তার নেই। কিন্তু আজকাল যে দীর্ঘদিন ধরে একটা নাটক চলতে থাকে, এ আবার একটা নতুন সমস্যা তৈরি করে। সপ্তাহে চার-পাঁচবার একই নাটকে একই অভিনয় বছরভর কি কয়েক বছরও করতে হতে পারে, অথচ অভিনয় তাজা জীবন্ত থাকবে প্রথম কয়েক রাত্রির মতো। এই সমস্যাটা মঞ্চাভিনেতার বেশ বড়ো একটা সমস্যা। প্রথম রাত্রিতে যে-ইমারত সম্পূর্ণ হয়েছে, কয়েকশো রাত্রির পরেও সেখানে প্রেরণার আলোটি সময়মতো জ্বালানো খুবই দুরূহ কাজ। তবে যাঁদের অভিনয়ে পেশাদারের দায়দায়িত্ব নেই—মাসে দু-একদিন শখে অভিনয় করেন, তাঁদের অবশ্য এটা বড়ো-একটা ভাবতে হয় না।

ক্যামেরা আছে বলে সিনেমার অভিনয় থিয়েটারের অভিনয়ের থেকে আর-একটা ব্যাপারে বেশ খানিকটা বদলে যায়; অভিনয়রীতির প্রায় চরিত্রগত পার্থক্য তৈরি হয়। এই পার্থক্যটা হয় অভিনয়ের মাপে। থিয়েটারের অভিনয়ে নিকটতম দর্শকও থাকেন বেশ কয়েক হাত দূরে। স্বাভাবিক জীবনের অনুসরণ করে অভিনয় করলে মুখের সূক্ষ্ম ভাবপরিবর্তন বা দৃষ্টির ঈষৎ বিকার অনেক সময়েই তার চোখে পড়বে না। তা ছাড়া শুধু কাছের দর্শকের কথা ভেবে মঞ্চে তো অভিনয় করা চলে না, দূরের দর্শকের কথা ভাবতে হয়। এমনকি অভিনেতার থেকে আড়াআড়িভাবে বাঁ- বা ডানদিকে-বসা দর্শকের দৃষ্টিকোণও ক্রমশ বদলে যায়—সে-কথাও ভাবতে হয়। সিনেমায় কিন্তু আদর্শ দর্শকের দৃষ্টিকোণ হিসাবে ক্যামেরাই কাজ করে। শুধু ক্যামেরার লেন্সের কথা ভাবলেই চলে সেখানে। দু-একসময় লং শটে ছাড়া ক্যামেরা সেখানে প্রায়শই অভিনেতার এত কাছাকাছি থাকে, তার দৃষ্টি এত কাছে থাকে যে, একজন কেউ ঘরে ঢুকছে—এটা সিনেমার অভিনয়ে চোখের তারাকে সামান্য ঘুরিয়েই বুঝিয়ে দেওয়া যায়। কিন্তু মঞ্চে ঘাড়টি পুরো ঘুরিয়ে দেখলে তবে দূরের দর্শক বুঝতে পারবেন যে, অভিনেতা নবাগতকে লক্ষ করলেন। খুব দূরের দর্শকের কাছে broad gesture ছাড়া অন্যকিছু পৌঁছোনো মুশকিল। তাই থিয়েটারের অভিনেতা নির্ভর করে broad gesture-এর ওপর খানিকটা, এবং তার থেকেও বেশি করে কণ্ঠস্বরের ওপর—তার কাঙ্ক্ষিত অনুভূতি বা আবেগ দর্শককে পৌঁছে দেবার জন্যে। সেখানেও আবার স্বাভাবিক জীবনে আমরা যেমন কথা বলি তার থেকে বড়ো করে, তীব্র করে গলাকে বাঁধতে হয়। তাই বলে broad gesture বা কণ্ঠস্বরের বাহুল্যটুকু যেন দর্শকের কাছেও অতিরিক্ত বলে না-ঠেকে। সেই মাপটাই জানতে হয়। সেই মাপটা আয়ত্তে এলে তবেই শিল্প তৈরি হয়। না-হলে অস্বাভাবিক, অবাস্তব, অনিপুণ চিৎকার ও অঙ্গবিক্ষেপের মধ্যেই অভিনয়ক্রিয়া শেষ হবে।

সিনেমায় কিন্তু শব্দধারক যন্ত্র আছে অভিনেতার কণ্ঠস্বরকে দর্শকের কাছে পৌঁছে

দিতে। তাই গলার পর্দাকে স্বাভাবিকের খুব কাছে রাখার সুযোগ আছে সেখানে। বরং না-রাখলেই শ্রুতিকটু হবে। তাই বলে সিনেমার অভিনেতার গলা ভাবপ্রকাশে অক্ষম হলে কি চলবে? না। যে-কণ্ঠে বিভিন্ন আবেগ-অনুভূতি প্রকাশ হবে সে-কণ্ঠকেও তৈরি হতেই হবে, শিক্ষিত হতে হবে, নিয়ন্ত্রিত হতে হবে। শুধু তার শব্দক্ষেপণের মাপটা হবে আলাদা।

আর চলচ্চিত্রে ক্যামেরা নামক যন্ত্রটি গল্প বলার খাতিরে মাঝেমাঝে অভিনেতার মুখের এত কাছে চলে আসে যে, ছ-ইঞ্চি পরিমাণ একটি মনুষ্য-মুখাবয়ব তিরিশ ফুট–চল্লিশ ফুট বড়ো ক্লোজআপে পরিণত হয়। এবং সামনের সারিরই হোক আর পিছনের সারিরই হোক, দর্শক সেই বিরাট মুখচ্ছবির প্রত্যেকটি সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অভিব্যক্তি দেখতে পান। সেখানে স্বাভাবিক জীবনের মাপে হাসলে, বা চোখ কোঁচকালে, বা ঠোঁট বেঁকালে, সেটাও অনেক সময়ে অতিরিক্ত মনে হতে পারে; দৈত্যরাজ্যে উপযুক্ত, মানুষের মুখে বেমানান বলে ঠেকতে পারে। সেখানে অভিব্যক্তিকে স্বাভাবিকের থেকেও সংক্ষিপ্ত করতে হতে পারে, স্বাভাবিকের থেকেও মাপটা ছোটো করে আনতে হতে পারে। সিনেমার অভিনেতাকে তাই ক্যামেরা মনে রেখে অভিনয় শিখতে হয়। তবে এক্ষেত্রেও ওই একই কথা—কতটা কমবে অভিব্যক্তি, তার মাপটাই শিল্পবোধ। দর্শকের চোখেও কম ঠেকলে অভিনয় আলোনা, পানসে থেকে যাবে।

মোদ্দা কথা যেটা দাঁড়াল তা হল—অভিনেতার অভিনয়ক্রিয়াটা মাধ্যমনির্ভর, বিশেষ করে আঙ্গিকের ক্ষেত্রে। সব মাধ্যমেরই নিজস্ব সুবিধে আছে, স্বাধীনতা আছে; আবার অসুবিধে আছে, সীমা আছে। যে-মাধ্যমের জন্যে অভিনয় করছেন তার সুবিধে ও অসুবিধে, সীমা ও স্বাধীনতা মনে রেখেই চরিত্র তৈরি করার কাজ চালাতে হবে।

আর চরিত্রসৃষ্টির ভেতরের রহস্যটা সব শিল্পেই যেমন, অভিনয়ের বেলাতেও তাই। সেখানে সিনেমা বা থিয়েটার বলে আলাদা কোনো রাস্তা নেই। সব শিল্পীরই মতো অভিনেতার বিষয় হল মানুষ—মানবজীবন। জীবনকে দেখার ক্ষমতা, বোঝার ক্ষমতা, বৃহত্তর জীবনের অংশীদার হবার ইচ্ছে—এইসবই যেমন অন্যান্য শিল্পমাধ্যমে শিল্পকর্মীকে কারিগরের পর্যায় থেকে শিল্পীর পর্যায়ে উন্নীত করে, অভিনেতার ক্ষেত্রেও তাই। অভিনেতার কল্পনা, মনন, সৌন্দর্যবোধ—এইসব দিয়েই তো জীবনকে প্রকাশ করেন সার্থক অভিনেতা। তাঁর কাছে সিনেমা আর থিয়েটারে এই মৌলিক শর্তগুলির কোনো তফাত হয় না। আর শেষপর্যন্ত জীবনবোধের উৎকর্ষের বিচারেই তো অভিনেতার বিচার হয়। তাই শেষ বিচারে অভিনেতার চেহারা, গলা, অঙ্গভঙ্গি, মনোহারিত্বের চেয়ে তাঁর অভিনয় কতটা জীবনের কাছাকাছি, কতটা জীবন থেকে নেওয়া—এই প্রশ্নটাই অনেক বড়ো হয়ে ওঠে।

[*সপ্তর্ষি প্রকাশন-প্রকাশিত চরিত্রের সন্ধানে (প্রথম সংস্করণ: ২০০৬) গ্রন্থ থেকে লেখক ও প্রকাশকের অনুমতিক্রমে (প্রয়োজনীয় সম্পাদকীয় পরিমার্জনা-সহ) পুনঃপ্রকাশিত হল।*]

নট সৌমিত্রঃ
অতীতের চোখে

সৌমিত্রের নাম জীবন

উৎপল দত্ত

অর্থাভাবে মঞ্চসজ্জার দিকে দৃষ্টি দিতে পারেন না বহুদল। বাধ্য হয়ে কালো পর্দার সামনে অভিনেতারা নানাবিধ অংগভংগী ক'রে দর্শকের চোখকে খানিক তৃপ্তি দেয়ার চেষ্টা করেন। শুধু কথা তো নাটক নয়, সেটা যাত্রা। নাটকে দর্শকের চোখ ও কানকে যুগপৎ আক্রমণ করার রীতি আছে। কিন্তু মূলতঃ টাকা না থাকায় বহু দল দৃশ্য বস্তুটিকে বাদ দিতে বাধ্য হ'ন। তাতেও তত ক্ষতি হোতো না। কিন্তু এই অক্ষমতাকে যখন তত্ত্বের স্তরে উন্নীত করা হয়, যখন সদর্পে বলা হয় এটা আমরা স্বেচ্ছায় শৈল্পিক প্রয়োজনে করছি, তখন সেটা হয় অসাধুতা। মঞ্চের কিছুই না জেনে, ফাঁকা পাটাতনের ওপর চতুর্দিকে হাত-পা ছুঁড়ে যাঁরা ফিজিকেল একটিং নামে নূতন নাট্য ধারার প্রবর্তন করেছিলেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সেই লিভিং-থিয়েটার-ওয়ালারা মার্কিন জনগণ দ্বারা পরিত্যক্ত হয়ে অবশেষে অবলুপ্ত হয়েছেন। কিন্তু তাঁদের বাঙালি অনুকারকরা অদ্যাপি দারিদ্র্যকে চমকপ্রদ এক নূতন পরীক্ষা বলে চালাচ্ছেন, এটাই যা পরিতাপের বিষয়। আলোক সম্পাত সম্পর্কেও সেই একই কথা খাটে। মঞ্চে কোনো সজ্জা না থাকলে আলোটা পড়বে কোথায়? আলো নিজে তো অদৃশ্য। কোনো বস্তু, কোনো থাম, কোনো সিঁড়ি, কোনো কাঠামোকে দৃশ্যমান ও অলংকৃত করতে পারলে তবে আলোর সার্থকতা। যেখানে মঞ্চ ফাঁকা, রয়েছেন শুধু কিছু অভিনেতা, সেখানে আলোর একমাত্র কাজ হচ্ছে মহামহিমান্বিত ঐ মহারাজদের মুখকান্তিকে মাঝে মাঝে উদ্ভাসিত করা, যেটা ছিল বাংলা থিয়েটারের একশ' বছরের অভিশাপ। সেই ফোকাস-মারা ছেলেখেলার নব্যরূপ প্রত্যক্ষ করছি আজ বাংলার প্রায় গোটা নাট্যআন্দোলনে।

এই সময়ে বাণিজ্যিক নাট্যশালা কাশী বিশ্বনাথ মঞ্চ—যেখানে পর পর নানা বীভৎস অর্থগৃধ্নুতার নজীর আমরা এতকাল দেখেছি—পোলের তলার সেই ক্ষুদ্রাকৃতি মঞ্চে শ্রীসৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় নাটকের সামগ্রিকতার এক অনন্য উদাহরণ স্থাপন করলেন। মঞ্চ জোড়া (এমন কি পর্দার বাইরে ঠেলে-আসা) বিশাল বস্তির সেট। তার সিঁড়ি, যার রেলিং-এর ওপর বসে কথা বলা যায়। তার গবাক্ষপথে দৃষ্টিগোচর নানা স্যাঁৎসেতে কক্ষ। তার জলের কল, যা থেকে জল পড়ে। তার উঠোনে মেলে-দেয়া আর্দ্র বস্ত্র। একটি সাইকেল যা শুধু শোভা নয়, পুরোপুরি ব্যবহৃত। অসংখ্য ছোট ছোট বস্তু, যার ব্যবহার পুংখানুপুংখ—দাড়ি

কামাবার যন্ত্র, সেলাই-এর কল, ক্রিকেট-ব্যাট, টুথপেষ্ট, ট্রানজিস্টার এবং তার ঘোষণাদি বাস্তববাদী নাট্যশালার যে পাঠ স্তানিস্‌লাভস্কি দিয়ে গেছেন বিশ্বকে, এবং যে-পাঠ বাংল নাট্যশালায় আলস্য ও স্থূলত্বহেতু প্রায় চিরদিন অবজ্ঞাত, সৌমিত্রবাবু তাকে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করার এক চমকপ্রদ প্রয়াস পেয়েছেন। এখানে সুরেশ দত্ত-র পলেস্তারা-খসা লাল-ইঁটের বাড়িগুলি নিরপেক্ষ পশ্চাদপট নয়; তারা ঘিরে আছে কুশীলবকে। তারা বাসস্থান। নানা দ্বন্দ্বের তারা সাক্ষী। তারা বহু বিপর্যস্ত স্বপ্নের প্রতিচিত্র। এখানে তাপস সেনের আলো বিক্ষুব্ধ চিত্তে শূন্যে হাতড়ে ফেরে না, কংক্রীট কলকাতায় আঘাত হানবার পরিসর পায়। এখানে রাত্রি, উষা এবং দ্বিপ্রহরের নানা ক্লান্ত আমেজ। এখানে দুটি কি তিনটি মাত্র মুহূর্তে দেখি ব্যক্তির যন্ত্রণাময় মুখচ্ছবি এবং পেছনে তার দীর্ঘ কালো ছায়া। বিশেষতঃ যখন প্রাক্তন খেলোয়াড় হঠাৎ ডুবে যান তাঁর গৌরবময় অতীতে, আর পাশে অন্ধকারে যুবক বিশ্ব ব্যাট চালাতে থাকে স্ট্রেট ড্রাইভে, তখন এমন একটি স্মরণীয় স্মৃতিচারণ ঘটে যা বহুদিন ভারতীয় মঞ্চে দেখিনি। অন্য সব সময়ে তাপস সেনের বিষন্ন আলোক নীরবে ভাঙা বাড়িগুলির পরাজয়ের কাহিনী বলতে থাকে, কলকাতার একদল দরিদ্র বীরের দেহে স্নেহের হাত বুলোতে থাকে, তাদের আদর করে।

সৌমিত্রবাবুর "নাম জীবন" নাটক শুধু জীবন যেমনটা আছে সেটা দেখিয়ে তর্কাতর্কির ক্ষেত্র থেকে কাপুরুষের মতন কেটে পড়ে না। তারই নাম জীবন যে মায়ের পেটে এসেছে, যে ভূমিষ্ঠ হবে দরিদ্র পিতামাতার সাহসিকতার আশ্রয়ে। তাদেরই নাম জীবন যারা বঞ্চনাকে মেনে নেয় না, সংগ্রাম করে। এখানে বাসনা দেবী লড়াই ক'রে চলেছেন একমাত্র জারজ কন্যাকে মানুষ করতে, বিহ্বল স্বামীর অন্ন জোগাতে। যেখানে নারী নির্যাতীতা বিশ্বব্যাপি সংগ্রামের শরীক, তিনি নারীমুক্তির যোদ্ধা। বিশ্বনাথ ছিল পলায়নপর। পরিবেশের বীভৎসা থেকে সে পালাবে, চলে যাবে বিদেশে, এই ছিল তার পণ। কিন্তু সেটাই একমাত্র কারণ নয়। সৌমিত্রবাবুর লেখনী কোনো চরিত্রকেই নির্বোধ সরল রেখায় আঁকে না, কারুর নিস্তার নেই তাঁর হাতে। চরিত্রের চেতনা ভেদ ক'রে অবচেতনে অবলীলাক্রমে প্রবেশ ক'রে নানা ঝোঁক, নানা বিকৃতি, নানা স্মৃতির দংশন আবিষ্কার ক'রে নাট্যকার আস্ত মানুষ সৃষ্টির এক দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। বিশ্বনাথ পরোপকারী, উদার, মহৎ। পর মুহূর্তে সে আত্মপ্রকাশ করে কাপুরুষের ভূমিকায়, বাণীর গর্ভের সন্তানের দায়িত্ব সে নিতে অস্বীকার করে, যার সংগে দৈহিক মিলন হয়েছে তাকে অকথ্য গালিগালাজ ক'রে বার করে দেয় শয়নকক্ষ থেকে। আরো কিছুদূর নাটক এগুলে দেখতে পাই তার মনের আরেকটি বাঁক—তার কমিউনিস্ট ভাইকে গুলি ক'রে মেরেছিল কলকাতার পুলিশ, কেননা বিশ্ব তাকে আশ্রয় দিতে অস্বীকার করেছিল। এই স্মৃতির অনলে সে নিজেই পুড়ছে, জ্বলছে, অব্যক্ত যন্ত্রণায় চৌকাট ধরে

কাঁদছে। এমন মানুষ কে আছে যে সেজন্য তাকে অভিশাপ দেবে? এমনি ঢেউ-এর পর ঢেউ ভেঙে ভেঙে পড়ছে বিশ্বনাথ নামক বেলাভূমিতে। বাসনাদেবীর মিনতি, ছোট্ট মেয়েটির ছোট্ট একটি "ছি", কমিউনিস্ট ভ্রাতার একটি উক্তি—"পালাবে কোথায়? এখানেই লড়তে হবে সবাই মিলে"—এমনি সব টুকরো টুকরো কথায় বিশ্বর পৌরুষ পুনরায় জাগ্রত হয়। সেটাই এ নাটকের কাহিনী। যোদ্ধা বিশ্বনাথের জন্ম। সংশয়ের এক অন্ধকার তরাই ভেঙে উপলব্ধির আলোকিত চূড়ায় আরোহণ। সৌমিত্রবাবুর অভিনয় ক্ষমতার এ শীর্ষবিন্দু।

বাসনাদেবীর যে জীবনীশক্তি ও চাঞ্চল্য মাতিয়ে রাখতো বস্তির সকালটাকে, বেশ্যাটির সংগে তাঁর যে প্রাণোচ্ছল কলহ, পুলিশ অফিসারকে নিয়ে তাঁর যে খেলা, বেশ্যার নাগরকে তাঁর শাসন, এসব হঠাৎ অন্তর্হিত হয়ে যায় স্বামী টাকা চুরি করার পর। নীলিমা দাস তখন মঞ্চে আসেন যেন নির্বাপিত দীপশিখা, হাসি নেই, পরিহাস নেই, ক্রোধ নেই, এমন কি কাঁধ দুটি পর্যন্ত যেন ঝুলে পড়েছে সামনের দিকে। তাতেও নাট্যকার নিশ্চিন্ত নন। বাসনার অতীত তখন উদ্‌ঘাটিত হয় আমাদের সামনে এবং এই স্মৃতিভারে অবনত নারীর আরো এক রূপ দেখতে পাই। তেমনি সর্বক্ষেত্রে। বাণী দারিদ্র্যের সংগে যুঝবার জন্য মালিকের কাছ থেকে গয়না শাড়ী নেয়ার যে পথ অবলম্বন করে, সেটা পাশের ঘরের বেশ্যাটির আচরণের থেকে পৃথক বা উন্নত নয় একেবারেই! অথচ তথাকথিত পাপের পথে পা দিয়ে তলিয়ে যাওয়ার যে বুদ্ধিহীন কাহিনীতে আজকের বাংলা সাপ্তাহিক পত্রগুলি পূর্ণ থাকে, স্বভাবতই সৌমিত্রবাবুর নাটক সে পথে পা দেয় না। বেশ্যা আবার কী? বাণী বাঁচবার জন্য মালিকের অনুগ্রহ নেয়, যেমন কেরাণী নেয় মাইনে। তার মন থাকে মুক্ত। তাই সে সপ্রতিভভাবে বিশ্বনাথের অভিযোগের মোকাবেলা করতে পারে। আবার স্মৃতির চাপ থেকে সেও মুক্ত নয়, যেমন নয় এ নাটকের অন্যেরা। পুলিশের জেরায় ঘাবড়ে গিয়ে সে প্রতিবেশীকে ধরিয়ে দেয়ার ব্যবস্থা করে এবং এই সাময়িক কাপুরুষতার জন্য নিজেকে কশাঘাত করে বার বার। লিলি চক্রবর্তী (বিশেষতঃ বিশ্বনাথের নির্লজ্জ অভিযোগের দৃশ্যে) মনোগ্রাহী অভিনয় করেছেন। আর ঐ যে পাশের ঘরে বেশ্যাটি থাকে, সেও বাংলা সাহিত্য-নাটক-চলচ্চিত্রের প্রতিরূপ বেশ্যার ন্যাকামি করে না কখনো। পাপে লিপ্ত অথচ হৃদয়টি সুন্দর—এই জঘন্য মিথ্যা ফর্মুলার ধার সে ধারে না। সে খোলাখুলি লজ্জাহীন বেশ্যা। বাঁধা নাগর তার ঘরে ঢুকে খুচরো খদ্দেরকে আবিষ্কার করে। সে পাড়া মাথায় ক'রে ঝগড়া করে, তীব্রতম ভাষা ব্যবহার করে স্বচ্ছন্দে, এবং বিবাহের সম্ভাবনায় সকলকে দৃপ্ত ভংগীতে বলে বেড়ায়—এবার সে কুলবধূ হবে। সুচেতা দাসের অভিনয় সৌমিত্রবাবুর পরিচালনায় তেজী এবং বলিষ্ঠ হয়ে উঠেছে।

একথা অনস্বীকার্য যে অশোক মিত্র বা নির্মল ঘোষ বা মিন্টু চক্রবর্তীর অভিনয় কথঞ্চিৎ

আতিশয্যের দিকে ঘেঁষেছে। অন্য নাটকে সেটা কারুর চোখেই পড়ত না, কিন্তু এ নাটকের নিবিড় পরিবেশে সামান্যতম অবাস্তবতা দেখা দিচ্ছে পর্বতপ্রমাণ হয়ে, কারণ বাস্তববাদী প্রযোজনার প্রধান সমস্যাই তাই: সত্যের বিশ্বস্ত পরিবেশনায় ক্ষুদ্র মিথ্যাও দৃষ্টিকটু। কিন্তু একরত্তি মেয়ে স্বর্ণালী গংগোপাধ্যায় যেভাবে সৌমিত্রবাবুর শিক্ষা গ্রহণ করেছে, যেভাবে হাত দুটিকে সংযত করেছে, নিয়ন্ত্রিত করেছে নিজের সারা দেহ, যেভাবে থমথমে মুখে ব্যক্ত করেছে অব্যক্ত কি-এক যন্ত্রণা, তাতে ঘন হয়েছে নাটকের রস। মুদ্রাদোষ হচ্ছে স্তানিস্‌লাভ্‌স্কি-পদ্ধতির চরম দুষমণ। সেরকম সর্বপ্রকার ঝোঁক থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হয়ে যেন সত্যিকারের অন্ধকূপে ঘুরে বেড়িয়েছেন সৌমিত্র, নীলিমা, লিলি, সুচেতা ও স্বর্ণালী। তাঁদের প্রতি কথার পেছনে পেয়েছি যাতনা, দ্বিধা, সংশয়। যা তাঁরা বলছেন সেটাই যে মনের কথা এমন নয়। নীলিমা দাস যখন স্বামীর উদ্দেশে গঞ্জনা বর্ষণ করেন, তখন এও বুঝতে দেন যে ঐ লোকটিকে তিনি ভালবাসেন প্রাণের অধিক। সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় যখন ছোট্ট মেয়েটিকে ফিরিয়ে আনেন, নীরবে মুখ খিঁচিয়ে তাকে বলেন মায়ের কাছে যেতে, তখন নির্ভুল শরসন্ধানে এও জ্ঞাপিত করেন যে তাঁর চোখে জল এসে যাচ্ছে, কিন্তু পুরুষের অশ্রুমোচনে বহু বাধা আছে বলেই তিনি অমন সংযত। কথা এবং ভাব বহুস্থানে চলেছে ভিন্ন পথে, বিপরীত পথে। এটাই অভিনয়ের ডায়ালেকটিক্‌স্। যখন মনের মধ্যে ঝড় ওঠে, তখনই যেন সৌমিত্র, নীলিমা, এমন কি স্বর্ণালী সবচেয়ে স্বল্পবাক। বিস্ফোরণ যখন ঘটে তখন তাঁরা থিয়েটারি নন, তাঁরা প্যাঁচ কষেন না। তাঁরা তখন মঞ্চের তথাকথিত নিয়ম মেনে গলার চড়াই-উতরাই প্রদর্শন করেন। তাঁরা তখন অসংলগ্ন, আত্মহারা। তাঁদের বাক্যবিন্যাস তখন বিপর্যস্ত, শ্বাস-প্রশ্বাস বেহিসেবী, চিৎকার আচমকা এবং নিয়মবিরুদ্ধ। তাঁরা তখন অভিনেতা নন, মানুষ। মানুষের আবেগ কখনো মাপজোকে আটকা থাকে না। বিশেষতঃ বিশ্ব এবং বাণীর সংঘর্ষের দৃশ্যে সৌমিত্রের উন্মত্তবৎ গর্জন এবং লিলির হঠাৎ অতি স্বাভাবিক কণ্ঠে ''স্বার্থপর'' বলাটা অভিনয় প্রণালীর একটি দৃষ্টান্ত, যা পাঠ্যপুস্তকে আমরা সবাই পড়েছি, কিন্তু বাংলা মঞ্চে ক'বার দেখেছি মনে নেই।

আজকে বাংলা পেশাদার মঞ্চ রাসবিহারী-অসীমদের সীমাহীন ব্যভিচারে বিধ্বস্ত। একটি প্রাচীন ঐতিহ্যকে তাঁরা লুপ্ত ক'রে দিয়েছেন, বিসর্জন দিয়েছেন নগ্ন নারীর পদপ্রান্তে। সে শ্মশানে এখন প্রগল্‌ভ এবং সস্তা হাসির নাটক অভিনয় ক'রে কেউ-কেউ সহজ আপসের পথ ধরেছেন। এ-অবস্থায় ''নাম জীবন'' এক চ্যালেঞ্জ, আপসহীনতার এক ইশতেহার, আদর্শনিষ্ঠ এক সাধনা। দর্শককে কোনো কল্পনার নন্দনকাননে পলায়ন করতে দেয় না এ নাটক, তাকে নীচের মহলের মুখোমুখি দাঁড় করায়, শ্লেষের চাবুকে উত্যক্ত করে পাতিবুর্জোয়াকে, মুহুর্মুহু বিঘ্ন ঘটায় তার পরিতুষ্ট মানসে। একটি তীব্র কথায় চমকে উঠতে

না উঠতে আরেকটি অপ্রিয় সত্য এসে চপেটাঘাত করে পলায়নবাদী দর্শকের গণ্ডদেশে। কিন্তু সত্যিকারের নাট্যামোদী মাত্রেই ক্ষণে ক্ষণে শিহরিত হ'ন সৌমিত্রবাবুদের সাহস ও নিষ্ঠায়।

শুধু বন্ধ্যা দেউলিয়া পেশাদার নাট্যশালা নয়, এ নাটক পুরো নাট্য-আন্দোলনের সামনে গোর্কির মতন, বিস্মৃত আদর্শের মতন, বিবেকের মতন বিরাট ছায়া ফেলে এসে দাঁড়িয়েছে। পাতিবুর্জোয়ার অসহিষ্ণুতা বহু বিভ্রান্তিকর নর্তনকুর্দনে প্রকম্পিত করছে বাংলা নাট্য-অংগন। নাটকে কাহিনীর প্রয়োজন নেই, তন্নিষ্ঠ অভিনয়ের প্রয়োজন নেই, হাত-পা ছোঁড়া এবং ত্রিভংগ মুরারী কিছু ট্যাবলোই হচ্ছে অভিনয় (ট্যাবলোকে আবার বলা হয় "ফ্রীজ"!!)—ইত্যাকার প্রলাপ চতুর্দিকে। চতুর্থ শ্রেণীর মার্কিন বা জর্মন নাটক অনুবাদ করলেই বাংলার নাট্য চাহিদা মিটে যাবে, তা সে মামুলি "জিগার-জ্যাগারই" হোক, বা অখ্যাত পশ্চিম জর্মন নাট্যকারের স্বদেশে-উপেক্ষিত কোনো নকশাই হোক—এ তত্ত্ব এখন কলিকাতায় সদর্পে উচ্চারিত। "নাম জীবন" এক উচ্চকণ্ঠ স্মারক যে, নিটোল এবং ঘটনাবহুল মৌলিক কাহিনী হচ্ছে নাটকের ভিত্তি। বেঁচে থাক সৌমিত্রবাবুর নাটকের উত্তেজনা, সংঘর্ষ, ক্রন্দন, বিলাপ। বুদ্ধিজীবীদের বুদ্ধিবাজির কসরতে বাংলা নাটক রক্তশূন্য এবং বিবর্ণ হয়ে এসেছে। প্যাঁচ-পয়জারের ঠেলায় সাধারণ মানুষ টলতে টলতে পালিয়ে যাচ্ছেন থিয়েটার থেকে। ভাষাও হয়ে এসেছে আধুনিক বাংলা কবিতার মতন অবোধ্য হেঁয়ালি। সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় ফিরে গেছেন সেই বলিষ্ঠ নাট্যধারায়, যেখানে শক্ত গল্পের কাঠামোয় নাটক থাকে বাঁধা, যেখানে স্বামীকে চোর হিসেবে জানবার পর গলা ছেড়ে কাঁদে বাসনা, যেখানে আবেগ তীব্র এবং ক্রোধ প্রচণ্ড, যেখানে গল্প মোড় ঘুরে ঘুরে নূতন নূতন চমকে উপনীত হয়। এখানে চুরি ধরা পড়বে কি পড়বে না তা নিয়ে উৎকণ্ঠা জমাট বাঁধতে থাকে। এখানে গর্ভস্থ সন্তানকে বাঁচাবার জন্য বাণী কি করবে সেটা এক ঘনায়মান ক্লাইমেক্স্। এখানে যখন দর্শক নিশ্চিত যে সমস্যার সমাধান হয়ে গেছে, তখন হঠাৎ বাণীর ঘর থেকে টাকার কুমীর লম্পটটি বেরিয়ে এসে কাহিনীকে আবার নূতন বাঁকে পৌঁছে দেয়। বৃহন্নলা ইন্টেলেকচুয়ালদের মুখে ছাই দিয়ে ভাঙা-গড়া রাগ-ভালবাসা বাঁচা-মরার "মেলোড্রামা" "নাম জীবন" শত শত রজনী চলুক সাদামাটা মানুষদের সমর্থনে।

*[উৎপল দত্ত—সম্পাদিত **এপিক থিয়েটার** নাট্যপত্রিকার ডিসেম্বর ১৯৭৮ ও জানুয়ারি ১৯৭৯-এর যুগ্মসংখ্যা থেকে লেখকপুত্র শোভা সেনের অনুমতিক্রমে এবং উক্ত পত্রিকার বর্তমান সম্পাদক অরূপ মুখোপাধ্যায়ের সৌজন্যে মূল বানান ও মুদ্রণপ্রমাদ অপরিবর্তিত রেখে হুবহু পুনর্মুদ্রিত হল।]*

নাটকীয় সৌমিত্র

তাপস সেন

নাটকে আলো দেবার জন্য অনেকে এসে ধরে তার মধ্যে কত অপরিচিত নতুন সংস্থা বা ব্যক্তি আমাকে অনুরোধ করেন খানিকটা সঙ্কোচও দ্বিধা নিয়ে। ভাবটা, বাবা এত নামী লোক অনেক টাকা অনেক বায়না—এই রকমই এক অনুরোধ নিয়ে অনেক বছর আগে বোধহয় উনিশশো ছাপান্নো সাল হবে—এক অপরিচিত সুদর্শন যুবক আমাকে রবীন্দ্রভারতীর রথীন্দ্রমঞ্চে এসে অনুরোধ জানালো তাদের কলেজের একটি নাটকে আমি যদি আলোর দায়িত্ব নিই। আমি বোধহয় একবাক্যে রাজী হয়ে গেলাম। এবং টাকাপয়সার ব্যাপারেও অভয় দিয়ে আশ্বস্ত করেছিলাম ছেলেটিকে। নাটকের নাম 'মুখোস' W.W. Jacob-এর লেখা মঙ্কিস প (Monkeys Paw) অবলম্বনে লেখা—নাট্যরূপ কার মনে নেই পরে জেনেছি ঐ নাটক দিল্লিতে আন্তবিশ্ববিদ্যালয় প্রতিযোগীতায় প্রথম স্থান অর্জন করেছিল। আরো পরে ঐ ছেলেটির পরিচয় পেয়েছিলাম যে ও নাট্যচার্য শিশির ভাদুড়ীর অনুরক্ত ছাত্র, নাম সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়—আরো পরে তাকে সত্যজিৎ রায়ের অপুর সংসারে আবিস্কার করি অপুর ভূমিকায়।

তারপর আজ অনেকদিন হয়ে গেল সৌমিত্র শুধু চলচ্চিত্রের সফল জনপ্রিয় অভিনেতাই নয় একজন সত্যিকারের নাট্য অনুরাগী মানুষ। থিয়েটারে ওর সঙ্গে আমার আরো ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ও কাজের সূত্রপাত হল অভিনেতৃসংঘের নাট্য প্রয়োগের ভেতর দিয়ে।

ইবসেনের 'গোষ্টস' নাটকের অনুবাদ 'বিদেহী' সৌমিত্রেরই এবং পরে অভিনেতৃ সংঘের উদ্যোগে আরো অনেক নাটকে কাজ করেছি ঐ সংঘের দুই প্রধান যুগ্ম সম্পাদক সৌমিত্র ও অনুপকুমারের সঙ্গে। বিদেহী ছাড়াও সিনেমা শিল্পের নায়কের জীবন ও সংকট নিয়ে ও লিখেছিল 'রাজকুমার'। সেটা প্রথমে অভিনেতৃসংঘ পরে বোধহয় পাবলিক থিয়েটার কাশীবিশ্বনাথ মঞ্চেও অভিনীত হয়েছিল। সৌমিত্রর সঙ্গে ওই নাটকে সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায় নায়িকার ভূমিকায় পাট করতো। সেই রাজকুমারে প্রথম সৌমিত্র একটা অংশ বেশ দক্ষতার সঙ্গে মঞ্চে সিনেমা প্রজেকশনের ব্যবহার করেছিল এবং তাও ওরই অভিনীত অপুর সংসারের শেষ দৃশ্য সত্যজিতের ফিল্ম clipping দিয়ে। এর আগে আমি দেখেছি উৎপল দত্তের 'অজেয় ভিয়েৎনাম' প্রযোজনায় স্টেজে চলচ্চিত্রের সার্থক শিল্পসম্মত প্রয়োগ মঞ্চ আলো ও ধ্বনিও সঙ্গীতের সমন্বয়ে।

কিন্তু কলকাতার থিয়েটারে একজন আধুনিক নির্দেশকের ভূমিকায় সত্যিকারের পরিচয় পেলাম সৌমিত্র যখন পেশাদার মঞ্চে এলো ওরই লেখা নাটক 'নামজীবনে'। নাট্যকার ছাড়াও এখানে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় সার্থক ভূমিকায় ছিল নির্দেশনা ও নায়কের চরিত্র অভিনয়ে।

উৎপল দত্তের পর আমি এই প্রথম একজন আধুনিক শিক্ষিত ও প্রগতিশীল নাট্যবিদকে পেলাম—যার সঙ্গে সাধারণ রঙ্গালয়ের পরিচিতি ছিল একজন আগ্রহী দর্শক হিসেবে তার চেয়ে বড়ো কথা শিশির কুমারের খাঁটি অনুগামী শিষ্য হিসেবে।

নামজীবনএ এসে দেখলাম প্রথম script reading থেকেই ও একদম জমিয়ে দিল। এরপর ধাপে ধাপে মঞ্চ পরিকল্পনার কথা এল আমি সুরেশ দত্তকে নিয়ে গেলাম সুরেশকে সৌমিত্র তার চিন্তা ভাবনা সবিস্তারে বুঝিয়ে তো দিলই, আর এও জানালো যে একটি মাত্র দৃশ্য নাটকে শুরুর থেকে শেষ। সুরেশও সৌমিত্রর পরিকল্পনাকে বাস্তব রূপায়নে কাজ করেছিল যাতে সৌমিত্রের স্টেজএ অভিনয়ের কম্পোজিশন আবহাওয়া সবটাই অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত ছিল। আমিও সৌমিত্রের এ নাটকে আলোর প্রয়োগ পরিকল্পনা করে বলতে গেলে সাধারণ রঙ্গালয়ে একটা ব্যতিক্রমী কাজ করার জন্য আনন্দ পেয়েছি। আধুনিক থিয়েটারের সকল বিভাগের সার্থক সমাবেশে একটা নতুন নজির স্থাপন করা গেল সৌমিত্র চ্যাটার্জীর এ প্রযোজনায়—এবং তার জন্য আমি বিশেষ করে মনে করি কাশী বিশ্বনাথের মতো মঞ্চে এই দুঃসাহসী প্রয়োগ সম্ভব করে তোলার জন্য প্রযোজক হরিদাস সন্যালের কথা। নামজীবন নাটকের খুবই নাম হয়েছিল সেদিন—অনেক আলোড়ন তুলেছে অভিনন্দনও অনেক পেয়েছে সৌমিত্র ও আমাদের সকলের সম্মিলিত প্রয়োগে এই নাট্যসৃষ্টি—তথাকথিত কোনও জাঁকজমক ছাড়া রূঢ় বাস্তবতার পরিবেশে একটি প্রায় বস্তির বাসিন্দারা জীবন্ত হয়ে কলকাতার একটা চেহারা হাজির করতে সক্ষম হয়েছিল সৌমিত্রর প্রথম পাবলিক থিয়েটারের আত্মপ্রকাশে—আরো অনেক অভিনন্দনের মধ্যে আমার মনে আছে আমার দীর্ঘকালের সহযোগী বন্ধু উৎপল দত্ত একটি উচ্ছ্বসিত দীর্ঘ সমলোচনা লিখলেন নামজীবন প্রসঙ্গে ওদের 'এপিক থিয়েটার' পত্রিকায়।

নামজীবন সৌমিত্রের শিল্পবোধ পরিমিতি ও নিষ্ঠা আমাকে আবার নতুন করে উৎসাহিত করেছিল পেশাদারী থিয়েটারে পেশাদার (প্রফেশনাল) কথাটার মর্যাদার বিষয়ে। সুরেশ দত্ত কৃত দৃশ্য সজ্জা ছাড়া ও সঙ্গীতের প্রয়োগে ওর সঙ্গে আমার বোঝাপড়াটা ঠিক শম্ভুমিত্র ও

উৎপলদত্তর সঙ্গে অতীত শিল্প সৃষ্টির ক্ষেত্রে ভাববিনিময়ের জায়গাতেই পৌঁছেছিল। যেমন একটা দৃশ্যের শেষে নায়িকার সায়াহ্নে উৎকণ্ঠিত প্রতীক্ষা, ভাঙা পলেস্তারা খসা সিঁড়ির গোড়ায় বসে আছে—লিলি চক্রবর্তীকে ঐ রকম একটা তেরছা (slanting) ম্লান দিন শেষের প্রায় গাঢ় রঙীন আলোয় নিস্তব্ধ বসে থাকা—ঐ জীর্ণ ফাটল করা ইঁটের গা বেয়ে এসে আলোটি কোন মতে বাণীর ভূমিকায় লিলির মুখাবয়ব দৃশ্যমান করল, ঐখানে দৃশ্যের পরিসমাপ্তি ঘটায়, ক্রমশ মিলিয়ে যাওয়া অন্ধকারে সঙ্গীতের অনুষঙ্গে।

আরও একটি দৃশ্যের শেষে সৌমিত্র ওই বস্তিবাড়ীর ছোট একটি বালিকা রুনির সঙ্গে গল্প করছে নিজেদের ছোট জগতের সুখ দুঃখ সমস্যা নিয়ে, এমন সময় বৃষ্টির আভাস দিয়ে মেঘ গর্জন—বৃষ্টির এই ইলিউশনও সৃষ্টি করতে পারতাম কিন্তু সে সব কিছুই না করে আমি আস্তে আস্তে ওদের ওপর আলো কমিয়ে প্রায় অন্ধকার করে দিলাম এবং এই ব্যাপারটায় সৌমিত্রও একমত ছিল।

আমার ধারণা নাট্যকার শিশির কুমারের অনুপ্রেরণা তো ছিলই তার সঙ্গে দীর্ঘ দিন সত্যজিৎ রায়ের সঙ্গে কাজ করে নানা বিষয়ে বিষেশত সঙ্গীত ও আবহ সৃষ্টির কাজে ওকে এরকম করে ভাবতে শিখিয়েছিল যেটা হয়তো খানিকটা ফিল্মিক বা প্রচলিত থিয়েটারের সঙ্গীতের থেকে আলাদা। নামজীবনে যখন মাঝে মাঝে একটু ওপরের দিকে সৌমিত্রর ক্ষুদ্র শোবার ঘরটি দৃশ্যমান খুব smoothly counter weight পুলী ব্যবস্থার সাহায্যে সামনে দেওয়ালটা উঠে যেত একটু আলো ও তার সঙ্গীতের সুপ্রয়োগে ঐ দৃশ্য উপস্থাপনার শুরুটা কত ব্যঞ্জনাময় হয়ে উঠত।

এই নামজীবন কলকাতায় থিয়েটার আলো করে অনেকদিনই চলেছিল। তারপর প্রায়ই আমি সৌমিত্রকে সিরিয়াস থিয়েটারে আরও লাগবার জন্য তাগাদা করেছি অনেকদিন পরে আবার বিশ্বরূপা থিয়েটার ওর লেখা ফেরাতে কাজ করলাম এই নাটকের শেষের দিনগুলোতে সৌমিত্র একদিন আমাকে ওর গ্রীনরুমে বলল পরের নাটকের কথা এবং একদিন ওর নাটকটা শুনলাম ভালও লাগল, বিশেষত নাটকের মঞ্চ উপস্থাপনের কথা ওর মুখে জেনে আরও আগ্রহী হলাম, প্রস্তাবিত নাটক নীলকণ্ঠ মঞ্চস্থ হবে রঙমহল থিয়েটারে। আর ঐ রঙমহলের রিভলভিংস্টেজকে ব্যবহার করে একটিই কম্পোজিট দৃশ্যসজ্জার মধ্যে লেভেল ও ঐ নাটকের পুরোনো জমিদার বাড়ীর বিভিন্ন অংশ দেখানোর জন্য ঘূর্নায়মান মঞ্চ অন্য রকমের ব্যবহার করার কথা সৌমিত্র আগেই বিশ্বরূপার ঘরে বসে একটা সিগারেটের প্যাকেট ও দেশলাই এর বাক্স নাড়াচাড়া করে বুঝিয়েছিল। তাতেই আমি আকৃষ্ট হলাম, নাটক শোনার পরতো

কথাই নেই।

পরে আমি রঙমহলে গিয়ে শ্রদ্ধেয় দেবনারায়ণ গুপ্ত ও নাট্য প্রযোজক শুভম (আসলে শ্রীমতী শুক্লা সেনগুপ্ত) কর্তৃপক্ষকে জানালাম সৌমিত্রের সামনেই, এ নাটক আমি ছাড়া হতে পারে না—কিন্তু আপাতত সেটা সম্ভব নয় কারণ আমি এক মাসের জন্য মস্কো চলে যাচ্ছি—সৌমিত্র আর দেবনারায়ণ বাবুরা আমার যুক্তি মেনে নিলে আমি ফেরার পরই দেরী করে নাটকের উদ্বোধন করতে রাজী হয়ে গেলেন।

আমি ফিরে এসে জানলাম যে আর তিনদিনের মধ্যে 'নীলকণ্ঠ' খোলা হচ্ছে—ইতিমধ্যে মস্কো থেকে সৌমিত্রকে টেলিফোন করে আমার দেশে ফেরার দিনটা জনিয়েছিলাম। কিন্তু অবাক হলাম সেই দেরীই তো করলেন কিন্তু এরকম একটা নাট্যপ্রয়োগের প্রস্তুতির সময়ই তো পেলাম না—যেমন সৌমিত্র আগের নাটক 'ফেরার' সময় বিশ্বরূপায় পারেনি—প্রযোজক ছিলেন ঐ শুক্লা সেনগুপ্তরাই নানা কারণে ওদের তিনদিনের মধ্যে নাটক খোলার বাধ্যতামূলক পরিস্থিতি ছিল এবং আমিও সেটা স্বীকার করে নিয়েছিলাম।

যাই হোক নীলকণ্ঠ ঘোষিত উদ্বোধনের ঠিক তিনদিন আগে এলাম রিহার্সালে—শুরুতেই মেজাজ খারাপ sound বা Music পাওয়া যাবে না কারণ সেই কর্মী সেদিন আসেন নি। একে রিভলভিং স্টেজের নতুন ভাবে প্রয়োগ তার সঙ্গে আলো মঞ্চ শব্দ আবহ সবকিছু জড়িয়ে—তবু ভাবলাম দেখাই যাক ধৈর্য ধরে। একটানা রিহার্সাল চলল এবং আমি তো সম্পূর্ণটা দেখে বলে দিলাম ঠিক আছে অমুক দিনই বই খোলা হবে। আমার সহকারী দুলাল সিংহ তো অবাক, আমি বললাম সমস্ত ব্যাপারটা আজ এতই নিখুঁত ও পরিপাটি শব্দ ও সঙ্গীত বাদে যে আমি স্থির করে ফেললাম দুদিনেই আলোর ব্যবস্থাটা করে দিতে পারব, কারণ ইতিমধ্যে সৌমিত্র পুরো প্রডাকশনটায় একটা সম্পূর্ণ চেহারা দাঁড় করিয়েছে—একমাত্র সেট তৈরীর ব্যাপারে নির্মলগুহ রায়ের কিছু কাজকর্ম বাকী ছিল—সেগুলো আমি শেষ মুহূর্তে প্রযোজকদের সহযোগিতায় ম্যানেজ করে নিলাম।

নীলকণ্ঠ নাটকে মঞ্চপরিকল্পনা অভিনয় সবকিছুর অভিনবত্বের মধ্যে সৌমিত্রের মৌলিক কল্পনার পরিচয় পেয়েছি আর সে কারণেই ঐ নাটকে আমিও অন্য রকম করে আলোর বিন্যাস করতে মজা পেয়েছি, দৃশ্যান্তরে স্টেজ ঘুরিয়ে ব্যবহার তো ছিলই। তাছাড়া নাটকের মাঝখানে সাঙ্গপাঙ্গদের প্ররোচনায় মদ্যপানে বাধ্য হওয়া ও উত্তরোত্তর মদ খেতে বাধ্য হয়ে যে অসহায় বেহেড মাতলামীতে রূপান্তর হবার সংযত অথচ হৃদয়স্পর্শী ভাবান্তর

মঞ্চে আমি খুব কমই দেখেছি। অল্পস্তিমিত নীচু কোন থেকে আসা আলোয় সেই আর্ত বিদ্ধস্ত মানসিকতার যে অভিব্যক্তি ওই নাটকে প্রকাশ করতে পেরেছিল আজও আমার মনে সে স্মৃতি উজ্জ্বল হয়ে আছে। আর এই ধরনের ভিন্নধর্মী ব্যতিক্রমী নাট্য প্রয়াসের জন্য বিশেষ ভাবে ধন্যবাদর্হ শুভম কর্তৃপক্ষ, শুধু নিছক আর্থিক লাভেব কথা মনে রেখে এঁরা কিন্তু ও নাটক অনেক দিন ধরে মঞ্চে প্রথমে রঙমহল পরে বিশ্বরূপায় চালান নি।

সৌমিত্রর মতো আমার প্রিয় নির্দেশকের কাছে একটাই ক্ষোভ সৌমিত্র এত ভাল নাটক সংলাপ লেখে, কিন্তু সব সময়েই কেন যে বিদেশী নাটকের ওপর ভরসা করে আসছে এবং তার যথেষ্ট সার্থক ও বিশ্বাসযোগ্য রূপান্তর করতেও সক্ষম হয়েছে—একমাত্র ইবসেনের 'গোষ্টস' শুধু অনুবাদ করেছিল, যদিও খুব ভাল অনুবাদ, তবু বলব চলতি কথা প্রবাদবাক্যে ও ভাষার ওপর যার এত দখল সে মানুষটা কেন নিজে নাটক লিখবে না নতুন করে—যদিও ও সবসময় বলে যে ও ব্যাপারটা ওর সাধ্যের বাইরে, আমি কিন্তু তা মনে করিনা সৌমিত্র চ্যাটার্জির মধ্যে একজন প্রচুর সম্ভবনা ও প্রতিশ্রুতিময় নাট্যকার লুকিয়ে আছে—সৌমিত্র একটু উঠে পড়ে লাগলেই হয়।

[প্রতিভাস-প্রকাশিত এবং বিষ্ণু বসু—সম্পাদিত **অন্তরঙ্গ আলো** *(প্রথম সংস্করণ: ১৯৯২) গ্রন্থ থেকে লেখকতনয়া জয়ন্তী সেনের অনুমতিক্রমে হুবহু (অসংখ্য মুদ্রণপ্রমাদ, বানানবৈষম্য ও অসংগতি থাকলেও কোনোরকম সংশোধন ছাড়াই) পুনর্মুদ্রিত হল। শ্রীমতী সেনের সম্পাদনায় করুণা প্রকাশনী থেকে প্রকাশিতব্য* **ছায়ায় আলোয়** *সংকলন-গ্রন্থে যথোচিত পরিমার্জনা-সহ স্থান পেতে চলেছে স্মৃতিচারণামূলক এই প্রবন্ধটি।]*

সৌহার্দ্যে, কৌতুকে এবং সংগ্রামে

দিলীপ রায়

এখন প্রিয় বন্ধুদের নিয়ে কোথাও কিছু বলা বা লেখার শুরুতে যে অসুবিধেতে পড়ে যাই, সেটা হল সময়ের হিসেব। নিজেরা যে বুড়ো হয়েছি, এবং দ্রুত আরও কতকিছু ভুলে যাচ্ছি, এসব হয়তো তারই নিশ্চিত প্রমাণ। সৌমিত্রর সঙ্গে প্রথম পরিচয় কবে তা চমৎকার ভাবে ভুল গেছি। তবে প্রথম দেখা জাতীয় ঘটনা বাদ দিয়ে কাজের কথায় এলে, আমাদের দুজনের প্রথম একসঙ্গে সিনেমায় কাজ করা শুরু হয়েছিল তপন সিংহের 'ক্ষুধিত পাষাণ' ছবিতে। সেই ছবিতে সৌমিত্র নায়ক, আর আমি কাজ করেছিলাম একটা ছোট্ট অথচ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে। শুটিংটা হয়েছিল এখনকার টেকনিয়ান্স দু নম্বর (যেটা তখন ছিল নিউ থিয়েটার্স দুই) স্টুডিওতে। শুরুর আগেও শুরু থাকে। 'অপুর সংসার'-এ সৌমিত্র-র কাজ দেখে আমার তো রীতিমতো হিংসে হয়েছিল। সেই অল্প বয়সে বোধহয় মনের চিন্তাগুলোও সহজ পথে হাঁটে। আমি ভেবেছিলাম—সৌমিত্র কেন অত ভালো কাজ করলো। সত্যজিৎ রায় কেন আমাকে সুযোগ না দিয়ে ওকেই পছন্দ করলেন—ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু আজ, এতকাল পরেও মূল কথা থেকে সরছি না, অপু হিসেবে সৌমিত্র যে কাজ 'অপুর সংসার'-এ করেছিল তার কোনও তুলনা খুঁজে পাইনি। যখন সত্যিই বন্ধুত্ব হল তখনও ওর কাজের প্রশংসা করেছি, আর সেই ছেলেমানুষী হিংসেটিংসেগুলোই ততদিনে মুছে যেতে আরম্ভ করেছে। 'ক্ষুধিত পাষাণ' ছবিতে আমার সেই ছোট্ট কাজেরও খুব প্রশংসা হয়েছিল আর সৌমিত্র, রাধামোহনদা, ছবিদা অরুন্ধতী—এঁদের তো ধন্য ধন্য করারই কথা। তা দিনে দিনে কালকেতুর চেহারা বড় হওয়ার মত আমার আর সৌমিত্র-র বন্ধুত্ব বাড়ছিল। এর ঠিক পরে পরেই তপনদা করলেন 'ঝিন্দের বন্দী'।

অত্যাচারী ভাইয়ের বুদ্ধির প্যাঁচে পড়ে ঝিন্দের আসল রাজা বন্দী হলেও আমরা, অর্থাৎ আমি আর সৌমিত্র রাজস্থানে আউটডোর করতে গিয়ে একেবারে খোলামেলা বন্ধুত্বে পৌঁছে গেলাম। ছবিতে 'ময়ূরবাহন' আর 'রুদ্ররূপ' আলাদা দলের একেবারে ঘোরতর ভাবে শত্রুপক্ষের। কিন্তু বাস্তবে ততদিনে আমরা ঘোর মিত্র। ঝিন্দের বন্দীতে সৌমিত্রর কাজ আমার নিজের খুবই ভাল লেগেছিল। আমি নিশ্চিত আবার যদি সম্প্রতি দেখার সুযোগ পাই আমার একইরকম ভাল লাগবে। জানি না ওর নিজের কী ধারণা, 'ক্ষুধিত পাষাণ'-এ সৌমিত্র-কে দু-একটা জায়গায় যেন একটু কম সাবলীল মনে হয়েছিল। জানি না, হয়তো তপনদার সঙ্গে প্রথম কাজ বলেই কোথাও বোঝা ও বোঝানোর খামতি থেকে যেতে পারে। কিন্তু তপনদার সঙ্গে দ্বিতীয় ছবিতে ও একেবারে দারুণ কাজ করেছিল। সুদর্শন সৌমিত্র যথেষ্ট পড়াশোনা করা অভিনেতা এবং অত্যন্ত বুদ্ধিমান। দ্রুত সব কিছু

শিখে নিয়েছিল। এখনকার মত এতগুলো কাগজ, পত্র-পত্রিকা তখন ছিল না ঠিকই, কিন্তু জনপ্রিয়তম নায়ক উত্তমকুমারের বিরুদ্ধে সত্যজিৎ রায়ের নায়কের প্রথম একসঙ্গে অভিনয়— সব মিলিয়ে সাধারণ দর্শকদেরও 'ঝিন্দের বন্দী' নিয়ে প্রবল আগ্রহ ছিল। ব্যক্তিগত ভাবে আমি মনে করি, অভিনয়ের সেই লড়াই-এ সৌমিত্র উত্তমদা-কে একাধিক শটে ম্লান করে দিয়েছিল। ছবি মুক্তি পাওয়ার পর সৌমিত্র-র কাজের খুবই প্রশংসা হয়েছিল। 'ঝিন্দের বন্দী' প্রসঙ্গে আরও দু-একটা কথা বোধহয় বলা দরকার। তপনদা-র সৌমিত্র নির্বাচন একেবারে নিখুঁত হয়েছিল। ওইরকম একটা বেতের মত ছিপ্‌ছিপে ঋজু, সুদর্শন বুদ্ধিদীপ্ত চেহারা না হলে শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের ময়ূরবাহন-এর চরিত্র প্রতিষ্ঠিত হতো না। অভিনেতার দৃষ্টিকোণ থেকে বলি, ময়ূরবাহন নানা কারণে যেমন খুবই কঠিন চরিত্র তেমন অত্যন্ত আকর্ষণীয় চরিত্র। তুলনায় উত্তমদা ডাব্‌ল রোল করলেও চরিত্র দুটো কেমন যেন ফ্ল্যাট। অন্যদিকে কাজের মাপে ছোট চরিত্র হলেও ময়ূরবাহন চরিত্রে অভিনয় করার স্কোপ ছিল। তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমান অভিনেতা সৌমিত্র সেই সুযোগ পূর্ণমাত্রায় কাজে লাগিয়েছিল, স্বাভাবিক অভিনয় ক্ষমতায় ছুঁচের মত বিদ্ধ করেছিল।

তা সিনেমা, অভিনয়, জীবন ইত্যাদির মত সিরিয়াস প্রসঙ্গে ঢোকার আগে একটু রঙ্গ -রসিকতা করে নিই। কারণ সৌমিত্রর সঙ্গে তখন সত্যিকারের বন্ধুত্ব গড়ে ওঠাতে এইসব রসিকতার সার্থক ভূমিকা ছিল। আজ না হয় আমরা প্রবীণ শিল্পী, কিন্তু একদা যখন নবীন ছিলাম তখন ইন্ডাস্ট্রিতে দুষ্টুমিতে আমাদের খ্যাতি ছিল। সৌমিত্র-র কৌতুক বোধ এ ব্যাপারে বাড়তি উৎসাহ যোগাতো। 'ঝিন্দের বন্দী'-র শুটিং চলার সময় আমরা দুজনে মিলে একদা দীর্ঘমেয়াদী দুষ্টুমি করেছিলাম। আমি ঠিক নিশ্চিত নই সেই ঘটনা এখনও সৌমিত্রর মনে আছে কি না। ধীরেনদা ছিলেন নিউ থিয়েটার্স-এর আমলের শিল্পী। গায়ের রঙটা ময়লা, বেঁটে-খাটো চেহারা, কিন্তু ওঁর মুখের মধ্যে একটা বিশেষ ধরনের আকর্ষণ ছিল। উপযুক্ত চরিত্রে ক্যামেরায় ধীরেনদার মুখের আলাদা মাত্রা ব্যবহার করার সুযোগ ছিল। ঝিন্দের বন্দীতে ধীরেনদার ভূমিকাটা একটু বলা দরকার। ঝিন্দের বাজারের একটা অংশে লোকজনের ভিড়, সেখানে নানা ধরনের সুতো, জামাকাপড়, গয়নাপত্র ইত্যাদি বিক্রি হয়, ধীরেনদা সেখানে একজন জহুরী। এই জহুরী প্রয়োজনে রাজা রাজ পরিবারের প্রভাবশালী খবরাখবর দেয়। আমি আর সৌমিত্র ধীরেনদা-র লেগ পুল করার ব্যাপারে যৌথ উদ্যোগ নিলাম। সাবেক আমলের মানুষ, আমাদের অপকৌশল প্রথমে বুঝতে পারেননি।

আমি আর সৌমিত্র নিজেদের বোঝাপড়া মতন ধীরেনদার কাছে গেলাম। গিয়ে বললাম—'ধীরেনদা, কাল যে আপনার শুটিং রয়েছে সে ব্যাপারে কী করবেন?' ভালো মানুষ ধীরেনদা বললেন—'আমি আর কী করবো? সে কাল তপনদা যা বলবে তাই করবো।'

আমি বললাম—'সে কী আপনি শিল্পী, আপনার কিছু করার নেই মানে?' সৌমিত্র যেন অবাক, চোখে মুখে সহানুভূতি মিশিয়ে বললো—'ধীরেনদা, আপনি মনে হচ্ছে এখনই নার্ভাস হয়ে গেছেন।' এইবার ধীরেনদা যেন একটু রেগেই বললেন—'কোথায় নার্ভাস হয়েছি, আমায় তপন তো কাল বলবে কী অভিনয় করতে হবে, এখন থেকে কী করার আছে? কাল যেমন বলবে তেমনই করবো।' সৌমিত্র অত্যন্ত সিরিয়াস ভঙ্গিতে বললো—'আহা, আপনি তো জেনে নেবেন আপনার সেই চরিত্রে আপনার কী করার আছে। সে সম্পর্কে না ভেবে আপনি একটা ঘরে চা আর চাট্টি খাবার নিয়ে বসে আছেন?' ধীরেনদা এতক্ষণে আমাদের মতলব বুঝে বললেন—'দ্যাখো, তোমরা দুটিতে কিন্তু খুব খারাপ, বড্ড বাজে।' আমি নিপাট ভালো মানুষ—'কেন ধীরেনদা আমরা কী অপরাধ করলাম। আপনার কাল শুটিং...'। —'দ্যাখো তোমরা অকারণে আমার পেছনে লাগছো। আমি তোমাদের চেয়ে অনেক বেশি বয়স্ক... আর একজন দ্যাখো, সে তোমাদের চেয়েও ওপরে, সে এক নম্বর (উত্তমদা), সে কিন্তু তার নিজের ঘরে বসে ভাবছে।' আমি বললাম—'সেইজন্যই তো আমাদের আসা। আপনি তো তার চেয়েও বয়স্ক, আর আপনি নিজের অভিনয় নিয়ে ভাবছেন না। আমি আর সৌমিত্র উদ্বিগ্ন হয়েই এসেছি, কারণ আপনি খালি খাচ্ছেন আর ঘুমোচ্ছেন।' এই ভাবেই আমরা ধীরেনদার লেগ পুল করতাম।

ঝিন্দের বন্দী-র আউটডোরে রাজস্থান গেছি। উদয়পুর থেকে চিতোর হয়ে কুম্ভলগড়। সেখানে ধীরেনদার শট্-এর সিকোয়েন্স ছিল এই রকম—সেই জহুরী ভদ্রলোক (ধীরেনদা) দড়ি বেয়ে দুর্গের ছাদে উঠে এসে মহারাজকে দুঃসংবাদ হিসেবে এই জাতীয় একটা সংলাপ বললেন—'মহারাজ! মহারাজ! সর্বনাশ হয়ে গেছে, ময়ূরবাহন ঝড়োয়ায় গিয়ে ঝড়োয়ার রানীকে চুরি করে পালিয়ে গেছে।' আমি আর সৌমিত্র একেবারে নিখুঁত-নির্ভুল বোঝাপড়ায় ধীরেনদাকে মোক্ষম মুহূর্তে ধরলাম—'ধীরেনদা, ডায়লগ শিট পেয়েছেন?' 'এই তো লিখে দিয়েছে—'মহারাজ! মহারাজ!' —'না, না, দেখে বলবেন না, দেখে বলবেন না, মুখস্থ বলুন। ধীরেনদা যতবার ঠিকঠাক বলার চেষ্টা করছেন, সৌমিত্র আর আমি ততবার গুলিয়ে দিয়ে বলে উঠ্ছি—'মহারাজ! মহারাজ! ময়ূরবাহনকে চুরি করে ঝড়োয়ার রানী ঝড়োয়া থেকে পালিয়ে গেছে।' সেই যে গুলিয়ে যাওয়া শুরু হল, আর ঠিকই হচ্ছে না। শেষপর্যন্ত টেক করার আগে যতবার মনিটার হল, রিহার্সাল হল, ধীরেনদা ঠিকঠাক শুরু করলে আমি আর সৌমিত্র কাছে দাঁড়িয়ে উৎসাহ দেওয়ার ছলে গুলিয়ে দিচ্ছি। কন্‌ফিউজড ধীরেনদা বলছেন—মহরাজ! 'মহারাজ ময়ূরবাহন ঝড়োয়ার রানীকে... না। মহারাজ! মহারাজ! ময়ূরবাহনকে ঝড়োয়ার রানী চুরি—' একবার হ্যাঁ, একবার না। ইউনিটের অন্যরাও বেশ অবাক, ধীরেনদার কী হল।

শেষ পর্যন্ত তপনদা এগিয়ে এসে বললেন—'কী হল? আপনার কী গোলমাল হচ্ছে বলুন? ধীরেনদা বললেন—না, আমার কিচ্ছু হয়নি। আমি ঠিক আছি, আমার গোলমাল হচ্ছে না—' তপনদা অত্যন্ত ভদ্র ও শান্ত মানুষ, খুব আস্তে কথা বলেন। ধীরেনদার কাছে গিয়ে বললেন—'চুরি করছে কে? —ময়ূরবাহন, কাকে চুরি করছে—ঝড়োয়ার রানীকে কোথায় গিয়ে? —ঝড়োয়ায় গিয়ে'। এইটুকু একটু ঠিক করে যেমন সংলাপ লেখা আছে তেমন বলুন, বলুন না। ধীরেনদা গজর গজর করতে করতে বললেন—'যত সব বাজে এরা দুটি খুব বাজে। তপনদা একটু অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—'কারা বাজে? আপনি কাদের বাজে বলছেন।' —'এই যে সামনের দুটো, তোমার দুটো ছেলে'। আশেপাশে ইউনিটের অনেক লোকজনও দাঁড়িয়ে। তপন বুঝতে পারছেন না ধীরেনদা কোন দুজনকে বলছেন —ধীরেনদা খুব সিরিয়াস ভঙ্গিতে বললেন 'এই যে দুটো সামনে দাঁড়িয়ে আছে [উত্তমদা তখন একটু দূরে দাঁড়িয়ে]। —আপনি কি দিলীপ আর সৌমিত্র-র কথা বলছেন? ও এ্যাই তোমরা সরে যাও।' শটটা ছিল দুবারে নেওয়া, প্রথমে ধীরেনদা দড়ি বেয়ে উঠছেন, পরে হাঁফাতে হাঁফাতে সংলাপ—'মহারাজ! মহারাজ! ধীরেনদা প্রথম শটটা ঠিকমত দিলেন পরের শটটায় সংলাপ বলবেন, সৌমিত্র একটু দূরে দাঁড়িয়ে গুলিয়ে দেওয়া সংলাপটাই বিড়বিড় করে বলছে, দৃষ্টি ধীরেনদার দিকে। ফাইনাল টেক হচ্ছে, ধীরেনদা সুন্দর ভঙ্গিতে হাঁফিয়ে বললেন—'মহারাজ! মহারাজ! ময়ূরবাহনকে নিয়ে ঝাড়োয়ার রানী ঝড়োয়ায় পালিয়ে গেছে?' তপনদা সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলেন—'কাট্ কাট্, কী বলছেন আপনি?' এরপর ধীরেনদার আমাদের সম্পর্কে সিদ্ধান্ত হয়েছিল— 'জানো, তপন, এই দুটো হল মাতাল চব্বিশ ঘণ্টা মদ খায়। সেইজন্যে এরা আমার সংলাপ গুলিয়ে দিচ্ছে। উত্তমকুমারকে বলো যেন সে এদের সঙ্গে না মেশে, তাহলে উত্তমও খারাপ হয়ে যাবে।' কে কাকে চুরি করেছিল সে সমস্যা কিন্তু ডাবিং-এর সময়েও ছিল। আমাদের অপরাধী করার জন্য আমি তখন বললাম—'ধীরেনদা, আমরা আপনার সুবিধার জন্য সাহায্য করতে চাইছি আর আপনি এমন বলছেন?' ধীরেনদার গম্ভীর উত্তর ছিল—'মোটেই তোরা আমায় সাহায্য করছিস না তোরা আমার সর্বনাশ করছিস।'

এত কথা যেজন্য লেখা, 'ঝিন্দের বন্দী'-র সেই যে আউটডোর, সেটা আমরা সবাই মানে তপনদা থেকে শুরু করে সকলেই দারুণ উপভোগ করেছিলাম। এমন কেউ ছিলেন না যিনি কোনও পরিস্থিতিতে অখুশি ছিলেন। রাধামোহন ভট্টাচার্য—আমাদের সকলের চেয়ে অনেক সিনিয়ার। বিশাল পণ্ডিত অথচ রসিক মানুষ। ওর কথাবার্তার ধরন একটু আলাদা। বলতেন—'ইয়ে, সৌমিত্র! তোমার কাছে স্পেয়ারেব্ল সিগারেট আছে তো? স্পেয়ারেব্ল না থাকলে আমার প্রয়োজন নেই।' সন্ধেবেলা হয়তো একটু ড্রিঙ্কস্-এর ব্যবস্থা

হয়েছে। রাধামোহনদা ধীর পায়ে এসে বলতেন—'আজকে একটু দ্রাক্ষারস পান করার সাধ হয়েছে। তোমরা যখন আছো, তখন আমিও একটু পান করার ইচ্ছা বোধ করি।' উত্তমদার সঙ্গে গৌরী বৌদিও সেবার রাজস্থানে গিয়েছিলেন। সৌমিত্র আর আমি অসাধু যুক্তি করে গৌরী বৌদিকে হারানোর জন্য সৌমিত্র-কে বৌদির তাড়া খেয়ে রাস্তায় নামতে হয়েছিল।

সৌমিত্রর সঙ্গেই সেইসময় পর পর ছবি করেছি তা নয় বা সেই সময়ে ওর অভিনয় করা সব ছবিই দেখেছিলাম— সেটাও সত্যি নয়। তবে সত্যজিৎ রায়, তপন সিংহ বা অন্য কৃতী পরিচালকদের পাশে যখন ও অন্য পরিচালকের ছবিতে কাজ করেছে—সেগুলোও সুযোগ পেলে দেখেছি। কোনও তুলনা করছি না, কিন্তু উত্তমশাসিত সময়েও সৌমিত্রর অভিনয়—কৃতিত্বকে ছোট করে দেখার কোনও কারণ নেই। বরং আমি একথাই বলবো, সেই সময়ের পরিবেশ-পরিস্থিতি অনুযায়ী সৌমিত্রের কৃতিত্বকে আলাদা করে, ঐতিহাসিক গুরুত্ব দিয়ে বিচার করা উচিত। সৌমিত্র যখন ছবি করতে এসেছিল তখন বাংলা সিনেমায় উত্তমকুমারের কাছাকাছি কেউ ছিলেন না এবং উত্তমকুমারের নিচে ছিল অনেকটা ফাঁক, সৌমিত্র নিজের যোগ্যতায় দ্রুত সেই জায়গাটা ভরাট করে দুজনের কাল্পনিক লড়াই-এ যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বী করে তুলতে পেরেছিল। যদি আরও প্রত্যক্ষভাবে বলতে হয়, তাহলে উত্তমদা-র সঙ্গে যে কয়েকটা ছবি ও করেছে তার একটাতেও কিন্তু ওর কাজ ম্লান ছিল না। এরপর ছবি যখন করেছে তখন সব ছবিতেই যে ওর কাজ সমান ভালো লেগেছে তা বলবো না— তবে এ প্রসঙ্গে একটা কথাও মনে রাখতে হবে, সৌমিত্র প্রতিভাবান অভিনেতা বলে যোগ্যতার মাপকাঠিটা সব সময়েই হয়তো একটু বেশি উচ্চতায় রেখেছি। থিয়েটার অভিনেতা ও পরিচালক হিসেবে আমি ওকে প্রথম দেখি আমাদের অভিনেতৃ সংঘের নাট্যোৎসবে করা 'রাজকুমার' নাটকে। আজও মনে আছে আমার ভীষণ ভাল লেগেছিল রাজকুমারের প্রযোজনা। প্রধান দুই ভূমিকায় সৌমিত্র-সাবিত্রীর অসামান্য অভিনয় ছাড়া, ওর পরিচালনা, মঞ্চ ও মঞ্চসজ্জার ব্যবহার সবই খুব সুন্দর হয়েছিল। সেই নাটকে আমিও একটা ছোট ভূমিকায় অভিনয় করেছিলাম। সুতরাং প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে জানি সৌমিত্র গোটা দায়িত্ব কী চমৎকার ভাবে সামলেছিল। 'রাজকুমার' দেখে শুধু আমি নই, সম্ভবত বাংলা সিনেমার আরও অনেকে পরিষ্কার বুঝতে পেরেছিলেন যে সৌমিত্র ফিল্ম অ্যাক্টিং তো জানেই, তার সঙ্গে স্টেজ অ্যাক্টিং ও ডিরেকশনটাও জানে। ওর সেই সময়ের থিয়েটার থেকেই বোঝা গিয়েছিল ওর কাজের পিছনে অনেক ভাবনা-চিন্তা পড়াশোনা আছে। পরবর্তী কালে সৌমিত্র যখন পেশাদারী মঞ্চে অনেক বেশি সময় দিয়েছে তখন আমরা ওর কাছ থেকে 'নামজীবন' থেকে শুরু করে 'প্রাণতপস্যা পর্যন্ত বেশকিছু ভালো প্রযোজনা উপহার পেয়েছি।

অনেকে বলেন সৌমিত্র নাকি বিরল ভাগ্যবান। কারণ? কারণ সৌমিত্র শিশিরকুমারের

সঙ্গে থিয়েটার আর সত্যজিৎ রায়ের হাত ধরে সিনেমা শুরু করতে পেরেছে। 'ভাগ্য' শব্দটা অত্যন্ত গোলমেলে, এ সম্পর্কে আমার কোনও বক্তব্য নেই। আমার কথা হচ্ছে—এই ভাগ্য-র উপরে তো সৌমিত্র-র নিজের কোনও নিয়ন্ত্রণ ছিল না। আর একজন কেন ভাগ্যবান, কেন অন্যজন নয়—এ নিয়েও কোনও সদর্থক আলোচনা চলে না। সৌমিত্র যেভাবে তার 'ভাগ্য' বা শিক্ষার সুযোগ দুটো কাজে লাগিয়েছে তা অন্যরা পারেননি কেন? সুতরাং সার্থকভাবে কাজে লাগানোর সম্পূর্ণ কৃতিত্ব সৌমিত্র-কেই দিতে হবে।

অভিনয় প্রসঙ্গে সৌমিত্র নিজের শিক্ষা জানার প্রবল ইচ্ছা এবং জীবনের অভিজ্ঞতাকে সাফল্যের সঙ্গে ব্যবহার করেছে। ওর কল্পনাপ্রবণ সৃষ্টিশীল কবি-লেখক (মনে মনে ও তো একজন অপুই) সত্তারও একটা ভূমিকা এখানে রয়েছে বলে মনে করি। যাঁরা তেমন কাছাকাছি থাকেননি তাঁরা হয়তো জানেন না সৌমিত্র একজন দায়িত্বশীল, দক্ষ সংগঠকও। অনিবার্যভাবে এবার আমার অভিনেতৃ সংঘের প্রসঙ্গে আসতে হচ্ছে। 'অভিনেতৃ সংঘ' তৈরি হয়েছিল আমাদের আগে অর্থাৎ অহীন্দ্র চৌধুরি-ছবি বিশ্বাস-বিকাশ রায়-ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়দের সময়ে। সংস্থাটি সম্ভবত ১৯৫০-এ স্থাপিত হয়েছিল। ১৯৬৬-তে সৌমিত্র 'অভিনেতৃ সংঘ'-র জেনারেল সেক্রেটারি নির্বাচিত হয়েছিল, প্রেসিডেন্ট ছিলেন উত্তমকুমার, আর বুয়াদা (শ্যাম লাহা) ছিলেন ট্রেজারার। ১৯৬৮-র মার্চে কলকাতা-হাওড়া এবং কিছুদিনের মধ্যে গোটা বাংলা সব সিনেমা হলগুলোর কর্মীরা বেতন মহার্ঘভাতা ইত্যাদির দাবিতে ধর্মঘট করেন। প্রোডিউসার, ডিস্ট্রিবিউটার আর হল মালিকরা তাঁদের স্বার্থরক্ষার জন্য 'চলচ্চিত্র সংরক্ষণ সমিতি' গঠন করে। সঙ্কট সমাধানের জন্য বাংলা চলচ্চিত্রের শিল্পী ও কলাকুশলীদের প্রতিনিধিরা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শরণাপন্ন হন, মুখ্যমন্ত্রীর কাছে স্মারকলিপিও দেওয়া হয়। এইসব কর্মকাণ্ডের সূত্র ধরেই অভিনেতৃ সংঘের মধ্যে ফাটল ধরে। সৌমিত্রের নেতৃত্বে আমরা প্রযোজক-ডিস্ট্রিবিউটরদের অন্যায় দাবি ও চিন্তা মেনে নিতে পারিনি। কারণ খুবই স্বচ্ছ ছিল। আমরা মনে করেছিলাম ওঁরা সামগ্রিকভাবে টালিগঞ্জের টেকনিসিয়ান্স, স্টুডিও মালিক, হলের কর্মচারীদের কথা ভাবছেন না। শুধুমাত্র নিজেদের ব্যবসায়িক স্বার্থ কায়েম রাখতেই ওঁরা ধর্মঘট চালু রাখতে চাইছেন, সমস্যার যুক্তিসঙ্গত সমাধান চাইছেন না।

আমাদের সংস্থার প্রেসিডেন্ট উত্তমকুমার চট্টোপাধ্যায়ের ৩নং ময়রা স্ট্রিটের বাড়িতে আমাদের গুরুত্বপূর্ণ সভা হল। সেখানে উত্তমকুমার ঘোষণা করলেন—'যদি তেলেভাজাও বিক্রি করতে হয়, তাও করবো, কিন্তু সংরক্ষণের পক্ষে আমরা নেই, থাকছি না।' সেটা আমাদের শিল্পী-জীবনের একটা অত্যন্ত সঙ্কটময় সময়, সেজন্য উত্তমদা-র সেই ঘোষণা আজও অক্ষরে অক্ষরে মনে আছে। সৌমিত্র সহ আমরা সকলেই খুব উৎসাহিত হলাম। এটাও মনে আছে, উত্তমদার মুখের কথায় আমি হাততালিও দিয়েছিলাম। কিন্তু সংহতির

সেই ছবি বদলে যেতে খুব বেশিদিন লাগেনি। সভাপতি উত্তমকুমার মুখ্যমন্ত্রীর কাছে পেশ করা স্মারকলিপি প্রত্যাহার করলেন। বিকাশ রায়, অনিল চট্টোপাধ্যায়, নির্মলকুমার, জহরদা (রায়), মাধবী, সুপ্রিয়া প্রমুখরা উত্তমকুমারকে সমর্থন করলেও আমরা করিনি। আমরা অর্থে, সৌমিত্র-র সঙ্গে থাকা ভানুদা, শুভেন্দু, অনুপকুমার, বুয়াদা, বিশ্বজিৎ, অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়, কালীদা, উৎপল দত্ত, রবি ঘোষ, বসন্তদা, শৈলেন মুখোপাধ্যায়, শর্মিলা, অপর্ণা, গীতা দে, নীলিমা দাস, লিলি চক্রবর্তী, রুমা গুহঠাকুরতা, শোভা সেন প্রমুখরা।

উত্তমকুমারের মত বদলানোর কারণটা পরে জানা গিয়েছিল। 'ছোটি সি মোলাকাৎ' ছবি করার জন্য উত্তমদা ডি সি কাংকারিয়া প্রমুখদের কাছ থেকে বিরাট টাকা ধার নিয়েছিলেন। সংরক্ষণ সমিতির পক্ষে থাকা সদস্যদের অন্যতম হিসেবে কাংকারিয়ারা উত্তমকুমারকে টাকা ফেরৎ দেওয়ার জন্য চাপ দেন এবং উত্তমদা নাকি সেই মুহূর্তে টাকাটা ফেরৎ দেওয়ার মত আর্থিক অবস্থায় ছিলেন না। বীতশ্রদ্ধ সৌমিত্র প্রথমে সাধারণ সম্পাদক পদ থেকে পদত্যাগ পত্র দিয়েছিল, কিন্তু উত্তমকুমার তা গ্রহণ করেননি। অনিবার্য ভাবে ভেঙে গেল আমাদের সংস্থা। সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে সিনেমা মহল সকলেই তখন ঘটনাটা উত্তমকুমার বনাম সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় হিসেবে নিয়েছিলেন। আমার লিখতে কোনও দ্বিধা নেই—শেষপর্যন্ত সেই লড়াই-এ সৌমিত্রই জিতেছিল। ইম্‌পা সৌমিত্রসহ ছজন শিল্পীকে ব্ল্যাক লিস্টেড করতে চেয়েছিল, কিন্তু অন্তিম স্তরে তাও সম্ভব হয়নি। উত্তমকুমার শিবির তখন 'শিল্পী সংসদ' নামে আলাদা একটা সংস্থা তৈরি করলেন। সেই সময় সৌমিত্র-র নেতৃত্বকে আমি শুধু পরিচ্ছন্ন, ভালো ইত্যাদিই বলবো না, বলবো নির্ভুল এবং দূরদৃষ্টিসম্পন্ন। তারপর থেকে আমাদের অভিনেতৃ সংঘ 'বামপন্থী শিবির' হিসেবে চিহ্নিত হয়। এখনও মনে আছে সৌমিত্র সহ আমরা বুয়াদা-র সিদ্ধান্তে খুব অবাক এবং খুশি হয়েছিলাম। বিকাশ রায়, জহর রায় সহ ওঁর বন্ধুরা সকলেই 'শিল্পী সংসদ'-এ চলে গেলেও শ্যাম লাহা কিনা আমাদের সঙ্গে। আজ মনে হয় চলচ্চিত্রের বাইরের অধিকাংশ মানুষই বোধহয় তখন অভিনেতৃ সংস্থার সঙ্গে ছিলেন। অন্য শিবিরে উত্তমকুমার থাকা সত্ত্বেও আমাদের ড্রামা ফেস্টিভ্যাল খুবই সফল হয়েছিল। কর্মীদের অর্থ সাহায্য ইত্যাদি ধরনের কাজেও আমরা সাফল্য পেয়েছিলাম। অভিনেতা বন্ধু সম্পর্কে কিছু লিখতে গেলে শেষ পর্যন্ত অভিনয় প্রসঙ্গে ফিরে আসতেই হয়। এখন সৌমিত্র তার দীর্ঘ অভিজ্ঞতা, পড়াশোনা, বিশ্লেষণের বুদ্ধি এবং প্রতিভায় যে স্তরে এসে পৌঁছেছে, এই মুহূর্তে তার কোনও তুলনা নেই। সৌমিত্র-র নাটক সম্পর্কে আগেই বলেছি, প্রায় সব নাটকেই একজন কাজ জানা, ভাবনা-চিন্তা করা পরিচালকের তা বোঝা যায়। তবে সৌমিত্র-র সব নাটক কিন্তু রাজকুমার, নামজীবন, নীলকণ্ঠ, প্রাণতপস্যা-র পর্যায়ের বলে আমার মনে হয়নি। 'দর্পণে শরৎশশী' ও টিকটিকি বেশ ভাল, কিন্তু 'ফেরা'

আমার তেমন ভাল লাগেনি।

সৌমিত্র একজন যথার্থ মার্জিত, শিক্ষিত রসিক মানুষ। বয়সের ছাপ পড়লেও এখনও সৌমিত্রর চেহারা দেখবার মত, এখনও সুপুরুষ। অভিনয়ের এত চাপের মধ্যে ওর আবৃত্তি ও লেখালেখির কাজ দেখে অবাক হতে হয়। পুরস্কার ইত্যাদি কোনও অভিনেতার যোগ্যতা বিচারের মাপকাঠি বলে কখনও মনে করি না। বয়স হলেই একজন অভিনেতা আরও পরিণত হবেনই তার কোনও মানে নেই। কিন্তু সৌমিত্র বয়সের সঙ্গে সঙ্গে সমৃদ্ধতর হয়েছে, হচ্ছে। ক্ষুধিতপাষাণে বাদশা হয়ে প্রেমিক সৌমিত্র-কে আজাদ করে দিয়েছিলাম, কিন্তু এখন তাকে জীবনের প্রেমে প্রবল ভাবে আটকে রাখতে চাইছি—নতুন নাটকে চলচ্চিত্রে আরও কিছু অভিনয় দেখার জন্য।

[সৃষ্টি প্রকাশন-প্রকাশিত এবং অলক চট্টোপাধ্যায় ও মানস চক্রবর্তী–সম্পাদিত **সৌমিত্র** *(প্রথম সংস্করণ: ২০০০) গ্রন্থ থেকে মূল বানান ও মুদ্রণপ্রমাদ অপরিবর্তিত রেখে হুবহু পুনর্মুদ্রিত হল।]*

নট সৌমিত্রঃ
বর্তমানের চোখে

নাম জীবন থেকে *আত্মকথা*: দীর্ঘদিনের এক 'মিতা'-র কথা

লিলি চক্রবর্ত্তী

সৌমিত্রদাকে নিয়ে কিছু লিখতে গিয়ে মনে হচ্ছে, সমুদ্রে হাবুডুবু খাচ্ছি। কোন্ কথা ছেড়ে কোন্ কথা লিখব, কিছুই ভেবে উঠতে পারছি না। তবু লিখতে যখন হবেই—

১৯৭৮ সালের ২১ ডিসেম্বর কাশী বিশ্বনাথ মঞ্চে সৌমিত্রদার পরিচালনায় *নাম জীবন* নাটকের শুভারম্ভ হয়েছিল। সেই নাটক দেখে অনেক দর্শককে বলতে শুনেছিলাম— 'কমার্শিয়াল মঞ্চে গ্রুপ থিয়েটারের আঙ্গিকের নাটক'।

আমি কিন্তু এখনও 'গ্রুপ থিয়েটার' আর 'কমার্শিয়াল থিয়েটার'-এর তফাতটা বুঝিনি, কারণ যে-কোনো থিয়েটার করতে গেলে প্রথমেই টাকা খরচা করতে হয় সেটা তৈরি করার জন্য। আর যতদিন-না খরচার টাকাটা উঠে লাভ হয়, সেইদিকে তাকিয়ে থাকতে হয়। তা না-হলে সেই নাটকের সেখানেই সমাপ্তি।

আমি কোনোদিন 'গ্রুপ থিয়েটার' করিনি। কিন্তু বিভিন্ন মঞ্চে বিভিন্ন পরিচালকের পরিচালনায় অনেক নাটক করেছি। সেগুলো সবই তথাকথিত 'কমার্শিয়াল' নাটক। সৌমিত্রদার সঙ্গে প্রথম বার *নাম জীবন* নাটকে কাজ করতে গিয়ে অনেককিছু শিখতে পেরেছি।

সৌমিত্রদা এমনিতে খুব মজার মানুষ—সুন্দর-সুন্দর কথা বলেন, মজা করেন; কিন্তু রিহার্সালের সময়ে খুব সিরিয়াস। সবাইকে খুব মনোযোগ দিয়ে তৈরি করতে গিয়ে নিজের দিকে নজর দিতে পারতেন না। সকলের সংলাপ ঝরঝরে মুখস্থ; কিন্তু নাটক শুরু হওয়ার দু-দিন আগে পর্যন্ত উনি নিজের চরিত্রে অন্য আর্টিস্টকে স্টেজে পাঠিয়ে নিজে বাইরে দাঁড়িয়ে লাইট, মিউজিক, সেট করাতেন! আমরা তো ভয় পাচ্ছিলাম যে, উনি নিজে কখন তৈরি হবেন? কিন্তু শোয়ের দিন দেখলাম, উনি সম্পূর্ণ তৈরি—প্রত্যেকটা সংলাপ মুখস্থ! এই হচ্ছেন সৌমিত্রদা।

ওঁর নির্দেশ ছিল শো-চলাকালীন স্টেজের বাইরে বা গ্রিন রুমে খুব আস্তে-আস্তে কথা বলা। আর আমরা সবাই সেই নিয়মটা মেনে চলতাম। *নাম জীবন* নাটকের যিনি প্রযোজক ছিলেন তিনি খুব জোরে কথা বলতেন আর গলা ফাটিয়ে হাসতেন। তাই শো-চলাকালীন তাঁর ভেতরে ঢোকাই বারণ ছিল! কিছুকিছু শিল্পীর প্রবণতা আছে বাড়তি ডায়ালগ বলার। তেমনি একজন *নাম জীবন*-এও ছিলেন—মিন্টুদা। তাঁকে অনেকবার বলা সত্ত্বেও স্বভাবটা

ছাড়তে পারেননি। একদিন মেক-আপ রুমে ঢুকে উনি টেবিলের ওপর একটা স্লিপ পেয়েছিলেন; তাতে লেখা ছিল স্ক্রিপ্টা আর-একবার ভালো করে পড়তে।

আমিও একটা স্লিপ পেয়েছিলাম; সেটা ভারী মজার। সৌমিত্রদার নির্দেশ ছিল, খুব হালকা পাউডার দিয়ে মেক-আপ করে, চোখ আর ভুরু এঁকে, চুল বেঁধে ওই চরিত্রটা আমাদের করতে হবে। একদিন গ্রিন রুমে ঢুকতেই—আমার একজন হেল্পার ছিলেন মণিকাদি—উনি বললেন, ''তোমার একটা চিঠি আছে। সৌমিত্রদা দিয়ে গেছেন।'' আমি তো খুব ঘাবড়ে গেলাম, কারণ তখুনি একসঙ্গে সিন করে বেরিয়েছি; তাহলে চিঠি লেখার কী দরকার? মুখে বললেই তো হত! যাই হোক, গিয়ে দেখি মেক-আপ টেবিলে একটা স্লিপ। তাতে লেখা ছিল: ''এত মেক-আপ করেছ কেন? তোমায় বারণ করেছিলাম-না?'' আমি সঙ্গেসঙ্গে ওঁর কাছে গিয়ে বললাম, ''আমি একটুও মেক-আপ করিনি, আপনি দেখুন'' উনি বললেন, ''ঠিক আছে, যখন দোতলায় সিন হবে তখন গালে হাত দিয়ে দেখব কতখানি মেক-আপ আছে।'' এইরকম মজার মানুষ উনি। শুধু মেক-আপই নয়, সবদিকে কড়া নজর ওঁর! সকলের ড্রেস নিজে পছন্দ করে কিনে 'ওয়েদার' করিয়েছিলেন। আমার শাড়িগুলো উনিই বেছে ঠিক করে দিয়েছিলেন কোন্ সিনে কোন্টা পরব। মানে, ওঁর কাছে সবকিছুই একদম পারফেক্ট হওয়া চাই।

আরও একটা নাটক করেছি বিশ্বরূপাতে। ওপেনিং ডেট-টা ঠিক মনে নেই। যাই হোক, সেই নাটকে প্রায় যাটটি চরিত্র ছিল। উনি মেইন ক্যারেক্টারগুলো বাদ দিয়ে বাদবাকি চরিত্রগুলো এক-একজন শিল্পীকে দু-তিনটে করে রোল করিয়েছিলেন—মেক-আপ, কস্টিউম আর অ্যাক্টিংয়ের স্টাইল পালটে! আর সেটা খুব সহজ কাজ ছিল না—অনেক বুদ্ধি খাটিয়ে করতে হয়েছিল। সেটা সৌমিত্রদা বলেই সম্ভব হয়েছিল।

এখন একটা নাটক করছি ওঁর সঙ্গে; নাম *আত্মকথা*। এই নাটকে সৌমিত্রদাকে একটু অন্যরকম মেজাজে দেখছি। রিহার্সাল তো যথারীতি অনেক দিন ধরেই হয়েছিল, কিন্তু মেক-আপের ব্যাপারটা একদম অন্যরকম! এই নাটকে তিনটি মেয়ে চরিত্র, আর তিনজনেই খুব ভালোরকম মেক-আপ করে আমরা স্টেজে অভিনয় করি।

সৌমিত্রদার নাটকে যেসব দর্শক আসেন তাঁরা একটু উচ্চপর্যায়ের। সাধারণ দর্শকের সাথে অনেক বিখ্যাত লোকেরাও ওঁর নাটক দেখতে ভালবাসেন।

সৌমিত্রদার সাথে শুধু যে নাটক করেছি তাই নয়, ওঁর অনেক নাটক আমি দেখেওছি; যেমন *রাজকুমার*, *নীলকণ্ঠ*, *ফেরা*, *দর্পণে শরৎশশী*, *ঘটক বিদায়*, এখনকার *হোমাপাখি*—

এই প্রত্যেকটা নাটকে সৌমিত্রদার অভিনয়ের গুণে ওঁর অভিনীত চরিত্রগুলো আলাদা মাত্রা পেয়েছে। প্রত্যেকটা চরিত্র আলাদা ধরনের, আর সেগুলো ফুটিয়ে তুলতে উনি সারা শরীর দিয়ে, কণ্ঠ দিয়ে অভিনয় করে প্রশংসিত হয়েছেন। বিশেষ করে, আমি ভুলতে পারি না ওঁর *নীলকণ্ঠ* নাটকের অভিনয়। যদিও ওঁর অভিনয়ের বিচার করা আমার ধৃষ্টতা, তবুও বলব—অসাধারণ। এখনও এই বয়সে এসেও উনি মঞ্চে যেভাবে অভিনয় করেন সেটা সত্যিই শিক্ষণীয়।

সৌমিত্রদার প্রত্যেকটি নাটকের মঞ্চপরিকল্পনা ওঁর নিজের; আর সেগুলো এত সুন্দর যে, বলা যায় না। *নাম জীবন* নাটকের সময়ে ওঁর পরিচিত কত লোক ওই সেটটা দেখতে আসতেন! সেটটা সত্যিই অসাধারণ ছিল। একটা বস্তিবাড়ির তিনটে দরজা; তার ওপর দোতলায় একটা ঘর। দূরে সরু গলি; সেই গলিতে একটা লাইট পোস্ট। টালির চালের ওপর হাবিজাবি কতকিছু রাখা। দোতলার সিঁড়ির নীচে জলের কল। সেটটা তৈরি করেছিলেন সুরেশ দত্ত। পরিকল্পনা ছিল সৌমিত্রদারই।

শুধু নাটকই নয়, ওঁর কবিতাপাঠও শোনার মতো। উনি নিজেও কবিতা লেখেন।

আমরা বিকাশ রায়ের পরিচালনায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের *শেষের কবিতা* পাঠ করেছিলাম। সবাই বলে 'শ্রুতিনাটক'; কিন্তু আমি মনে করি, ওটা নাটকপাঠ। ওটার অনেকগুলো শো আমরা করেছিলাম। *শেষের কবিতা*-য় সৌমিত্রদা করতেন অমিত রায়, আর আমি করতাম লাবণ্য; নীলিমা দাস করতেন যোগমায়া। সেটা এত সুন্দর হত যে, যখন আমরা পাঠ করতাম তখন অডিটোরিয়ামে একটা টুঁ শব্দও শোনা যেত না! শেষ দৃশ্যে যখন সৌমিত্রদা *শেষের কবিতা* পাঠ করতেন তখন মঞ্চে বসে আমাদের চোখেও জল এসে যেত—এত দরদ থাকত!

কলকাতার আশেপাশে অনেক কল শো করেছি সৌমিত্রদার সঙ্গে—*রত্নদীপ*, *শ্রীযুক্ত বাবুমশাই*, *জীবনসাথী*। তখন আমরা দলের সবাই একসঙ্গে লাক্সারি বাসে করে যেতাম। সৌমিত্রদাও থাকতেন বাসে। বাস দিল্লি রোড বা বম্বে রোডে পড়লেই সবাই মিলে তাস খেলতে বসে যেতাম। কিছুক্ষণ বাদে সৌমিত্রদার খেয়াল হলে সিট থেকে উঠে দেখতেন। আমরা তাস খেলছি দেখে হাসতেন আর বলতেন, "ব্যাস্, বসে গেছে সব জুয়াড়িগুলো!" আসলে আমরা সময় কাটাবার জন্যই তাস খেলতাম। শোয়ের শেষে ফেরার পথে যতক্ষণ-না ঘুমিয়ে পড়তেন, বসে বসে উদাত্ত কণ্ঠে গান করতেন—বেশিরভাগই রবীন্দ্রসংগীত। তখন এত ভালো লাগত যে, কী বলব! আসলে উনি যেটাই করেন সেটাই একটা উচ্চপর্যায়ে

চলে যায়।

এতক্ষণ সৌমিত্রদার সম্পর্কে কত কথাই বললাম। একজন আন্তর্জাতিক-খ্যাতিসম্পন্ন মানুষ, একজন জাতীয় পুরস্কার—প্রাপ্ত অভিনেতা, যাঁর সঙ্গে আমি আমার পঞ্চাশ বছরের অভিনয়জীবনে কত ছবি ও নাটকে অভিনয় করে ওঁর সংস্পর্শে এসে নিজেকে ধন্য ও গর্বিত মনে করছি। অত বড়োমাপের অভিনেতা হওয়া সত্ত্বেও উনি কিন্তু মাটিতে পা দিয়েই হাঁটেন! কোনোরকম অহংকার বা উন্নাসিকতা ওঁর মধ্যে নেই। ওঁর স্নেহ, ভালোবাসা ও আশীর্বাদের হাত চিরদিন যেন আমাদের মাথার ওপর থাকে—এটাই কামনা করি।

পরিশেষে বলব, আমি কোনোদিনই কিছু লিখিনি—এই প্রথম এমন একজন মানুষের সম্পর্কে কিছু লেখার সৌভাগ্য আমার হয়েছে, যদিও পঞ্চাশ বছরের অভিজ্ঞতার সবটা লেখা তো সম্ভব নয়! আমার লেখায় কোনো ত্রুটি থাকলে পাঠকেরা নিজগুণে ক্ষমা করে দেবেন। সেইসঙ্গে সৌমিত্রদাও আমার ধৃষ্টতা মার্জনা করবেন।

প্রাণতপস্বী

দ্বিজেন বন্দ্যোপাধ্যায়

সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়কে তো আমরা ছোটোবেলা থেকেই চিনি। চিনি এই অর্থেই যে, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় আমাদের প্রিয় অভিনেতা, সিনেমায়। তবে তাঁর সঙ্গে আমার প্রথম চাক্ষুষ পরিচয় হয় যখন আমাদের *অমিতাক্ষর* নাটকটি তিনি দেখতে আসেন। সেখানেই তাঁর সঙ্গে আমার প্রথম আলাপ। পরে শুনেছি, ইতঃপূর্বে উনি *দানসাগর*-এও দেখেছিলেন আমার অভিনয়। যাই হোক, সেখান থেকেই সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে পরিচয়, এবং সেই পরিচয়সূত্রে বলতে পারি যে, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় আমাদের মতো সাধারণ নাট্যকর্মীদের সঙ্গে মেলামেশার ক্ষেত্রে কোনোরকম দূরত্ব কখনও বজায় রাখেননি। তিনি খুব সহজ, খোলামেলা, এবং বন্ধুত্ব-করার-উপযুক্ত একজন মানুষ।

সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের নাট্যকর্মের সঙ্গে আমি পরিচিত হই যখন আমি সেটাই তাঁর *নাম জীবন* দেখি। সাধারণ রঙ্গালয়ে তাঁর নির্দেশিত প্রথম নাটক। সেই সময়ে যখন কাশী বিশ্বনাথ মঞ্চে *নাম জীবন* প্রযোজিত হয়, সাধারণ রঙ্গালয়ে সেটা ছিল একেবারে ব্যতিক্রমী প্রযোজনা। ইচ্ছে ছিল তাঁর থিয়েটারের কাজ আরও কাছ থেকে দেখার। আমারও ততদিনে থিয়েটার অনেক দিন করা হয়ে গেছে, সৌমিত্রবাবুও অনেকগুলো প্রযোজনা করে ফেলেছেন সাধারণ রঙ্গালয়ে; এমনকি স্বপ্নসন্ধানী-প্রযোজিত *টিকটিকি* নাটকটিও অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়েছে। সেই সময়ে, সম্ভবত ১৯৯৬ সালে, আমি নিজে থেকেই বিশ্বরূপায় হাজির হয়েছিলাম। অবশ্য স্বপ্নসন্ধানীর কৌশিকই আমাকে বলেছিল যেতে। তখন সৌমিত্রবাবু *ন্যায়মূর্তি* বলে একটি প্রযোজনার কাজ বিশ্বরূপায় শুরু করেছেন। সেই সময়ে আমার খুব ইচ্ছে ছিল, সাধারণ রঙ্গালয়ে কেমন করে হয়, নিয়মিত অভিনয়, ওখানে অভিনয় করতে কেমন লাগে, একটু দেখি। তা আমাদের কাছে পরিচিত নাট্যব্যক্তিত্ব ছিলেন সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়; ফলে কৌশিক বলায় আমি তাঁর কাছে হাজির হই। আমি নিজে কখনও এর আগে সাধারণ রঙ্গালয়ে অভিনয় করিনি। তখন সৌমিত্রদা আমাকে বলেন, "আমার সমস্ত ভালো কাস্টিং হয়ে গেছে। তোমার মতো অভিনেতাকে আমি কীভাবে ব্যবহার করব বলো তো? আমি তোমাকে খুব ছোটো দুটো রোল দেব। কিন্তু আমি চাই, তুমি আমার সঙ্গে থাক, আমার থিয়েটারে থাক।" সেই ভাবনা থেকে আমি *ন্যায়মূর্তি* নাটকে খুব ছোটো দুটো চরিত্রে অভিনয়

করেছিলাম; মানে, সমস্তটা মিলিয়ে হয়তো আমার appearance ছিল বড়োজোর পাঁচ-সাত মিনিটের। কিন্তু ওই নিয়মিত অভিনয় করার যে-স্বাদ, যে-মজা, সেটা পূর্ণমাত্রায় পেতাম আর দেখেছিলাম সাধারণ রঙ্গালয়েও শৃঙ্খলার ওপর কতটা জোর দিয়ে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় একটা প্রযোজনা তৈরি করছেন। এমনকি যখন মঞ্চে অভিনয় চলত—নাটকটিতে অনেক চরিত্র ছিল, আমরা প্রায় সত্তরজনের মতো অভিনেতা-অভিনেত্রী ছিলাম—অভিনয় করতে করতে আমরা মঞ্চের পাশে দাঁড়িয়ে থাকতাম। আমার প্রথম দৃশ্য ছিল, আর শেষ দৃশ্যের আগের দৃশ্যে আমার আর-একটা অভিনয় ছিল। প্রথম দৃশ্যে আমি একজন ড্রাইভারের চরিত্র করেছিলাম। পুরো নাটকে যে-ঘটনাটা ঘটেছে তা নিয়ে তিনজন বিশিষ্ট মানুষ নিজেদের মধ্যে আড্ডা মারছে—এইরকম একজন বিশিষ্ট লোকের চরিত্র শেষের আগের দৃশ্যে করেছিলাম। এর ফলে বেশিরভাগ সময়টাই আমি back stage-এ থাকতে পারতাম, আর পাশে দাঁড়িয়ে প্রায় গোটা নাটকটাই দেখতে পারতাম। তখন দেখতাম সৌমিত্রদা শৃঙ্খলার ওপর কতটা নজর রাখেন! প্রত্যেকটি অভিনেতা-অভিনেত্রীর চালচলন, লাইটের সঠিক প্রয়োগ, এবং সেট তৈরি করার ক্ষেত্রে প্রত্যেকদিন আগে থেকে এসে সব ঠিকভাবে দেখে নেবেন তিনি। অতদিন পর্যন্ত যে একটা নাটক হচ্ছে, নিয়মিত হচ্ছে, তাও তিনি প্রতিদিন সবচেয়ে আগে পৌঁছে গিয়ে সমস্ত ব্যাপারটা দেখে নিতেন! মানে, শৃঙ্খলা বলতে কী বোঝায়, অভিনয়ের দিন একজন নাট্যকর্মীর কেমন আচরণ করা উচিত, তার দৃষ্টান্ত ছিলেন তিনি। এর ফলে ওখান থেকে আমি অনেকটাই শিখেছি। পরবর্তীকালে *ন্যায়মূর্তি* তো বন্ধ হয়ে গেল, কিন্তু সৌমিত্রদার একাধিক প্রযোজনায় আমি তাঁর সঙ্গে জড়িয়ে গেলাম।

এরপর পুরাতনী বলে একটি সংগঠনের তরফ থেকে *বিল্বমঙ্গল* প্রযোজিত হল। সেখানে আমি একজন ভিক্ষুকের চরিত্রে অভিনয় করলাম। সাধারণ রঙ্গালয়ের পুরোনো অভিনেতা-অভিনেত্রীদের জড়ো করে রঙ্গনা থিয়েটারের গণেশবাবু এই পুরাতনী সংস্থাটি গড়ে তুলেছিলেন। সৌমিত্রদা ছাড়াও লাবনী সরকারের মতো সাধারণ রঙ্গালয়ের অনেক মানুষ এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন। এই *বিল্বমঙ্গল* প্রথমে বিশেষ একটা অনুষ্ঠানে হয়েছিল। তারপরে আরও কয়েকবার নাটকটি অভিনীত হয়। মোট পাঁচ-ছয়টি শো হয়েছিল বোধহয়।

এরপর সৌমিত্রদা করলেন *প্রাণতপস্যা*। সেটা আধুনিক নাট্যসংস্থা নামে একটি গোষ্ঠী তৈরি করল। তাতে আমিও অভিনয় করলাম। এই নাটকে সৌমিত্রদার সঙ্গে অভিনয় করার যে-অভিজ্ঞতা, সেটা খুবই সুখপ্রদ আমার কাছে। কোনো সহ-অভিনেতার ভালো অভিনয়

কীভাবে হবে তার জন্য মঞ্চের ওপর সবসময় সহযোগিতা করেন তিনি। আমি শুনেছিলাম, সাধারণ রঙ্গালয়ে একজন অভিনেতার অন্য অভিনেতাদের টেক্কা দেওয়ার ব্যাপার থাকে। কিন্তু যখন যার দৃশ্য থাকে তখন তাকে কীভাবে সহযোগিতা করা যায় একজন যথার্থ অর্থে professional actor হয়েও, সেটা এই নাটকে অভিনয় করতে গিয়ে তাঁর কাছে দেখলাম। এক কথায়, তিনি খুব helpful সহ-অভিনেতা। যখন আমার অভিনয়টা হচ্ছে তখন তিনি নিজের চরিত্রের এমন একটা নিষ্ক্রিয় ভাব রাখতেন যাতে আমাকেই চোখে পড়ে, তাঁকে নয়। মঞ্চে তাঁকে ছাড়িয়ে অন্য কাউকে চোখে পড়ানোটা খুব অসুবিধের, কারণ তাঁর চেহারা ও ব্যক্তিত্ব সাধারণ গড়পড়তা বাঙালির থেকে অনেকটাই আলাদা। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমাকে চোখে পড়ত—এই ব্যাপারটা আমাকে আকর্ষণ করেছিল। সবচেয়ে মজার ব্যাপার যে, শো হয়ে যাবার পর উনি জনে-জনে ডেকে জিজ্ঞেস করতেন, "দ্বিজেনের অভিনয়টা দারুণ না? দ্বিজেনের অভিনয় কেমন লাগল?" এইটা আমার কাছে খুব শিক্ষণীয় যে, শুধু একজন সহ-অভিনেতা হিসেবে নয়, একজন director হিসেবেও আর-একজন অভিনেতার ভালো অভিনয় দেখে তিনি তৃপ্তি পাচ্ছেন। এই ব্যাপারটা আমার কাছে খুব interesting লেগেছিল, এবং এরকমটাই হওয়া উচিত।

তারপর তো তাঁর সঙ্গে আমি *নীলকণ্ঠ* নাটকের revival যখন হল তখন ওই নাটকে অভিনয় করতে শুরু করলাম। সেটা আয়ন্দা বলে একটি সংগঠন produce করল। *নীলকণ্ঠ* নাটকের বহু অভিনয় হয়েছে, পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্তে অভিনয় হয়েছে। সেখানেও আমি একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে অভিনয় করতে পারলাম এবং সেটা করতে খুব ভালো লাগল। যখন মঞ্চে সৌমিত্রদা থাকতেন না তখন মঞ্চের পাশে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমার অভিনয়টা উনি দেখতেন। এটা আমার কাছে খুব interesting লেগেছিল। আমার appearance-টা দেখে দর্শক কীভাবে react করছে সেটাও উনি স্টেজের পাশে দাঁড়িয়ে উইংস থেকে দেখতেন।

এইভাবে অনেক দিন ধরে তাঁর সঙ্গে কাজ করার পর আমাদের *প্রাণতপস্যা* নাটকটা আবার revive করল মুখোমুখি নামে একটি সংস্থা। নতুন করে সেটা নিয়মিতভাবে অভিনীত হতে লাগল।

প্রাণতপস্যা ও *নীলকণ্ঠ*-র পরে সৌমিত্রদা আয়ন্দা থেকে দুটো ছোটো নাটক করলেন—*আর একটি দিন* ও *কুরবানি*। *কুরবানি* এখনও মাঝেমাঝে হয়। তবে *আর একটি দিন* এখন

আর অতটা হয় না। *কুরবানি* আমরা সাধারণত আমন্ত্রণ পেলে অভিনয় করি। এই নাটকে মূলত সৌমিত্রদা আর আমার অভিনয় রয়েছে। দুজনে মিলে একটা conversation চলে পুরো নাটকটা জুড়ে। এটিকে একটি স্বল্পদৈর্ঘ্য একাঙ্ক নাটক বলা চলে।

কুরবানি-র পর হল *আরোহণ*। সেখানে আবার বিভিন্ন নাট্যব্যক্তিত্ব অভিনয় করলেন, যেমন খেয়ালী দস্তিদার, বিশ্বজিৎ চক্রবর্তী, প্রমুখ। সৌমিত্রদা অপেক্ষাকৃত একটা স্বল্প পরিসরের চরিত্রে অভিনয় করলেন—মাত্র দুটো দৃশ্যে। দুই ভাই, এক বোন আর ভগ্নিপতি—এই চারজনের tussle নিয়েই এই নাটক। অনেকটা Chekhovian পটভূমি ছিল; পুরোনো আমলের মালদা জেলার হরিশ্চন্দ্রপুরের পটভূমিতে ঘটনাটা ঘটে। সেখানে আমরা অভিনয় করলাম অনেকেই। খেয়ালী ও বিশ্বজিৎ ছাড়াও অঞ্জনা বসু, আমার স্ত্রী সুমিতা, পৌলমী বোস, ইত্যাদি অনেক অভিনেতা-অভিনেত্রী ছিলেন। এই নাটকে একটা দৃশ্য ছিল যেখানে সৌমিত্রদা অসুস্থ। হুইলচেয়ারে তাঁর প্রবেশ। হুইলচেয়ার থেকে উঠে কখনো-কখনো একটু হাঁটাচলা চলত (না?)। হঠাৎ শরীরে কষ্ট হয়। তিনি স্ত্রীকে ওষুধ দিতে বলেন। তিনি দেন না। একটা অমানবিক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। তিনি ওষুধের জন্য নিজেই সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠতে থাকেন এবং একসময় নীচে পড়ে যান। তখন তিনি অচেতন হয়ে পড়েন। এই যে সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে পড়ে-যাওয়ার দৃশ্য—এখানে সৌমিত্রদা যে কী অসাধারণ অভিনয় করতেন! মৃত্যুযন্ত্রণাকে শরীরে ধারণ করে সিঁড়ি দিয়ে ওঠার এই অভিনয়টা অসাধারণ। তখন সৌমিত্রদার বয়স অনেকটাই হয়েছে। সিঁড়ি দিয়ে উঠতে গিয়ে পড়ে-যাওয়ার শারীরিক ধকল অনেকটাই নিতে হয়েছিল তাঁকে। সে যে কী অবিস্মরণীয় অভিনয় করতেন তিনি! আমরা সবাই পাশ থেকে দেখতাম, আর শিখতাম কী-করে একটা মানুষ এই অভিনয়টা করেন। এই situation-টা build up করাটাও একটা শেখার বিষয়—হুইলচেয়ারে বসে কথা বলতে বলতে হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে-পড়া, দম আটকে-যাওয়া, সেই অবস্থায় ওষুধের কথা আধো উচ্চারণে বলা। যখন দেখা যায় যে, তাঁকে ওষুধ দেওয়া হচ্ছে না, তখন তিনি আপ্রাণ চেষ্টা করে বামুনদিকে ডাকতে থাকেন। যখন বামুনদিও আসে না তখন হুইলচেয়ারটা পায়ে করে সরিয়ে দিয়ে সিঁড়ি দিয়ে ওঠা শুরু করেন। বোঝা যায়, তিনি উঠতে পারছেন না কিছুতেই। সেই অবস্থায় সিঁড়ির landing-এ পৌঁছেও যান, কিন্তু ধপাস করে পড়ে যান নীচে। এই যে পুরো situation-টা—এটা যে কী অদ্ভুতভাবে তৈরি করতেন তিনি! আমরা যারা অভিনয়শিক্ষার্থী তাদের এটা দেখে অভিনয় শেখা উচিত।

আরোহণ নাটকে অনেক ভালো অভিনেতা-অভিনেত্রীদের সঙ্গে অভিনয়ের সুযোগ পেয়েছিলাম। আর আমাদের সবার মাথার ওপরে ছিলেন সৌমিত্রদা। যে-কোনো অভিনেতার কাছে এই পরিমণ্ডলে অভিনয় করতে পারাটা খুব লোভনীয়।

আরোহণ-এর পর সৌমিত্রদা করলেন *হোমাপাখি* আর *আত্মকথা*। এই দুটো নাটকের শুরু থেকেই আমি যুক্ত ছিলাম—মহলা থেকে শুরু করে নাটক দেখা পর্যন্ত। কিন্তু এই দুটো নাটকে আমার অভিনয়ের সুযোগ ছিল না, যেহেতু দুটোতেই একটি করে পুরুষ চরিত্র এবং অবশ্যই সেই চরিত্রে অভিনয় করেন সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় স্বয়ং। তবু দর্শক হিসেবে *হোমাপাখি* এক অসাধারণ প্রযোজনা বলে আমার মনে হয়েছে। বয়স হয়ে গেলেও নিজেকে কীভাবে উদ্‌বুদ্ধ করতে হয় তা এই নাটক থেকে শিক্ষণীয়। জীবনের কখনও শেষ হয় না—প্রত্যেক প্রজন্ম পরবর্তী প্রজন্মের জন্য একটাকিছু রেখে যায়। আর এইভাবেই জীবন প্রবহমান থাকে অনন্তকাল ধরে। এই নাটক দেখে অনুপ্রাণিত হতে হয়। অন্যদিকে *আত্মকথা* একজন বিশিষ্ট মানুষের জীবনের নানা উত্থানপতনের লুকোছাপা আর দ্বন্দ্বের কাহিনি। *আত্মকথা*-য় সৌমিত্রদার অভিনয় দেখে আমাদের সবার শেখা উচিত।

আত্মকথা-র পর সৌমিত্রদা লিখলেন *তৃতীয় অঙ্ক, অতএব*। এটা একটা অদ্ভুত নাটক। সারা পৃথিবীর ইতিহাসেই এই ধরনের নাটক খুব কম লেখা হয়েছে। এই নাটকে একজন অভিনেতা নিজেরই চরিত্রে অভিনয় করছেন এবং নিজের জীবনের কথা বলছেন। শুধু তাই নয়, আরও দুজন অভিনেতা সেই মানুষটাই সেজে আসল মানুষটার পাশাপাশি অভিনয় করছেন। মঞ্চে আমরা original সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়কে দেখতে পাচ্ছি, একইসঙ্গে তার পাশে দুজন অভিনেতা সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় সেজেছেন। অথচ এক মুহূর্তও মানুষের বিরক্তি লাগবে না। এবং সবচেয়ে বড়ো কথা, এই নাটকটা আত্মজীবনীমূলক হলেও তিনি যে-সময়গুলো ছুঁয়ে ছুঁয়ে জীবনধারণ করেছেন সেই সময়গুলোকে এত সুন্দরভাবে ধরে গেছেন যে, এটা বিশেষ কোনো-একজন মানুষের আত্মজীবনী আর থাকে না, এটা একটা সময়ের ইতিহাস হয়ে ওঠে।

সৌমিত্রদার সঙ্গে অনেক দিন ধরে মেলামেশা করার ফলে তাঁর ভালোলাগা-মন্দলাগা, পছন্দ-অপছন্দ সম্পর্কে আমার একটা আবছা ধারণা তৈরি হয়েছে। সেই ধারণাটার সঙ্গে *তৃতীয় অঙ্ক, অতএব* নাটকের spirit-এও কোথাও একটা মিল আছে। তাঁর রসবোধ, অল্প ইঙ্গিতে একটা situation-কে যথাযথ বুঝিয়ে-দেওয়া, গুরুজনদের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা, অর্থাৎ

একজন স্বাভাবিক মানুষ যেমন হয়—তাঁর সেইসব গুণগুলো কীরকম করে যেন মেলামেশার ফলে বুঝতে পারতাম। ফলত, এই নাটকে সৌমিত্র সাজতে গিয়ে তেমন কোনো অসুবিধে যে face করেছি, সেটা বলব না। আর সৌমিত্রদার সঙ্গে অভিনয় করতে যে-কোনো সময়েই আমি স্বচ্ছন্দ বোধ করি, কোথাও একটা সুবিধে হয়। এই নাটকে একজন মহিলা সৌমিত্রও আছেন, যেটা তাঁর মেয়ে পৌলমী অভিনয় করেছে। আসলে সব মানুষের মধ্যেই দুটো সত্তা থাকে—একটা নারীসত্তা, আর একটা পুরুষসত্তা। সেটা একটা কারণ মহিলা অভিনেতা ব্যবহার করার, অর্থাৎ তাঁর চরিত্রের কোমল দিকটা প্রকাশ করার জন্য। তা ছাড়াও সৌমিত্র-র জীবনে যেসব মহিলা এসেছেন—বোন, স্ত্রী, কন্যা, ইত্যাদি—তাঁদের গল্পগুলোকে ভালোভাবে ফুটিয়ে তুলতে পৌলমী সাহায্য করেছে স্মৃতিচারণের সময়ে। এরকম একটা জায়গা আছে যেখানে দুর্ভিক্ষের সময়ে "ফ্যান দাও মা, ফ্যান দাও—" বলে আর্তনাদ করে কোনো মহিলা ভিক্ষা চাইছে। সেই ঘটনাটাও চমৎকারভাবে পৌলমীর চরিত্রটা ফুটিয়ে তুলতে পেরেছে। পৌলমী বা যেই এই চরিত্রটা ভবিষ্যতে করুন, এটা মহিলা চরিত্রই থাকবে—এমনভাবেই লেখা হয়েছে নাটকটা।

এখন তো *রাজা লিয়ার* নিয়ে সৌমিত্রদা খুব ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। এর পরের একটা খুব আকর্ষণীয় প্রযোজনার জন্যও নাটক লেখা হয়ে গেছে তাঁর। কিন্তু এই মুহূর্তে সেটা করা সম্ভব হচ্ছে না *রাজা লিয়ার*-এর জন্যই। সেটাতেও আমি সম্ভবত থাকব, যদিও সেটাও একান্তভাবেই নির্ভর করছে সৌমিত্রদার ওপর। নাটকটার কোনো নাম এখনও পর্যন্ত স্থির হয়েছে কি না তাও জানি না।

সৌমিত্রদার অধিকাংশ নাটকই অন্য ভাষার নাটকের বাংলা রূপান্তর (adaptation)। প্রথম থেকেই তিনি এই রূপান্তরের কাজটা করে এসেছেন। বাংলা নাটকের ক্ষেত্রে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের মতো রূপান্তর মাত্র দু-একজনই করতে পেরেছেন। বাংলা নাট্যসাহিত্যের ক্ষেত্রে এটা একটা অমূল্য সম্পদ বলেই আমার মনে হয়। এই ব্যাপারটা যথোচিতভাবে কোথাও আলোচিত হয় না, যদিও এটা আলোচনার দাবি রাখে। এমনকি এটা ভবিষ্যতে গবেষণারও বিষয় হতে পারে।

আমাদের দল সংস্তবে উনি কখনও অভিনয় করেননি। আর আমিও নিজে থেকে ডাকব না ওঁকে, কারণ ওঁর মতো অভিনেতাকে ব্যবহার করার জন্য একটা দলকে যোগ্য হয়ে উঠতে হয়; আর আমি মনে করি, সংস্তব সেই যোগ্যতা এখনও অর্জন করতে পারেনি।

সৌমিত্রদার নিজের যদি কখনও প্রয়োজন হয়, তাঁর নিজের যদি ইচ্ছে হয়, তবে অবশ্যই সংস্তব তাঁকে সাদরে গ্রহণ ও সহযোগিতা করবে।

সৌমিত্রদার যখন শরীর ঠিক ছিল, আমরা অনেক রাত পর্যন্ত আড্ডা মেরেছি। তারও পরে ওঁর আসল পড়াশুনা শুরু হত—লেখালেখি করতেন অনেক রাত পর্যন্ত জেগে। কিন্তু খুব ভোরে উঠেই উনি exercise, ব্যায়াম, হাঁটাহাটি করতেন। এখনও যতটুকু সম্ভব শরীরচর্চা করেন। তাঁর শরীরে এখন যতটা permit করে, সেইমতো হাঁটাচলা করার চেষ্টা করেন। তাঁর স্বাস্থ্যবান থাকার জন্য যেটুকু দরকার, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় সবটাই করেন। সারাদিনের এত পরিশ্রমের পরেও রাত জেগে কবিতা লেখেন তিনি। এর কারণ তাঁর অদ্ভুত প্রাণশক্তি। অনেক মানুষই বাঁচতে ভালোবাসে, কিন্তু সেই ভালোবাসাটা এইভাবে জীবন দিয়ে প্রকাশ করতে আমি খুব কম মানুষকেই দেখেছি। তাঁর এতটাই জীবনীশক্তি যে, এই বয়সে অসুস্থ শরীরেও তিনি যতটা পরিশ্রম করেন সেটা আমিও করতে পারি না।

শুধু নাট্যব্যক্তিত্ব সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ই নন, মানুষ সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ও আমার কাছে খুব বড়ো। এতদিন তাঁর কাছাকাছি থাকার কারণেই সৌমিত্রদার এই মানবিক বা ব্যক্তিগত দিকটা দেখার সুযোগ আমার হয়েছে। তিনি মানুষ হিসেবে কত বড়ো তার প্রমাণ আমি বারবার অনেকভাবে পেয়েছি। এই প্রসঙ্গে দু-একটা সাম্প্রতিক ঘটনা আমার এক্ষুনি মনে পড়ছে।

নিজে গাড়ি চালাতে খুব ভালোবাসেন সৌমিত্রদা। কিন্তু তাঁর অসুস্থতার পর থেকে তাঁকে গাড়ি চালানো বন্ধ করে দিতে হয়েছে। এমনিতেও এই পঁচাত্তর-ছিয়াত্তর বছর বয়সে গাড়ি চালানোর ক্ষেত্রে বোধহয় আইনগত বাধাটাধাও আছে। অথচ পিছনের সিটে বসে পা রাখতেও তাঁর বেশ কষ্ট হয়। তাই ড্রাইভারের পাশের সিটটাই তাঁর জন্য বরাদ্দ থাকে। নাটকের মহলার সময়ে কখনও সৌমিত্রদার গাড়িতে গেলে আমি পিছনের সিটেই বসতাম। কিন্তু আমার ইদানীং পায়ে একটা ভয়ংকর যন্ত্রণা শুরু হয়েছে, ঠিকমতো হাঁটতেও পারি না। সৌমিত্রদা সেটা জানার পর থেকে কিন্তু কিছুতেই আমাকে পিছনের সিটে বসতে দেন না। নিজের অসুস্থতা সত্ত্বেও আমাকে বললেন, "পিছনে বসলে তোমার কষ্ট হবে। তুমি সামনে বোসো।" শত অনিচ্ছা সত্ত্বেও সেদিন তাঁর কথার অবাধ্য হতে পারিনি। সে-সাধ্যও আমার নেই।

আমার এই পায়ের ব্যথা নিয়েই আর-একটা ঘটনা মনে পড়ে যাচ্ছে। সেদিন মহলার শেষে সৌমিত্রদা বললেন, "চলো দ্বিজেন, তোমার বাড়িতে বসে একসঙ্গে খেলা দেখব।"

ফুটবলের বিশ্বকাপ চলছে তখন। সৌমিত্রদা তো খুবই খেলাপাগল; তাই বলে আমার বাড়িতে! এদিকে তো চারতলার ওপরে আমাদের ফ্ল্যাট; কোনো লিফ্‌টও নেই। উনি সিঁড়ি ভেঙেই ওপরে উঠলেন। কিন্তু যেটা আমাকে আরও অবাক করল সেটা হল, আমার উঠতে কষ্ট হবে বলে আমার ভারী ব্যাগটা নিজের হাতে করে বহন করে আমার ঘর পর্যন্ত টানলেন! আমার কোনো কথা তো শুনলেনই না, উলটে ধমক দিলেন। আমি লজ্জিত, হতবাক।

আমি মনেপ্রাণে কামনা করি, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় যেন জীবনের অন্তিম মুহূর্ত পর্যন্ত মঞ্চ দাপিয়ে কাজ করে যেতে পারেন। আর আমার সুপ্ত বাসনা, সেই মুহূর্তে আমিও যেন তাঁর পাশে থেকে অভিনয় করতে পারি। খুব নিষ্ঠুর শোনাল কি? তাহলে উলটো করে বলি—আমার জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত যেন সৌমিত্রদার সঙ্গে আমি কাজ করে যেতে পারি। অভিনেতা হিসেবে এর চেয়ে বেশি আর কীই বা চাইতে পারি আমি?

আলাপচারিতা, রেকর্ডিং ও অনুলিখন: অনির্বাণ দে

স্মৃতিরঙ্গে সৌমিত্র

শ্যামল ঘোষ

সেভাবে বলতে গেলে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে আমার প্রথম আলাপ হয়েছিল একটা সিনেমার শুটিং করতে এসে। বিদগ্ধ শিল্পরসিক ও চলচ্চিত্রসমালোচক চিদানন্দ দাশগুপ্ত (যিনি এককালে সত্যজিৎ রায় ও হরিসাধন দাশগুপ্ত-র সঙ্গে মিলে এ-রাজ্যে ফিল্ম সোসাইটি আন্দোলনের সূত্রপাত করেছিলেন) তখন 'ষাঁড়', 'গাধা' আর 'রক্ত' নামের তিনটি স্বরচিত ছোটোগল্প নিয়ে ফরাসি মেজাজের একখানা কমেডি ছবি বানাবেন ঠিক করে ফেললেন। ছবির নাম দিলেন *বিলেতফেরত*। তাঁর তিন গল্পের তিন নায়কই আসলে ইউরোপ-ফেরত তিন শিক্ষিত যুবক। সেই ভূমিকাগুলির রূপায়ণে নির্বাচিত ছিলেন যথাক্রমে নির্মলকুমার, অনিল চট্টোপাধ্যায় এবং সৌমিত্র। এর মধ্যে 'রক্ত' গল্পটি আবার ছিল ছবির আধখানা জুড়ে। সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় তারই নায়ক।

যে-সময়ের গল্প, এ-দেশে তখনও বিলেতফেরতা ছেলেদের বাজারদর বেশ চড়া ছিল। তার কিছুকাল আগে দেশ স্বাধীন হলেও কিছুকিছু বিদেশি তখনও কিন্তু এদেশের ব্যাবসাবাণিজ্যের সঙ্গে বেশ জড়িয়ে ছিলেন। অফিসকাছারিতে তখনও পুরোপুরি মুছে যায়নি ব্রিটিশ কেতা। তাদের চলনবলনের নকলনবিশিয়ানা তখনও উপরমহলের সামাজিক জীবনে বেশ সম্ভ্রম জাগায়। এমনই এক সাহেবভক্ত ধনাঢ্য পরিবারের ছেলে সৌমিত্র। জানা গেল, বিলেতের পড়াশুনোর পাট চুকিয়ে বাড়ি ফিরছেন। খবর পেয়ে ইস্তক ইংরেজভক্ত বাবা এতকাল-সাহেবি-জীবনে-অভ্যস্ত ছেলের জন্য বাড়িঘরদোরের আমূল সংস্কারে ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। সাবেকি বাড়িটাকে সাহেবসুবোর বাসযোগ্য করে তোলার জন্যে তিনি আর তাঁর একমাত্র কন্যা (অপর্ণা সেন) তখন হিমশিম।

যথাকালে ছেলে ঘরে ফিরল। বাবা দেখলেন, এতদিন বিলেতে বসবাস করেও তার ছেলের উপর সাহেবিয়ানার কোনো ছাপই পড়েনি! বড়ো হতাশ হলেন তিনি। শুধু তাই নয়, সে নাকি তাঁর গুছিয়ে-রাখা বিলিতি কোম্পানির জাঁকালো চাকরিটিও করবে না বলছে। শিক্ষকতা করবে গাঁয়ের ইস্কুলে। সদ্যস্বাধীন দেশের শিশুদের জন্যে এখন নাকি প্রাথমিক শিক্ষা খুব জরুরি। একজন দায়বদ্ধ নাগরিক হিসেবে সেই কর্তব্য অস্বীকার করতে পারে না সে।

নির্বোধ আর কাকে বলে! তবে ভরসা এই যে, দুনিয়ার সবাই তো আর পাগল নয় তার মতো! বেতন যাই হোক, অতিরিক্ত যোগ্যতার জন্যেই একজন বিলেতফেরত ইঞ্জিনিয়ারকে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে চাকরি দিতে রাজি হলেন না কেউ; ফলে প্রথম মিশনটি

বরবাদ হল তার। দ্বিতীয় পর্ব শুরু হল আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র-র আদর্শ মেনে তার স্বাধীন ব্যাবসা দিয়ে। কিন্তু অনভিজ্ঞ মানুষের যা পরিণতি হয়—পরিস্থিতির শিকার হয়ে শেষপর্যন্ত হাস্যকর সব বিপর্যয়ে বিধ্বস্ত হয়ে মানুষটিকে বাবার-দেওয়া চাকরিতেই অবশেষে বহাল হয়ে আত্মরক্ষা করতে হল। কৃষ্ণকৌতুকের ঢংয়ে লেখা গল্প।

ছবিতে আমার ভূমিকাটি ছিল সৌমিত্র-র সহপাঠী অন্তরঙ্গ বন্ধুর। নিম্নবিত্ত ঘরের ছেলে। কলেজ পাস করে কলকাতার মেসে থেকে সামান্য চাকরি করে। মাঝেমধ্যে পদ্যটদ্য লিখলেও বেশ কাণ্ডজ্ঞানসম্পন্ন যুবক। অনেক দিক দিয়েই যেন সৌমিত্র-র উলটোপিঠ—কী স্বভাবে, কী আবেগে, কী অর্থকৌলীন্যে, আর কী রূপলাবণ্যে। তবু সৌমিত্র-র আত্মগোপনকারী জীবনসংগ্রামের ছন্নছাড়া পর্বটিতে এই বন্ধুর পরামর্শ আর তার মেসের ঘরখানিই ছিল তার কাছে একমাত্র ওয়েসিস।

আমি থিয়েটার-করা মানুষ। তাও আবার বাজারদরশূন্য গ্রুপ থিয়েটার। তা ছাড়া সিনেমা করার অভিজ্ঞতা বলতে তার আগে পূর্ণেন্দু পত্রীর *স্ত্রীর পত্র* ছবিতে একটা চরিত্র করেছি। সেটি ছিল নায়িকাপ্রধান ছবি। কাজ করতে গিয়ে নায়িকা মাধবীর সঙ্গে বেশ বন্ধুতা হয়ে গিয়েছিল, তাই সমস্যা হয়নি তেমন। যদিও কাজ করতে গিয়ে বুঝেছিলাম, সিনেমায় অভিনয়ের কৌশল থিয়েটারের চেয়ে বেশ আলাদা রকমের। সেটি একটি স্বতন্ত্র বিদ্যে। সেখানে আমার মতো অনপড় অভিনেতাকে খ্যাতিমান সৌমিত্র কীভাবে নেবেন তা ভেবে কিছু শঙ্কা ছিল মনে। তবু আত্মবিশ্বাসে ভর করে হাজির হয়েছিলাম প্রথম দিনের সেটে।

পরিচয় করিয়ে দিলেন চিদানন্দবাবু। সৌমিত্র বললেন, "চিনি তো! সরাসরি আলাপ নেই ঠিকই, তবে একসময় ওঁদের *গন্ধর্ব* পত্রিকা নিয়মিত পড়তাম। আমাদের *এক্ষণ* পত্রিকার মলাট ছাপা হয় ওঁদের প্রেস থেকে। আমি ওঁর থিয়েটারও দেখেছি। ভালোই হল।"

এমন অন্তরঙ্গ আচরণে মুহূর্তেই স্বচ্ছন্দ হয়ে উঠলাম আমি। ওঁর সঙ্গে আমার ভূমিকাটিও তখন আর আড়ষ্ট রইল না আমার কাছে। মধ্যাহ্নপর্ব পর্যন্ত কাজ করতে করতে কখন যে সত্যিসত্যি ওঁর এত ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠলাম, বুঝতে পারিনি।

শুটিংয়ের শেষে সৌমিত্র বললেন, "চলুন-না আমার বাড়ি, বন্ধুতা আরও একটু পাকা করে নিই। কাজ নেই তো এখন?"

সত্যিই কাজ ছিল না। গেলাম। সৌমিত্র তখন লেক টেরেসের একটা ফ্ল্যাটে থাকেন। আগে তাতে থাকতেন সত্যজিৎ রায়। শুনেছি তিনি বিশপ লেফ্রয় রোডে উঠে যাবার আগে ওঁকে দিয়ে যান।

ফ্ল্যাটটিতে ঢুকতে গিয়ে একটা পুরোনো স্মৃতি ভেসে এল। অনেকদিন আগের কথা। তখন সত্যজিৎ রায় এখানে থাকেন। তখন একবার এসেছিলাম ওঁর কাছে সিনেম্যাটোগ্রাফি

শেখার আবেদন নিয়ে। মানিকদা তখন *জলসাঘর* আর *পরশপাথর* ছবিদুটি একসঙ্গেই করছেন। আর তাও প্রায় শেষের মুখে। তাঁর পরবর্তী পরিকল্পনা ছিল *অপুর সংসার*। বলেছিলেন, সেই ছবিতে আমাকে শিক্ষার্থী হিসেবে নেবেন। যোগাযোগের তারিখ আর সময়ও বলে দিয়েছিলেন। কিন্তু আমার অবিমৃশ্যকারিতায় সে-কাজ শেষপর্যন্ত করা হয়নি আমার। নইলে হয়তো-বা একই ছবিতে শুরু হত আমার আর সৌমিত্র-র চলচ্চিত্রযাত্রা।

বেশ কিছুক্ষণ জমিয়ে আড্ডা হল সেদিন। যথেষ্ট আপ্যায়ন করলেন ওঁর স্ত্রী দীপা। তিনি তখন স্বনামধন্যা একজন ব্যাডমিন্টন-তারকা। কথায়-কথায় বেরিয়ে পড়ল, দীপা আর আমার স্ত্রী রমা দুজনেই স্কটিশ চার্চ কলেজের একই সময়ের ছাত্রী। তবে রমার চেয়ে দীপা সম্ভবত বছর দুয়েকের সিনিয়ার দিদি।

সৌমিত্র-র অন্তরঙ্গতায় সেদিন মুগ্ধ হয়েছিলাম। সদ্যপরিচিত একজন জুনিয়ার শিল্পীর সঙ্গে তাঁর আচরণ আমাকে বুঝিয়েছিল, তিনি শুধু বড়োমাপের অভিনেতাই নন, তিনি একজন বড়ো মনের সফল মানুষ। আমাদের সেই বন্ধুতা এমনই পোক্ত হয়েছিল সেদিন যে, তা আজও আমাদের মধ্যে অনবচ্ছিন্ন রয়ে গেছে।

বিলেতফেরত-এর পরে সৌমিত্র-র সঙ্গে আমার আর চলচ্চিত্রে অভিনয় করবার সুযোগ হয়নি। বস্তুত সিনেমাতে অভিনয় করাই আর তেমন করে হয়ে ওঠেনি আমার। আরও পাঁচ-সাতখানা ছবিতে করেছি বটে, তবে তা তেমন ঘটাপটা করে বলার মতো নয়। কিন্তু ওঁর সঙ্গে *বিলেতফেরত*-এ কাজ করতে করতে লক্ষ করছিলাম, শুধু রোমান্টিক চরিত্রেই নয়, কমেডি চরিত্রাভিনয়েও সৌমিত্র কেমন স্বচ্ছন্দ আর অনায়াস। ক্রমান্বয়ে অবাক হতে হতে আমি ক্রমশ ওঁর গুণমুগ্ধ হয়ে পড়ছিলাম। আর সে-মুগ্ধতা যত দিন যাচ্ছে ততই বাড়ছে উত্তরোত্তর। শিল্পী হিসেবে তাঁর দ্রুত ক্রমোন্নতি আমাকে স্তম্ভিত করছে।

সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, আমার মতে, শুধুমাত্র চলচ্চিত্রের এক নিপুণ কলাকারই নন। লক্ষ করছিলাম, ধারাবতী যেমন তুষারমৌলি থেকে নির্ঝরিত হয়ে মাটির পৃথিবীতে সহস্রধারায় খুঁজে নেয় তার মুক্তির দিশা, সেইভাবেই যেন তিনি দিনে-দিনে নিজেকে ছড়িয়ে দিচ্ছিলেন শিল্পকলার পথেপ্রান্তরে। নানান বিভঙ্গে নিজেকে গড়ে তুলছিলেন বহুবিধ শিল্পমাধ্যমের এক জাদুকরি প্রতিভার অধিকারী হিসেবে। নিরলস সাধনায় ক্রমে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করছিলেন একাধারে যেমন চলচ্চিত্রের বিদগ্ধ নট, তেমনি অধুনালুপ্ত সাধারণ রঙ্গালয়ের এক ধীমান ঋত্বিক হিসেবে। সাহিত্যের সরসীতে তাঁর পরিক্রমা ক্রমে হয়ে উঠছিল জলচর প্রাণীর মতোই স্বচ্ছন্দ। কবিতারচনা আর রেখাঙ্কনে পাল্লা দিয়ে ছুটতে লাগল তাঁর অশ্বমেধের ঘোড়া। তাঁর সমকালের কবিগোষ্ঠী আর নাটককারদের মধ্যে তাঁর শক্তি ক্রমান্বয়ে তাচ্ছিল্য করবার অনুপযুক্ত হয়ে উঠছিল। তা ছাড়া ছেলেবেলা থেকেই তাঁর গানের গলাটিও যেহেতু ছিল সহজাত,

একান্ত চর্চায় সংগীতকে তাই ক্রমে এমন পর্যায়ে নিয়ে যেতে লাগলেন যে, তাঁর প্রযোজিত নাট্যে আবহসংগীতগুলো স্বতন্ত্র মর্যাদা এনে দিল।

শিক্ষিত বনেদি বাঙালি পরিবারের সন্তান হয়ে অভিনয়কে জীবিকা হিসেবে গড়ে তোলার দুঃসাহস কেমনভাবে সৌমিত্র-র মধ্যে সঞ্চারিত হয়েছিল সে-রহস্য আমার অজানা। যে-সময়ের জাতক তিনি, তাতে যৌবনের সন্ধিক্ষণে অভিনয়ের প্রতি শৌখিন মোহ থাকা অস্বাভাবিক না-হলেও পেশাদার নট হয়ে-ওঠার ভাবনাকে প্রশ্রয় দিত না পরিবার। অন্তত আমাদের দেশের আর্থসামাজিক চিন্তা ছিল সেইসব দুঃসাহসের পরিপন্থী। কিন্তু এখানে বেশকিছু ব্যতিক্রমী ঘটনাই ঘটল। পরিবার থেকে তেমন প্রতিরোধ এল না। হয়তো-বা সেই আবেগে বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠও অসম্পূর্ণ রয়ে গেল তাঁর। এইসব চোখধাঁধানো পথের আকর্ষণ দুর্নিবার হলেও এসব ক্ষেত্রে সঠিক পথনির্দেশ পাওয়া দুর্লভ। কিন্তু তাঁর সৌভাগ্য, নটজীবনের সূত্রপাতেই দুই অসামান্য মালাকারের হাতের ছোঁয়ায় তাঁর যৌবনের মাটি ক্রমে সরস হয়ে উঠছিল। আর তাতেই ঘটল এই বিবর্তন। সেই দুই শিল্পকারিগর হলেন নাট্যাচার্য শিশিরকুমার ভাদুড়ী আর দিক্‌পাল চলচ্চিত্রকার সত্যজিৎ রায়।

জন্মসূত্রে সুকণ্ঠের অধিকারী ও সুদর্শন হওয়ায় সৌমিত্র-র নটজীবনের প্রাথমিক সাফল্য হয়তো সহজে এসেছিল। কিন্তু নিজস্ব প্রতিভা না-থাকলে তা যে বুদ্‌বুদের মতো মিলিয়ে যেত তাতেও সন্দেহ নেই। তা ছাড়া প্রতিভা যেহেতু অনুশীলনসাপেক্ষ, তাই পরিশ্রমী মানসিকতা না-থাকলে তা গড্ডলে ভেসে যায়। কিন্তু আশ্চর্য, প্রথম থেকেই তাঁর ভিতরে সচেতনতা ও আত্মপ্রত্যয় এমনভাবে দিয়েছিলেন ওই দুই মনীষী কারিগর যে, সঠিক পথেই তাঁর শোভন ও স্বাভাবিক বৃদ্ধি ঘটেছিল বলেই আমার বিশ্বাস।

ছাত্রজীবনের শেষ পাদে পৌঁছে সৌমিত্রর সঙ্গে আশ্চর্যভাবে সংযোগ ঘটে গেল শিশিরকুমারের। দেনার দায়ে নাট্যাচার্যের শ্রীরঙ্গম থিয়েটার তখন পরহস্তগত। ভূমিহীন কৃষকের মতো এখানে-ওখানে মুজরোখাটার মতন অভিনয় করছেন। শৌখিন কোনো নাট্যদল আমন্ত্রণ জানালে এবং তাঁর পছন্দসই ও অনুমোদিত নাটক হলে নির্দেশনা আর অভিনয়ের দায়িত্ব নিয়ে করে আসতেন মাঝেমধ্যে। বাকি সময় নিরবচ্ছিন্ন অবসর। বরানগরের বাড়িতে বই পড়ে তাঁর দিন কাটে নিঃসঙ্গ। এমন সময়ে গ্রন্থজগৎ-এর স্বত্বাধিকারী দেবকুমার বসু সেই নির্জন বৈরাগীকে টেনে আনলেন কলেজ স্ট্রিট পাড়ায়। তাঁর দোকানের পিছনদিকে লাগোয়া একখানা বড়োসড়ো ঘর ছিল বই মজুত করার জন্যে। সেটাই সাফসুতরো করে সন্ধের পর সেখানেই বসিয়ে দিলেন নাট্যাচার্যকে নিয়ে সান্ধ্য আড্ডা। আপাতবিষণ্ণ বিদগ্ধ মানুষটি এতক্ষণে যেন কথা বলে বাঁচলেন।

শিশিরকুমার যেখানে মজলিশের মধ্যমণি, সেখানে তাঁর পার্ষদবর্গ যে রুচিমান রসিকজন

হবেন তাতে আর আশ্চর্য কী? রবীন্দ্রবিশেষজ্ঞ ডাক্তার রাম অধিকারী, বিনয়কৃষ্ণ দত্ত, কবি রাম বসু, এমনি আরও কত! মুখে-মুখে খবর পেয়ে আসর জমতে শুরু করল। অনেকদিন পরে সেই প্রাক্তন অধ্যাপক শিশিরকুমার, সুরসিক রচনাপটু প্রাজ্ঞ শিশিরকুমার, নাট্যজগতের একদা যুগনায়ক শিশিরকুমার নিজেকে মেলে ধরলেন সেই নাট্যপ্রিয় ভক্তজনের আসরে। দিনে-দিনে মানুষের ভিড় বাড়তে দেখে একদিন বললেন, "এভাবে গালগল্পে দিন কাটিয়ে লাভ কী? এখনও যে আমি কিছু শেখাতে পারি তা বিশ্বাস করতে পার। কিছু টাকাপয়সা জোগাড় করতে পারলে খেটেখুটে একটা নাটক মঞ্চস্থ করা যেতে পারে।"

"কী নাটক হবে?"—আগ্রহী প্রশ্ন সকলের।

"*মালিনী*। রবীন্দ্রনাথ দিয়েই শুরু করা যাক?"

নিয়মিত না-হলেও ছেলেছোকরার দঙ্গলে তখন মাঝেমধ্যেই দেখা যেত করুণা বন্দ্যোপাধ্যায়, মমতাজ আহমেদ খান, অনিল মুখোপাধ্যায়, শমীক বন্দ্যোপাধ্যায়, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় এবং আরও কাউকে-কাউকে।

একদিন পড়া হল *মালিনী*। নাটক কেমন করে পাঠ করতে হয়, মুগ্ধ হয়ে শুনলেন সকলে। সে এক অশ্রুতপূর্ব অভিজ্ঞতা। পরেপরেই চলল নাটক নিয়ে পর্যালোচনা। নাটকের ইতিহাস, কাল, ধর্মসংকট, দর্শন—সবকিছু নিয়ে আনুপূর্বিক আলোচনা করলেন শিক্ষক শিশিরকুমার। বিশ্লেষণ করলেন চরিত্রাবলি। অনবদ্য সেই বিশ্লেষণ! তন্ময় হয়ে শোনেন সকলে।

এইভাবে চলতে চলতে একদিন শুরু হল মহলা। প্রাথমিক নির্বাচনে মালিনী করুণা বন্দ্যোপাধ্যায় আর সুপ্রিয় সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়।

অনেকদিন ধরেই চলল সেই মহলা। কিন্তু অর্থের অভাবে শেষপর্যন্ত আর মঞ্চস্থ হল না নাটক। কিন্তু এই পর্বে নাট্যবিষয়ক যে-রসদ সংগ্রহ করা গেল তা আজীবনের সঞ্চয় হয়ে রইল সৌমিত্র-র ভাঁড়ারে। বলা যায়, তাঁর তূণীর পূর্ণ রইল গুরুদত্ত অলৌকিক শায়কসম্ভারে।

তারপরে এল সত্যজিৎ রায়ের পর্বকাল। মুক্তি পেল *অপুর সংসার*। প্রথম ছবিতেই আসর মাত। নতুন শক্তিমান নায়ক পেয়ে চলচ্চিত্রজগৎ ঋদ্ধ হল। বুকের ভিতরে শিশিরকুমার আর মাথার উপরে সত্যজিৎ রায়—এই দুই যুগন্ধর দিক্‌পালের দীক্ষা আর শিক্ষা নিয়ে অতঃপর পথচলা শুরু হল সৌমিত্র-র। আর সেই চলা আজও তেমনি অব্যাহত, তেমনি দুরন্ত গতিশীল।

সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের চলচ্চিত্রজীবন নিয়ে এখানে আর আলোচনার কোনো মানে হয় না। এখন দুনিয়ার লোকই জানেন দেশবিদেশের ছবির উৎসবে ওঁর অভিনীত কত ছবি সেরা চলচ্চিত্রের শিরোপা পেয়েছে। পাবে না-ই বা কেন? আন্তর্জাতিক-খ্যাতিমান পরিচালক

সত্যজিৎ রায়ের স্নেহধন্য নায়ক তিনি। তাঁকে ঠেকায় কে? বরং তাঁর থিয়েটার নিয়ে দু-চার কথা বলা এখানে অপ্রাসঙ্গিক হবে না মনে হয়।

নাট্যাচার্য শিশিরকুমারের কাছেই যে তাঁর নাট্যশিক্ষার হাতেখড়ি হয়েছিল সেসব তো আগেই বলেছি। তবে তাঁর কাছে নাড়া বাঁধলে কী হবে, তা নিয়ে হাতেকলমে পরীক্ষার সুযোগ তো ঘটল না! তার আগেই সিনেমার হ্যাঁচকা টানে তাঁকে ছিটকে যেতে হল মঞ্চনাট্যের চৌহদ্দি থেকে। তবে সেসব কাজেও গুরুর উপদেশামৃত স্মরণীয় ছিল প্রতিমুহূর্তে। তবে তাঁর খ্যাতির অন্যতম উৎস যে-মঞ্চাভিনয়, তার সুযোগ এল বেশ কিছুটা পরে।

যে-সময়ের কথা বলছি, কলকাতায় তখনও রমরমিয়ে চলছে চারটে পেশাদার থিয়েটার। স্টার, রঙমহল, মিনার্ভা আর বিশ্বরূপা। শেষেরটি অবশ্য শিশিরকুমারের শ্রীরঙ্গমের নাম বদলে হয়েছে। ওদিকে স্টার থিয়েটারে একটানা প্রায় পনেরো বছর ধরে মঞ্চশাসন করে নট-নাট্যকার-নির্দেশক মহেন্দ্র গুপ্ত আকস্মিকভাবে গদিচ্যুত হলেন। স্বত্বাধিকারী সলিল মিত্র মশাই তখন স্টার থিয়েটারের আদ্যন্ত সংস্কারে মন দিলেন। স্থির মঞ্চ ভেঙে তা ঘূর্ণায়মান হল, ঝুলন্ত পাখা উঠে গিয়ে বসল শীতাতপনিয়ন্ত্রণের যন্ত্র, প্রেক্ষাঘর সেজে উঠল কেতাদুরস্ত সাজে। ঐতিহাসিক আর পৌরাণিক নাটকের জবরজং তল্পি গুটিয়ে নিয়ে এলেন পারিবারিক-সামাজিক নাটকের বদল। দেবনারায়ণ গুপ্ত-র নাট্যরূপে নিরুপমা দেবীর উপন্যাস *শ্যামলী*। চিরাচরিত মঞ্চাভিনেতা নয়, নায়ক হিসেবে এলেন চলচ্চিত্রের মনভোলানো শিল্পী উত্তমকুমার, আর নায়িকা সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়। সেটা ছিল ১৯৫৩ সালের কথা।

সলিল মিত্র-র এই পরিকল্পনা সর্বার্থে সফল হল। ৪৮৪ রাত ধরে একটানা অভিনীত হয়ে সে-সময়ের সর্বকালীন রেকর্ড তৈরি করল *শ্যামলী*। আর তার পর থেকেই পেশাদার থিয়েটারে শুরু হল চলচ্চিত্রশিল্পীদের নায়কনায়িকা বানিয়ে নাট্যপ্রযোজনা। আর সেই পথ ধরেই ১৯৬৩-তে *তাপসী* নাটকে নিয়ে আসা হল নবীন নায়ক সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়কে। সঙ্গে এলেন অভিনেত্রী মঞ্জু দে। এ-নাটকও চলেছিল ৪৬৭ রাত। তবে এই ছকে-বাঁধা থিয়েটার ভালো লাগল না সৌমিত্র-র। গুরুর কাছে যে-শিক্ষা পেয়েছেন তার সঙ্গে এর মিল কোথায়? বাণিজ্যিক থিয়েটারের মানেই কি সাবেকি কায়দার পৌনঃপুনিকতা?

চলচ্চিত্রাভিনেতা সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়কে নাটকের দর্শক এই প্রথম মঞ্চাভিনেতা হিসেবে আবিষ্কার করলেন। দেখলেন, সুদর্শন এই নায়কের অভিনয় স্বাভাবিক, স্বচ্ছন্দ ও বুদ্ধিদীপ্ত। সেই আকর্ষণে এ-নাটকও তো চলেছিল ৪৬৭ রাত। নবীন এই চিত্রতারকাকে মঞ্চের রসিক দর্শক কিন্তু স্বতঃস্ফূর্ত অভিনন্দন জানিয়েছিলেন সেদিন।

তাপসী বিপুল বাণিজ্যিক সাফল্য পেলেও মন ভরল না সৌমিত্র-র। এমন থিয়েটার তাঁর কাম্য নয়। গুরুরকাছে-শেখা বিদ্যে এইসব সাবেকি কায়দার পৌনঃপুনিকতার মধ্যে ফুটিয়ে তোলা সম্ভব নয়। তার জন্যে চাই থিয়েটারের জাতবদল। শিশিরকুমারের শিক্ষা

নিয়ে একদা শম্ভু মিত্র তাঁর থিয়েটারে কিন্তু এক ধরনের বদল ঘটিয়েছিলেন, যদিও সেটা তাঁর পেশাদার থিয়েটার ছিল না। কিন্তু পেশাদার হতে গেলেই কি এমন গতানুগতিকতার বাধ্যতা মানতে হবে?

এমনি অস্বস্তি বুকের ভিতর নিয়ে গুমরে গুমরে দিন কাটে সৌমিত্র-র। চলচ্চিত্রের তাড়নায় থিয়েটারের অবকাশ আর মেলে না। নিরুপায় জীবন। শুধুমাত্র অভিনয়ই যার জীবিকা, এ-বিড়ম্বনা তার ললাটলিখন। তবে কথায় বলে, ইচ্ছে থাকলেই উপায় হয়। তা পরিস্থিতি সামলে সে-ইচ্ছেটাকে পোক্ত করে তুলতেই তো কেটে গেল পনেরোটা বছর! তারপর কায়ক্লেশে সেই ইচ্ছের নৌকাটাকে একদিন এনে বাঁধা গেল থিয়েটারের ঘাটলায়। ১৯৭৮ সালের ২১ ডিসেম্বর কাশী বিশ্বনাথ মঞ্চে নামল তাঁর প্রথম নিজস্ব থিয়েটার প্রযোজনা—*নাম জীবন*। এতদিনের প্রতিবন্ধকতা এবার যেন মুক্তির আকাশ হয়ে এল তাঁর জীবনে। নাটক-নির্দেশনা-সংগীত ও প্রধান ভূমিকায় আত্মপ্রকাশ করলেন সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়। নাট্যদর্শকের সামনে প্রথম আবির্ভাবেই আসরমাত।

সাধারণ রঙ্গালয়ের সীমাবদ্ধতা বিস্তর। একদিকে যেমন মঞ্চব্যবসায়ীর মুনাফার প্রশ্ন, অন্যধারে তেমনি পেশাদার থিয়েটারকর্মীদের জীবনধারণের সমস্যা। দাঁড়িপাল্লার দুই দিক সমান রেখে থিয়েটারকে সৃজনশীল করে বাঁচিয়ে রাখার দায়ভার থেকে মহাকবি গিরিশচন্দ্র কী নাট্যাচার্য শিশিরকুমার কেউই রেহাই পাননি। স্বপ্ন ও সাধনার সঙ্গে জীবনযাপনের নির্মম টানাপোড়েনের মধ্যে জীবন কাটিয়ে গেছেন তাঁরা। শিল্পীর বিধিলিপি খণ্ডাবে কে?

পেশাদার থিয়েটারের এই দায়ভার মেনে নিয়েই পথ চলতে হয়। চলতে হবে সৌমিত্রকেও। তাতে কোনো আপত্তি নেই তাঁর। ফসল ফলাতে গেলে হাল-বলদ-বীজ-জল কাউকেই যেমন বাদ দেওয়া না, শিল্পের ভূমি কি তার চেয়ে আলাদা হবে? সেখানেও তো তাকে বাঁচিয়ে রাখা চাই সযত্নে। না-পারলে কেমন সর্দার চাষি তুমি?

এই তো দ্যাখো, দিক্‌পাল নাটককার হয়েও তো নটগুরু গিরিশচন্দ্রকে বেশিরভাগই অনুৎকৃষ্ট নাটক লিখতে হয়েছে? সে তো শুধু থিয়েটারের মানুষকে বাঁচাবার জন্যেই! দর্শকের করতালিতেই যে থিয়েটারের পরমায়ু। তাঁদের কথা ভুলে গিয়ে তো আর সাধারণ রঙ্গালয় চালানো যাবে না! নইলে *রক্তকরবী* আর *বাঁশরি*-র মতো দুখানা অবিস্মরণীয় নাটক কবিগুরু নিজের হাতে তাঁর প্রিয় প্রয়োগকর্তার হাতে তুলে দিলেও মঞ্চের ওই শীর্ণ মানুষগুলোর কথা ভেবেই তো তা মঞ্চস্থ করতে পারেননি নাট্যাচার্য শিশিরকুমার (যাঁদের কেউ একদা অতিসংক্ষোভে থিয়েটারের দেয়ালে বড়ো-বড়ো করে লিখে রেখেছিলেন: 'টোয়েন্টি ইয়ার্স সার্ভিস, টোয়েন্টি রুপিজ স্যালারি')। এ-যন্ত্রণা তাঁকে বিদ্ধ প্রজাপতির মতন করতে হয়েছে আমরণ। *রক্তকরবী* না-করতে পারার ব্যথা আর বঞ্চিত শিফ্‌টারের দুঃখ একাকার হয়ে গেছে।

এ কথা ঠিক, থিয়েটারের মানুষজনকে বাঁচিয়ে রাখার দায়বদ্ধতা যেমন সাধারণ রঙ্গালয়ের রয়েছে, তেমনি দর্শকের রুচিকে উন্নত করার, সমৃদ্ধ করার দায়িত্বও কিন্তু তার উপরে বর্তায়। "একটা থিয়েটার তার দেশকে চেনায়, তার জাতিকে চেনায়।"—এই প্রবচন তো মিথ্যে নয়। সে-কথা শিশিরকুমার মানতেন বলেই বারবার রবীন্দ্রনাথে আশ্রয় নিতে চেয়েছেন। তাতে নিজে আর্থিক ঋণগ্রস্ত হয়ে সুরসিক দর্শককুলকে ঋণী করে গেছেন আজীবন। মুনাফার কথা আড়ালে রেখে থিয়েটারের কর্মীদের বাঁচানোর দোহাই দিয়ে পরবর্তীকালের মতো থিয়েটারে ক্যাবারে কী বস্ত্রবিপ্লব আমদানি করে থিয়েটারকে কালোয়ারি গোত্রে নামিয়ে এনে জাত খোয়াতে দেননি তিনি।

সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় দীক্ষিত ছিলেন নাট্যাচার্যের সেই ঘরানায়। পাবলিক থিয়েটারের সীমাবদ্ধতার কথা মনে রেখেই নেমেছিলেন কাজে। অবশ্য দর্শকের প্রশ্ন তাঁর কাছে প্রাথমিক শর্ত হলেও পাবলিক থিয়েটারের 'দর্শক-খাওয়ানো-র জন্যে ছকে-ফেলা ক্লিশে বাণিজ্যিক ফর্মুলাও মেনে নিতে রাজি ছিলেন না। তিনি চেয়েছিলেন থিয়েটারের স্বাদবদল ঘটাতে। চেয়েছিলেন স্বচ্ছসুন্দর সামাজিক-চেতনাঋদ্ধ এমন এক নাটক উপস্থাপন করতে যা নক্ষত্রশিল্পীদের আকর্ষণে নয়, টোটাল থিয়েটারের মায়াবী আলোয় সকলে মিলে উপভোগ করতে আসবেন সেই নাট্যরস। এমন নয় যে, তার জন্যে নির্বাচিত দর্শকমণ্ডলীই চাই তাঁর; তিনি চেয়েছিলেন, তাঁর থিয়েটার হোক সর্বজনবুদ্ধিগম্য এবং উপভোগ্য, পরন্তু ভিন্ন গোত্রের।

অবশেষে ঠিক তাই হল। সৌমিত্র-র *নাম জীবন* প্রযোজনাটি শুধুমাত্র ব্যতিক্রমীই নয়, পেশাদার থিয়েটারের ইতিহাসে স্মরণীয় হবার মার্কা পেয়ে গেল। তার আর্থিক সাফল্য দেখে বোঝা গেল দর্শক কীভাবে এই নবীন কলাকারকে তারিফ জানাতে এগিয়ে এসেছেন। তাঁদের স্বতঃস্ফূর্ত অভিনন্দনে প্রথাভাঙা থিয়েটারের প্রতি দর্শকদের আগ্রহের বার্তা ঘোষিত হয়েছিল, যেমন তাঁর গুরুর *সীতা* প্রযোজনা দেখে একদা উদ্‌বেল হয়েছিলেন বাংলার আপামর মানুষ।

প্রসঙ্গত এখানে *বাংলা থিয়েটারের ইতিহাস* বই থেকে ড. দর্শন চৌধুরীর মন্তব্য তুলে ধরতে ইচ্ছে করছে: "পেশাদার মঞ্চে এই ধরনের পরীক্ষামূলক নাটক সে সময় দর্শক-আনুকূল্য এবং কলারসিকজনের প্রশংসা লাভ করেছিল। একটি ভাঙাচোরা দোতলা বাড়ির সেট, সামনে রাস্তা— ঘরের উঠান— একটি একটিমাত্র সেট ব্যবহার করে, আলোর বিভাজনে বিভিন্ন স্থান নির্দিষ্ট করে নাটকটি অভিনীত হতো। সাধারণ রঙ্গালয়ে মঞ্চ ব্যবহারের এই নবতম পরীক্ষা খুবই আদৃত হয়েছিল। কাহিনীর গুণে, অভিনয়ের কৃতিত্বে এবং বাস্তব জীবনভাবনা উপস্থাপনে 'নামজীবন' যেমন সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের, তেমনি বাংলা রঙ্গালয়েরও, একটি মাইলস্টোন।"

নাম জীবন-এর অপ্রত্যাশিত সাফল্যের পরে থিয়েটারপাড়ায় সৌমিত্রকে অতঃপর দেখা যেতে লাগল মাঝেমধ্যে। থিয়েটারের প্রতি তাঁর রক্তের টান থাকলেও অভাব ছিল

সময় আর সুযোগের। *নাম জীবন*-এর বাণিজ্যিক সফলতা কিছু সুযোগ এনে দিল। সুযোগ বলতে, বেশকিছু লগ্নিকারী এসে হাজির হলেন তাঁর দরজায়। থিয়েটারের ব্যাবসায় টাকা খাটাতে চান তাঁরা; ফলে কাশী বিশ্বনাথ মঞ্চেই আবার আত্মপ্রকাশ করল তাঁর দ্বিতীয় নাটক *রাজকুমার*। *নাম জীবন*-এর মতো না-হলেও এ-নাটকটিও বেশ ভালো চলল। ভালো বলতে, বাণিজ্যিক লাভ হল বেশ ভালোই। *নাম জীবন*-এর নায়িকা ছিলেন লিলি চক্রবর্ত্তী আর *রাজকুমার*-এ এলেন সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়।

ব্যতিক্রমী আর পরিচ্ছন্ন কমার্শিয়াল থিয়েটারের প্রয়োগকর্তা হিসেবে এরই মধ্যে বেশ নাম হয়ে গেল সৌমিত্র-র। সিনেমার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে এখন চলতে লাগল তাঁর এই দুই ঘোড়ার অলৌকিক ফিটন।

তারপর *ফেরা*, *নীলকণ্ঠ*, *ঘটক বিদায়*, *চন্দনপুরের চোর*, *ন্যায়মূর্তি*—এমনিসব নাটক নিয়ে পেশাদার মঞ্চে ক্রমান্বয়ে হাজির হতে লাগলেন সৌমিত্র। কিন্তু *ঘটক বিদায়* চলাকালীনই এক গভীর রাতে আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গেল সাবেক কালের স্টার থিয়েটার। বলা যায়, পেশাদার থিয়েটারের কপালে আগুন লাগল সেখান থেকেই। হাউসের নিজস্ব বাণিজ্যিক-ছকে-ফেলা প্রযোজনাগুলোর দর্শক কমতে থাকায় সামগ্রিকভাবে ভাঙনের তীরে এসে দাঁড়াচ্ছিল থিয়েটার। আর তখনই দেখা যেতে লাগল, ম্যাজিকের মতো একের-পর-এক পুড়ে যাচ্ছে থিয়েটার হল—রঙমহল, বিশ্বরূপা। ওদিকে নানান মামলা-মোকদ্দমায় জেরবার মিনার্ভা এমনিতেই বন্ধ থাকত বেশিরভাগ সময়ে। আর দর্শকের অভাবে কাশী বিশ্বনাথ মঞ্চ বদলে গেল গুদোমখানায়। এমনিভাবেই ভারতবর্ষের একমাত্র নিয়মিত থিয়েটারের পেশাদার রঙ্গালয়গুলি একসময় বেদনাদায়কভাবে নিষ্প্রদীপ হয়ে গেল।

পেশাদার থিয়েটারের পাশাপাশি ভারতীয় গণনাট্য সংঘের হাত ধরে ১৯৪৪ সাল থেকেই শুরু হয়েছিল ভিন্ন ধরনের অপেশাদার থিয়েটার। ধীরে-ধীরে তারা কমার্শিয়াল থিয়েটারের পরিত্যক্ত জমিগুলো দখল করছিল। একটু-একটু করে গড়ে উঠছিল সমান্তরাল গ্রুপ থিয়েটার। বাণিজ্যিক থিয়েটার যখন পুরোপুরি বন্ধ হয়ে গেল, এই সমান্তরাল থিয়েটারই তখন রসিক দর্শকের মনোযোগ আকর্ষণ করল। এইসব থিয়েটারে আর্থিক দায়বদ্ধতা পেশাদার থিয়েটারের মতন বাধ্যতামূলক ছিল না। যেমন ছিল না তাঁদের নিজস্ব মঞ্চ। তাই অনেক কম ঝুঁকি নিয়ে ভিন্ন-ভিন্ন মঞ্চ ভাড়া করে নিরীক্ষামূলক নাটক দিয়ে তাঁরা দর্শকদের দৃষ্টিভঙ্গির বদল ঘটাতে সমর্থ হলেন। তাঁদের সব প্রযোজনাই যে উৎকৃষ্ট হত এমন ভাবা ঠিক হবে না। তবে ভালো নাটক ভালোভাবে প্রযোজনা করার প্রবণতা বাড়তে লাগল ক্রমে।

পেশাদার মঞ্চ উঠে যাওয়ায় আদ্যন্ত পেশাদার সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় থমকে গেলেন।

কিছুটা দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে নিজেকে গুটিয়ে নিলেন কিছুকাল। তারপর সেই গুটি কেটে একসময় প্রজাপতির আত্মপ্রকাশ ঘটল। গ্রুপ থিয়েটারে এলেন সৌমিত্র, তবে বাণিজ্যিক ভঙ্গিতে। ভিন্ন-ভিন্ন দল থেকেই পেশাদার রীতিতে নতুন-নতুন নাটক প্রযোজনা করতে লাগলেন। স্বপ্নসন্ধানীর ব্যানারে *টিকটিকি* নাটক দিয়ে শুরু হল সেই জয়যাত্রা। মাত্র দুটি পুরুষ চরিত্র নিয়ে সেই আশ্চর্য প্রযোজনা উপছে পড়ে দেখলেন দর্শক। ভিন্ন রূপে আর-এক নতুন সৌমিত্রকে আবিষ্কার করে থিয়েটারের ভবিষ্যৎ নিয়ে আশাবাদী হলেন তাঁরা।

তখন থেকে একের-পর-এক নতুন নাটক প্রযোজনা করতে করতে একসময়-পেশাদার-মঞ্চে-অভিনীত তাঁর জনপ্রিয় নাটক *নীলকণ্ঠ*-র পুনঃপ্রযোজনায় হাত দিলেন আয়ন্দা নামের একটা দল থেকে। আর এই দ্বিতীয় পর্যায়েই আমার সঙ্গে আবার সংযোগ ঘটল সৌমিত্র-র। চলচ্চিত্র *বিলেতফেরত*-এ অভিনয়ের পরে মঞ্চে *নীলকণ্ঠ* নাটকে দ্বিতীয় বার দুজনে আবার অভিনয়ের আসরে একত্রিত হতে পারলাম।

মনে পড়ছে, বছর বারো-তেরো আগে ওই *নীলকণ্ঠ* নাটকটিই দেখেছিলাম বাণিজ্যিক মঞ্চে। প্রথমে কিছুদিন রঙমহলে, পরে বিশ্বরূপায়। খুবই জমেছিল। সহজসরল মানবিক-আবেদনসম্পন্ন নাটক। আর সে-আবেদন এতই তীব্র, এমন খাঁটি ছিল যে, এত বছর পরে এই নবীকরণেও দেখলাম তার জনপ্রিয়তা বিন্দুমাত্র কমেনি। বরং সময়সচেতন নির্দেশক তাঁর সুঠাম সম্পাদনায় সে-নাট্যের বুনোট ইতিমধ্যে অনেক ঠাস করে তুলেছেন।

নতুন পর্যায়ের দু-চারটে শো হয়ে যাবার পরে আচমকা সৌমিত্র আমাকে অনুরোধ জানালেন ওই নাটকের একটি বিশিষ্ট চরিত্রে অভিনয় করবার জন্যে। চরিত্রের নাম কৈলাস চক্রবর্তী। মধুখালি এস্টেটের প্রবীণ ম্যানেজার।

পেশাদার মঞ্চে ওই ভূমিকাটিতে অভিনয় করেছিলেন সেকালের প্রখ্যাত প্রবীণ নট অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়। পুনর্নির্মাণে তাঁকে আবার রূপ দিলেন একালের এক শক্তিমান অভিনেতা অশোক মিত্র। সেই চরিত্রে আমি? শুনলাম, অশোকবাবু হঠাৎ হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হয়ে নার্সিং হোমে শয্যাশায়ী। তাঁরও অনুরোধ, আমি যেন চরিত্রটি করি। দ্বিধা ছিল, তবু পরিস্থিতি বিবেচনা করে রাজি হয়ে গেলাম।

রাজি তো হলাম। কিন্তু চলতি নাটক। হাতে সময় ছিল কম। দিনতিনেক পরেই আমাকে—বলতে গেলে, মুখ-মিল রিহার্সাল করে—নামতে হল মঞ্চে। এমন একটা টানটান স্মার্ট প্রযোজনার মধ্যে এমন অপ্রস্তুত অবস্থায় নামতে তো বুক টিপটিপ করছিল। কিন্তু নির্দেশক আর সহযোগী বন্ধুদের সহৃদয় সহযোগিতায় কোনোক্রমে উতরে গিয়েছিল সেদিনটা। তারপর থেকে প্রায় শততম রজনির পথে দাপটের-সঙ্গে-এগিয়ে-চলা এই নাটকে অভিনয় করে গিয়েছি। ফলাও করে বলতে পারি, সৌমিত্র-র মতো বিশাল মাপের শিল্পীর সঙ্গে

নিয়মিত কাজ করার সুখ ও তৃপ্তি কিন্তু আমার জীবনের এক স্বতন্ত্র ও স্মরণীয় অভিজ্ঞতা।

এখানে অভিনয় করতে এসে আমার সবচেয়ে বড়ো লাভ হল মঞ্চাভিনেতা সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়কে চেনা, অনেক কাছের থেকে দেখা। প্রত্যেকদিন উইংসের পাশে দাঁড়িয়ে ওঁর অভিনয় দেখি। আমার মুগ্ধতা যেন আর ফুরোয় না। প্রতিদিন নতুন-নতুন রূপে যেন খুঁজে পাই নীলকণ্ঠ লাহিড়ীকে! তাঁর স্বরবিন্যাস, অঙ্গসঞ্চালন, ভাবের অভিব্যক্তি আর বাচিক কারুকৃৎ আমাকে আবিষ্ট করে রাখে। তাঁর সাত্ত্বিক অভিনয় দিনে-দিনে যেন 'দুধ মরে ক্ষীর' হয়ে উঠছে। তাঁর অভিনয়ের প্রকাশরীতি স্পষ্টতই বিজ্ঞানভিত্তিক, শিল্পসমৃদ্ধ ও বিশ্লেষণাত্মক। সম্পূর্ণ আধুনিক তাঁর এই স্বকীয় অভিনয়রীতি এত কাছের থেকে দিনের-পর-দিন পর্যায়ক্রমে না-দেখলে এভাবে হয়তো কোনোদিনই বুঝতে পারতাম না।

প্রসঙ্গান্তরে বলি, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের সৌজন্যে এই *নীলকণ্ঠ* নাটকের সূত্রেই আমার একপ্রস্থ আমেরিকা-ভ্রমণ হল। কবুল করতে দ্বিধা নেই, অভিনয়ের জন্যে এমনভাবে বিদেশযাত্রার সুযোগ মিলবে তা স্বপ্নেও ভাবিনি। অবশ্য গান্ধারের নির্দেশক প্রয়াত অসিত মুখোপাধ্যায়ের আমন্ত্রণেও ঢাকা শহরে তাঁর *নীলাম নীলাম* নাটকে অভিনয় করতে গিয়েছিলাম—খাতায়কলমে সেটাও বিদেশযাত্রা বটে; কিন্তু বাংলাদেশকে, নিজে বাঙাল বলে, আমি কখনোই বিদেশ ভাবতে পারিনা।

এক মাসের মধ্যে আর ক-টা জায়গাতেই বা যাওয়া যেতে পারে, বিশেষ করে শনি-রবিবার ছাড়া যেখানে অভিনয় করা যাবে না? বস্টন, নিউ জার্সি, নিউ ইয়র্ক, ওয়াশিংটন ডিসি, হিউস্টন, নর্থ ক্যারোলিনা—এমনি কয়েকটি বাঙালিপ্রধান অঞ্চলেই সেই অভিনয় হয়েছিল। বিশেষ করে মনে পড়ছে, এক সংবর্ধনা-অনুষ্ঠানে নর্থ ক্যারোলিনার মেয়র যখন সম্মান জানাবার জন্যে সৌমিত্র-র হাতে নগরের প্রতীকী চাবি তুলে দিয়েছিলেন, তা দেখে অভিভূত হয়েছিলাম। বিদেশের মাটিতে একজন বাঙালি তথা ভারতীয় অভিনেতাকে তাঁরা যে-সম্মান জানালেন তা দেখে গর্বে-আনন্দে চোখে জল ধরে রাখতে পারিনি। তাঁর এ-সম্মানের সূত্রে আমরাও যে সম্মানিত হলাম, সেই সৌভাগ্যের কথা ভেবে আজীবন আমার প্রিয় অভিনেতা-বন্ধুর কাছে কৃতজ্ঞ থাকব।

কথায়-কথায় ভুলতে বসেছিলাম অন্য আর-এক গল্প।

আকাশবাণীর সঙ্গে আমার যোগাযোগ তখন থেকে যখন তার শরীর থেকে 'অল ইন্ডিয়া রেডিয়ো'-র তকমাটা মুছে যায়নি। টেপ-রেকর্ডিং সিস্টেম তখনও আসেনি, চলে লাইভ ব্রডকাস্টিং। সেই ১৯৫১ সাল থেকে আমি ওখানকার অভিনেতা, নাটককার ও গীতিকার। আবার মাঝেমাঝে নাটক পরিচালনাও করতে হত সেখানে। একদিন হাতে এল জটিল অথচ আশ্চর্যসুন্দর এক নাটক। জীবনানন্দ দাশের গল্প নিয়ে *নিরুপম যাত্রা*। বেতার-

রূপ দিয়েছিলেন সৌম্যদেব বসু।

জীবনানন্দের গদ্য তাঁর কবিতার মতোই স্বতন্ত্র একটি শিল্পকলা। ব্যতিক্রমী তার গঠনভঙ্গি, বিচিত্র তার নির্মাণকৌশল। প্রভাত নামের এক শিক্ষিত গ্রাম্য যুবক চাকরির খোঁজে কলকাতায় এসে প্রাণধারণের গ্লানি নিয়ে আমৃত্যু কাটিয়ে গেল এক জীর্ণ মেসবাড়িতে। ঘরে-ফেরার আশা তার দূরায়ত স্বপ্ন হয়ে নিঃশব্দে মিলিয়ে গেল ভাসমান বুদ্‌বুদের মতো। এমন নস্টালজিক গল্প যেন জীবন থেকে ছিঁড়ে-আনা কিছু রক্তাক্ত ধমনি। পড়তে পড়তে মনটা ভারাক্রান্ত হয়ে যায়।

গল্পটি বলানো হয়েছে প্রভাতের মুখ দিয়েই, কিছুটা আত্মকথনের ভঙ্গিতে। যেন তার ভাবনার মধ্যেই ঘুরেফিরে আসছে পরিপার্শ্বের চেনা চরিত্রগুলি। তীব্র সাহিত্যবোধ আর অসামান্য বাচিক দক্ষতা না-থাকলে এর সার্থক রূপারোপ কষ্টকর। পড়তে পড়তে এমন নিপুণ শিল্পী একমাত্র সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় ছাড়া আর কারও কথা মনে পড়ল না আমার। কিন্তু আকাশবাণীতে অভিনয় করবার অবকাশ কোথায় তাঁর? যদিও ঘোষক হিসেবে একদা তাঁর কর্মজীবনের সূত্রপাত হয়েছিল এখান থেকেই। তবে সে ছিল তাঁর যৌবনকালের কথা। এখন জীবনের প্রৌঢ়প্রহরে এসে বিপুল কর্মব্যস্ততা ওঁর। এর ভিতর থেকে সময় বের করাই সমস্যা।

কিন্তু আশ্চর্য, এককথায় রাজি হয়ে গেলেন সৌমিত্র! বললেন, "যদি ফাঁকা থাকি, নিশ্চয়ই করে দেব।"

ডায়ারি খুলে দেখা গেল, রেকর্ডিংয়ের দিনটার সকালে একটা শুটিং পার্টি তারিখবদল করেছে। ভাগ্যিস! বললেন, "ভালোই হল। লিখে নিচ্ছি এখানটায়। তবে রিহার্সালের সময় বোধহয়—।"

বহুকাল পরে আকাশবাণীতে অভিনয় করতে রাজি হলেন সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়। তার পিছনে কতখানি জীবনানন্দ-প্রীতি আর কতখানি আমার প্রতি ভালোবাসা ছিল, আমি জানি না। তবে আমার প্রযোজনায় কাজ করতে রাজি হয়েছেন বলে সত্যিই আমি কৃতজ্ঞ। অন্তত আমার একটা কাজের সঙ্গেও তো ওঁর নাম জড়িয়ে থাকবে! সে কি কম কথা?

অসামান্য অভিনয় করলেন সৌমিত্র। তাঁর অভিনীত প্রভাত চরিত্রের মধ্য দিয়ে যেন জীবনানন্দ মূর্ত হয়ে উঠলেন। পার্শ্বচরিত্রে যাঁরা ছিলেন তাঁরাও সবাই বাছাই-করা শিল্পী; ফলে খুব অল্প সময়ের মধ্যেই প্রযোজনাটি একটি নিটোল কবিতার মতো ফুটে উঠল।

শহরে অবশ্য বেতার-নাটক শোনার চল কমে গেছে আজকাল। কিন্তু পরবর্তীকালে মফস্‌সলের অনেক রসিক মানুষের মুখে এই *নিরুপম যাত্রা*-র সুখ্যাতি শুনে খুব তৃপ্তি পেয়েছি। সকলের মুখেই শুনেছি সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের অনবদ্য চরিত্র-রূপায়ণের কথা।

সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় আজও জ্বলন্ত রংমশালের মতোই প্রাণবন্ত। আজও তাঁর অভিনয়ের রঙিন আলোয় উদ্ভাসিত নাট্যলোক। এখনও তাঁর চলা ভরন্ত নদীর মতোই বহমান। *নীলকণ্ঠ*-র পরে আরও অনেক নাটক তিনি প্রযোজনা করেছেন। তাঁর সব নাটকেরই আমি বিমুগ্ধ দর্শক। রূপান্তরে তাঁর হাত যেন সোনা দিয়ে বাঁধিয়ে রাখার মতো। সম্প্রতি তাঁর *আত্মকথা* এবং *তৃতীয় অঙ্ক, অতএব* আমাকে স্তম্ভিত করেছে। আত্মজীবনীমূলক তাঁর এই নাটকদুটিতে নাট্যদ্বন্দ্বগুলি অন্তর্মুখীন হয়ে আধুনিক কাব্যনাট্যের চরিত্র পেয়েছে। বহির্বাস্তব আর অন্তর্বাস্তবের যুগলবন্দি আলোড়নবিমূঢ় করেছে দর্শককে। বিশেষ করে *তৃতীয় অঙ্ক, অতএব* নাটকই তার বিস্ময়কর দৃষ্টান্ত। সত্যি বলতে কী, এমন পরীক্ষামূলক নাট্যপ্রযোজনা এর আগে দেখিনি। একজন মানুষের সত্তা তিন ভাগে ভাগ করে ভিন্ন বৃত্ত তৈরি করতে করতে একই কেন্দ্রে গিয়ে মিলিত হচ্ছে! যেন প্রস্রবণধারা থেকে উৎসারিত ভিন্ন-ভিন্ন নদী একই মোহানার উদ্দেশে ধাবমান। একই সাগরে মিলিত হবার মধ্যেই যেন তাদের চরম সার্থকতা। নিজের জীবনকে এখন নিপুণভাবে ব্যবচ্ছেদ করে যে নাট্যশরীর গঠন করা যায় তা শুধু অভূতপূর্ব নয়, অদৃষ্টপূর্বও বটে।

বলতে দ্বিধা নেই, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় আমাদের কালের সর্বশ্রেষ্ঠ অভিনেতা—কী মঞ্চে, কী চলচ্চিত্রে। শিল্পের বিভিন্ন কক্ষে তাঁর সক্ষম পদক্ষেপ আমাদের মুগ্ধ করে। বয়সের কারণে ইদানীং তাঁর শরীর মাঝেমাঝে তাঁকে ব্যতিব্যস্ত করার চেষ্টা করে বটে, কিন্তু তাঁর মনের কাছে বারেবারেই তাকে হার মানতে হয়। বিশ্বজয়ের অভিযানে আজও তাই তিনি বেপরোয়া অশ্বারোহী। সৌমিত্র-র বন্ধুত্ব আমার অহংকার। আমি তাঁর নীরোগ সুদীর্ঘ শিল্পজীবনের অমরত্ব কামনা করি। জয়োস্তু।

সৌমিত্রবাবু: ধৈর্য, নিষ্ঠা ও অধ্যবসায়ের এক আশ্চর্য মিশেল

মাধবী মুখার্জী

সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে আমার পরিচয় হয় সিনেমায় অভিনয়ের সূত্রেই। দীর্ঘদিন ধরে আমরা একসঙ্গে অনেক ছবিতেই অভিনয় করেছি। পরবর্তীকালে উনি যখন বিশ্বরূপায় *ফেরা* নাটক করেন সেই সময়ে একবার আমাদের বাড়িতে আসেন। এসে বললেন, "আমরা *ফেরা* নাটক করব, মাধবী। আপনাকে প্রয়োজন।" প্রথমে তো আমার নাটক করার ইচ্ছা একদমই ছিল না। যাই হোক, আমার ভাইয়ের বউকে নিয়ে নাটকটা শুনলাম। শুনে তো অসাধারণ লাগল! সঙ্গেসঙ্গে রাজি হয়ে গেলাম। কিন্তু নাটকটা করতে করতে পরে আমি একটু অসুস্থ হয়ে পড়েছিলাম, উনিও দেশের বাইরে গেলেন—এইসব নানান কারণে *ফেরা*-র sale-টাও একটু down হয়ে গিয়েছিল। তারপর *ফেরা* বন্ধ হয়ে গেল।

অনেক পরে আমি সৌমিত্রবাবুর সঙ্গে অভিনয় করলাম *ঘটক বিদায়* নাটকে, স্টার থিয়েটারে। *ঘটক বিদায়* ছিল ভীষণভাবে জমাটি নাটক, হাসির নাটক। এই নাটকটা সুপারহিট হয়। 'সুপারহিট' এইজন্যই বলছি যে, মঞ্চ পুড়ে গেল, কিন্তু নাটকটা পুড়ল না। নাটকটা যেখানেই করা গেছে—যেমন ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট হল—সেখানেই মানুষ দেখতে গেছেন। তারপর বিজন থিয়েটারেও যখন নাটকটা হল তখনও প্রতিদিন হাউস ফুল।

সৌমিত্রবাবুর সঙ্গে নাটক করতে গিয়ে দেখেছি, নাটক করার সময়ে উনি অসম্ভব serious থাকতেন। আর এই seriousness বা নিষ্ঠা না-থাকলে আজকে এতটা উচ্চতায় উনি পৌঁছোতে পারতেন না। কয়েকদিন আগেকার একটা ছোট্ট ঘটনা বলি। ফাগু বলে একটা জায়গায় শুটিং করতে গিয়েছিলাম। সেখানে উনি অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও উনি নিজের শটগুলো কিন্তু সঠিকভাবেই দিয়েছিলেন। শুটিংয়ের পর সেইদিনই আমাদের ফিরে আসার কথা। গাড়িতে সারা রাস্তায় উনি কিছু খাননি। সবসময় একটা টেনশনে ছিলাম—কী হয়, কী হয়। সবাই ভয় পাচ্ছি আমরা। কিন্তু উনি ধীরস্থিরভাবে পুরো পথটা এলেন! এই ধীরস্থির থাকাটাই সৌমিত্রবাবুর সবথেকে বড়ো গুণ। আর সৌমিত্রবাবুকে আমি কখনও বলতে শুনিনি—"আমার জন্য এটা নিয়ে এসো, ওটা নিয়ে এসো, সেটা নিয়ে এসো।" যা সকলের জন্য এসেছে, তার থেকেই সকলের সঙ্গে share করতেন। যা খাবার আসত, খেয়ে নিতেন।

তবে এগুলো কোনো নতুন কথা নয়; এসব কথা অনেকবার অনেক জায়গায় বলেছি। নতুন কথা যেটা বলতে হয় সেটা হল তাঁর অধ্যবসায়। আমি যখন সিনেমায় শুটিং করেছি তখন আমি এরকম অধ্যবসায় মাত্র দুজন মানুষের মধ্যেই পেয়েছি। একজন ছিলেন

উত্তমকুমার; তাঁকে দেখতাম রাত তিনটের সময়ে উঠে morning walk করতে। তারপর দেখেছি এই সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়কে; তিনিও সকালবেলায় উঠে excercise করতেন নিয়ম করে। এর কারণ অভিনয় করতে গেলে body fitness দরকার। এক-একটা চরিত্র এক-একরকমভাবে হাঁটবে। চরিত্রের উপর নির্ভর করছে অভিনেতার হাঁটাচলা কেমন হবে। সৌমিত্রবাবুকে এইসব ব্যাপারে খুব নিষ্ঠাবান থাকতে দেখেছি। সেই কারণেই উনি এখনকার জীবিত অভিনেতাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হয়ে আছেন।

নাটকের মঞ্চে সৌমিত্রবাবু একাধারে ছিলেন আমার সহ-অভিনেতা আর পরিচালক। তাঁর এই দ্বৈত ভূমিকার মূল্যায়ন করতে গিয়ে বলতে পারি যে, যখন তিনি সহ-অভিনেতা তখন তিনি কেবল একজন অভিনেতাই, আবার যখন তিনি পরিচালক তখন তিনি একজন পরিচালকই। একটা কথা বলি। মে মাসে যে প্রচণ্ড গরম থাকে, এটা সবাই জানে। পেশাদার রঙ্গমঞ্চে air বেশি থাকে না। কিন্তু তার ভেতরেও উনি উইংসের পাশে দাঁড়িয়ে থাকতেন—কেউ যদি ভুল করে! এটাই হল পরিচালক সৌমিত্র-ব সবচেয়ে tough quality। প্রত্যেকটা মানুষকে উনি যা-যা যেভাবে-যেভাবে বলেছেন সেটা তাঁরা maintain করছেন কি না—এটাও উনি লক্ষ করতেন। আমিও অনেক ভুল করেছি। যখনই বলেছি, "ভুল হয়ে গেছে।"—উনি কখনও বলেননি, "না, ঠিক আছে। ভুল হয়েছে তো কী হয়েছে?" বরং উনি বলতেন, "হ্যাঁ, হয়েছেই তো!" এর অর্থ, "যা করে ফেলেছ, করে ফেলেছ। এরপর আর এই ধরনের ভুল বরদাস্ত করব না।" হৃদয়ে নরম হলেও এই জায়গাটায় উনি ভীষণ কঠোর। এটা না-হলে director হওয়া যায় না। সৌমিত্রবাবুর সহ-অভিনেতা হিসেবে আমরা অত্যন্ত স্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করতাম। মঞ্চে খুব সহায়তা করেন সহ-অভিনেতা হিসেবে।

যদিও মাত্র দুটি নাটকে সৌমিত্রবাবুর সঙ্গে আমার অভিনয় করার সুযোগ হয়েছে, আমি কিন্তু ওঁর বেশকিছু নাটক দর্শকাসনে বসে দেখেছি। একটা নাটকের কথা তো প্রথমেই মনে পড়ছে—*নীলকণ্ঠ*। সৌমিত্রবাবুই বলেছিলেন, "তোরা আয়।" অসাধারণ অভিনয় করেছিলেন প্রত্যেকে। এ ছাড়া দেখেছিলাম *হোমাপাখি*। খুবই সুন্দর লেগেছিল। পরে আমার মেয়েরাও ওটা দেখেছে। এই প্রসঙ্গে বলি, আমার মেয়েরা সৌমিত্রবাবুর খুব fan। তো আমি আমার বড়ো মেয়েকে বললাম, "যা, তোরা *হোমাপাখি* দেখে আয়।" ও বলল, "তুমি যাবে না?" তখন আমি বললাম, "আমার তো এক জায়গায় যাওয়ার আছে, তোরাই যা। আমি তো নাটকটা আগেই দেখেছি। জানিস তো, হোমাপাখি কাকে বলে?" ওরা বলল, "না, জানি না।" তখন আমি বুঝিয়ে দিলাম হোমাপাখি সম্বন্ধে। আপনারা জানেন তো, হোমাপাখি কাকে বলে? হোমাপাখি আকাশের অনেক উঁচুতে থাকে; সেখানেই ডিম পাড়ে। তারপর ডিমটা আস্তে-আস্তে নীচের দিকে পড়তে থাকে। যখন সেটা পৃথিবীর একেবারে

কাছে চলে আসে তখন মাটি ছোঁয়ার আগেই ডিমটা ফুটে পাখির ছানা বের হয় এবং সে মর্তে না-নেমে আবার উঁচুতে উড়তে থাকে। তাই হোমাপাখিকে 'আকাশের পাখি' বা 'স্বর্গের পাখি' বলা হয়। বাস্তবে হোমাপাখির অস্তিত্ব আছে কি না কেউ জানে না, তবে সাধারণত philosophically এই পাখির কথা বলা হয়। রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের কথামৃততেও হোমাপাখির কথা আছে। যাই হোক, সৌমিত্রবাবুর নাটকে হোমাপাখির ব্যাপারটা আমার খুব ভালো লেগেছিল। এই নাটকেও উনি অসাধারণ অভিনয় করেছেন।

হোমাপাখি-র পর *আত্মকথা*-ও দেখেছি। অসাধারণ লেগেছে। তারপর লিখলেন ওঁর নিজেরই আত্মকথা—*তৃতীয় অঙ্ক, অতএব*। এটা যখন মিনার্ভায় হয়েছিল, দেখতে যেতে পারিনি। আসলে আমার এই লেক গার্ডেন্‌সের বাড়ি থেকে মিনার্ভা বড্ড দূর! পরে অবশ্য অ্যাকাডেমিতেও হয়েছে। কিন্তু এখনও পর্যন্ত নাটকটা দেখে উঠতে পারিনি।

অনেকদিন হল আমি মঞ্চে অভিনয় করিনি। আজকাল সিনেমা-টেলিভিশনেও কাজ করি না খুব-একটা। আসলে আগে যেমন একটা খামের দরকার হত, সেটা এখন আর তেমন দরকার হয় না। আর ভালোবাসা থেকে অভিনয়? তার সুযোগও এখন নেই বললেই চলে। এখন যেসব ছবি হয় সেগুলোর অধিকাংশতেই কোনো সুস্থ লোক অভিনয় করতে ভালোবাসে না। সত্যিকথা বলতে কী, অভিনয়ের প্রয়োজন আর উৎসাহ—দুটোই আমার ফুরিয়েছে।

কিন্তু সৌমিত্রবাবুর ক্ষেত্রে তা হয়নি। এই বয়সে এসেও অভিনয়ের উৎসাহ তিনি হারিয়ে ফেলেননি! তাঁকে আমাদের আরও অনেকদিন প্রয়োজন। তাই আমি চাই—তিনি সুস্থ, সুন্দর ও স্বাস্থ্যবান থাকুন। তাঁর জীবন আনন্দময় হোক।

আলাপচারিতা ও রেকর্ডিং: **অনির্বাণ দে, রুমা চন্দ ও অন্বেষা দে**
অনুলিখন: **অনির্বাণ দে**

সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়: আমার নাট্যগুরু

কৌশিক সেন

বিখ্যাত বাবা-মায়ের সন্তান হওয়ার সুবাদে আমি খুব ছোটোবেলা থেকেই আমাদের বাড়িতে ততোধিক বিখ্যাত মানুষজনের আনাগোনা দেখেছি। এঁদের মধ্যে যেমন ছিলেন সমরেশ বসু, শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় ও শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের মতো সাহিত্যিক, তেমনই অনিবার্যভাবে ছিলেন সিনেমা-থিয়েটারের বহু প্রবাদপ্রতিম ব্যক্তিত্ব। আমার বাবা উৎপল দত্ত-র ছাত্র ছিলেন বলে তাঁকে তো দেখেইছি; এ ছাড়া দেখেছি অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত, প্রমুখ নাট্যব্যক্তিত্বকে। শম্ভু মিত্রকেও খুব ছোটোবেলায় দেখেছি; তিনি তখন আমার বাবা শ্যামল সেনের নির্দেশিত *ভালো মানুষের মেয়ে* নামক একটা নাটকের মহলা দেখতে এসেছিলেন। তারও আগে বাবার *যদুবংশ* নাটক দেখে শম্ভু মিত্র খুব খুশি হয়েছিলেন।

বাংলা চলচ্চিত্র ও মঞ্চের প্রবাদপুরুষ সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়কেও সেইভাবেই ছোটোবেলায় দেখেছি। বিভাস চক্রবর্তী যখন কলকাতা দূরদর্শনের প্রযোজক ছিলেন সেই সময়ে তিনি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাহিনি-অবলম্বনে *মালঞ্চ* নামে একটি দূরদর্শন-নাটকের প্রযোজনা করেছিলেন। সেই নাটকে আমার বাবার পরিচালনায় সৌমিত্রকাকু প্রথম ছোটোপর্দায় অভিনয় করেছিলেন। তাঁর চরিত্রটির নাম ছিল আদিত্য। এই নাটকে আমার মা চিত্রা সেন করেছিলেন নীরজা, আর শাঁওলী মিত্র করেছিলেন সরলা। এই নাটকটি খুব নাম করেছিল তখনকার আমলে। এখন যে-ঘরটিতে আমাদের স্বপ্নসন্ধানী দলের মহলা হয় সেই ঘরটিতেই সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়কে এই নাটকের মহলা দিতে দেখতাম। সেই প্রথম তাঁর অভিনয়ের সঙ্গে আমার প্রত্যক্ষ পরিচয়।

আরও আগে—যতদূর মনে পড়ে, ১৯৭৬ সালে—সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের তত্ত্বাবধানে অভিনেতৃ সংঘ রবীন্দ্রসদনে একটি নাট্যোৎসবের আয়োজন করেছিল। সেখানে যে-চারটি নাটক মঞ্চস্থ হয়েছিল তাদের মধ্যে ছিল শরৎ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের বহুপঠিত উপন্যাস *গৃহদাহ*-র নাট্যরূপ। এর নির্দেশনা দেওয়ার জন্য বাবাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন সৌমিত্রকাকু, যদিও উনি নিজে এই নাটকটিতে অভিনয় করেননি। অভিনেতাদের মধ্যে ছিলেন আমার মা, দিলীপ রায়, সতীন্দ্র ভট্টাচার্য, প্রমুখ। সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় এত বড়ো একজন চিত্রতারকা হওয়া সত্ত্বেও মঞ্চনাটকের প্রতি ওঁর সাংঘাতিক অনুরাগ দেখে খুব অবাক হতাম। ছোটোবেলা থেকেই ওঁর এই ব্যাপারটা আমাকে খুব আকর্ষণ করত।

সাতের দশকে কলকাতার সাধারণ রঙ্গালয়ে দুর্যোগপূর্ণ একটা পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছিল। রঙ্গমঞ্চে তখন ঢুকে পড়েছে ক্যাবারে নাচ, বাথটবে স্নান, ইত্যাদি দেখিয়ে দর্শকের

ভিড় বাড়ানোর সস্তা কৌশল। রঙ্গমঞ্চের এই দুর্দিনের মধ্যেই একই বছরে (১৯৭৮ সালে) কলকাতা তিনটি ব্যতিক্রমী নাটকের মঞ্চায়ন দেখল। প্রথমটা ছিল শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায়ের নির্দেশনায় অভিনীত *কালবৈশাখী* নাটক, যেটি প্রকৃতপক্ষে আর্থার মিলারের বিখ্যাত নাটক *All My Sons*-এর বাংলা রূপান্তর। একই সময়ে আমার বাবা করলেন *থানা থেকে আসছি*। বিখ্যাত নাটক *An Inspector Calls*-এর এই বাংলা নাট্যরূপে অভিনয় করেছিলেন তৃপ্তি মিত্র, এন. বিশ্বনাথন, দেবরাজ রায়, অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রমুখ খ্যাতনামা অভিনেতা-অভিনেত্রী। তবে সেই বছরের সবচেয়ে জনপ্রিয় প্রযোজনা হয়েছিল *নাম জীবন*। এটিও *Moon on a Rainbow Shawl* নামের একটা বিদেশি নাটকের রূপান্তর। এটাই ছিল পেশাদার রঙ্গমঞ্চে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের নির্দেশিত প্রথম নাটক। বাবা এই নাটকটি দেখার পর বাড়িতে এসে উত্তেজিতভাবে অনেক আলোচনা করেছিলেন থিয়েটারের অন্যান্য মানুষজনের সঙ্গে। নাটকের মঞ্চপরিকল্পনাও ছিল অসামান্য। বাবার মুখেই এসব শুনেছিলাম। আমার যদিও তখন মাত্র দশ বছর বয়স, তাও বাবার সেই মুগ্ধতা দেখে আমিও উচ্ছ্বসিত হয়েছিলাম।

তারপর অনেকটা সময় কেটে গেছে। বাবার দলটার তখন ভাঙা অবস্থা। বাবার দলের নাম ছিল থিয়েটার গিল্ড। বাবা তখন পেশাদার মঞ্চে অভিনয় ও নির্দেশনা করে অর্থোপার্জন করছেন। আমিও একটা chartered firm-এ চাকরিতে ঢুকেছি। চাকরি করতে করতেই দূরদর্শনে *কালপুরুষ* ধারাবাহিকটা করছি। সৌমিত্রকাকুর সঙ্গে ততদিনে আমার একটা ব্যক্তিগত সম্পর্ক তৈরি হয়েছে। এই সময়ে হঠাৎ বাবার paralysis হল। বাবা আর কাজ করতে পারলেন না। সংসারের প্রয়োজনে আমিও একটু-আধটু অভিনয়ের কাজ করছি। সেই সময়ে ১৯৯০ সালে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় হঠাৎ করেই আমাকে ডাকলেন স্টার থিয়েটারে ওঁর নির্দেশনায় *ঘটক বিদায়* নাটকে অভিনয় করবার জন্য। এর আগে পেশাদার রঙ্গমঞ্চে ওঁর *ফেরা* ও *নীলকণ্ঠ* নাটকদুটো দেখে ফেলেছি; খুব ভালো লেগেছিল।

স্টার থিয়েটারে যখন *ঘটক বিদায়* নাটকে অভিনয় করছি তখন আমার মা অভিনয় করছেন মনোজ মিত্র-র সুন্দরম নাট্যদলের *অলকানন্দার পুত্রকন্যা*, *শোভাযাত্রা*, ইত্যাদি প্রযোজনায়। পেশাদার রঙ্গমঞ্চে মাসমাইনে পাব বলে চাকরিটাও আর করতে হবে না, পুরো সময়টাই থিয়েটারে দিতে পারব—এটা ভেবেই আনন্দ হল খুব। চাকরিটা ছেড়েই দিলাম।

ঘটক বিদায়-এর পর একে-একে সৌমিত্রকাকুর নির্দেশনায় *দর্পণে শরৎশশী* আর *চন্দনপুরের চোর* করলাম স্টারে। এর মাঝখানেই ১৯৯২ সালে আমার নিজের থিয়েটারের দল স্বপ্নসন্ধানী তৈরি হয়ে গেল। সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় হলেন দলের প্রতিষ্ঠাতা-সভাপতি। ১৯৯৫ সালে সৌমিত্রকাকুর সঙ্গে অভিনয় করলাম *টিকটিকি* নাটকে। অ্যান্টনি শ্যাফারের

Sleuth নাটকের বাংলা রূপান্তরটা নির্দেশক সৌমিত্রকাকু নিজেই করেছিলেন অনেক দিন আগেই। নাটকটা গ্রুপ থিয়েটারে ওঁর নির্দেশিত প্রথম নাটক। খুব ভালো কাজ করেছিলেন উনি। খুব জনপ্রিয় হয়েছিল *টিকটিকি*।

মঞ্চে অভিনয়ের পাশাপাশি বড়োপর্দাতেও তখন একটু-আধটু অভিনয়ের সুযোগ পেলাম। তপন সিংহ আমার কাজ দেখে আমাকে পছন্দ করলেন। তাঁর পরিচালনাতে অভিনয় করলাম *অন্তর্ধান*, *হুইলচেয়ার* ও *আজব গাঁয়ের আজব কথা* ছবিতে। এইসব ছবি করতে গিয়ে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে অভিনয়ের সুযোগ পেলাম সম্পূর্ণ অন্য-এক মাধ্যমে।

এই যে এতরকমভাবে এত বড়ো একজন নির্দেশক-অভিনেতার সান্নিধ্যে থেকে তাঁর প্রভাবের মধ্যে চলে-আসা—এই ব্যাপারটা অভিনেতা কৌশিক সেনের জীবনে সাংঘাতিকভাবে কাজে এসেছে। সাধারণ রঙ্গালয়ের দুর্দিনে নির্দেশক হিসাবে তাঁর লড়াইটা আমার কাছে একটা দৃষ্টান্ত হয়ে থেকে যাবে আজীবন। চিরকালই পেশাদার রঙ্গালয়ের পরিবেশ ছিল অত্যন্ত অগোছালো। সেইরকম একটা পরিবেশে ওঁর মতো একজন শিল্পী কঠোর নিয়মানুবর্তিতা ও সময়ানুবর্তিতা আমদানি করে কীভাবে একের-পর-এক ভালো কাজ করে গেলেন সেটাই শিক্ষণীয়। সবটাই যে জনরুচিকে মাথায় রেখে কাজ করেছেন তা নয়, বরং দুঃসাহস দেখিয়ে একটু অন্যরকম ব্যতিক্রমী কাজ করেছেন সৌমিত্রকাকু। এই ব্যাপারটা আমাকে পরবর্তীকালে বারবার সাহস জুগিয়েছে। যখন জীবনানন্দ-অবলম্বনে *মাল্যবান* বা এই ধরনের কোনো সাহসী প্রযোজনায় হাত দিয়েছি তখন প্রথমেই মনে হয়েছে—"বাবা! লোকে এসব দেখবে তো?" পরমুহূর্তেই মনে পড়েছে সৌমিত্রকাকুর একা লড়াইয়ের কথা।

আমাদের থিয়েটারে নির্দেশক-অভিনেতার প্রাধান্যই বেশি। আমরা উৎপল দত্ত, শম্ভু মিত্র, অরুণ মুখোপাধ্যায়ের মধ্যে নির্দেশক-অভিনেতা দেখেছি, যাঁরা একই নাটক নিজেরা পরিচালনা করছেন এবং নিজেরা তাতে অভিনয়ও করছেন। সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, আমার মতে, একজন বিরাট মাপের নির্দেশক-অভিনেতা।

পাশাপাশি এটাও বলব যে, আমি কিন্তু থিয়েটারে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের চেয়েও বড়ো নির্দেশক পেয়েছি। বিভাস চক্রবর্তীকে আমি সামান্য হলেও নির্দেশক হিসাবে একটু এগিয়েই রাখব। কিন্তু অভিনেতা সৌমিত্র এবং অভিনয়প্রশিক্ষক সৌমিত্র আমার কাছে বিরাট বড়ো। নতুন একটা ছেলে বা মেয়ের যদি অভিনয় শেখার আগ্রহ থাকে, তাকে কীভাবে তৈরি করা যায় সেটা ওঁকে দেখে শিখতে হয়। সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় আমার অভিনয়েরও শিক্ষাগুরু। বারবার বলব, আমি আজ যেটুকু অভিনয় শিখতে পেরেছি তার প্রায় পুরোটাই ওঁর কৃতিত্ব। এমনকি আমার বাবা-মায়ের চেয়েও বেশি শিখেছি ওঁর কাছে। একটা বয়স পর্যন্ত অবশ্যই আমি বাবা-মায়ের guidance পেয়েছি। কিন্তু আমি খুব ভাগ্যবান

যে, সেই বয়সটার পরপরই আমি সৌমিত্রকাকুকে শিক্ষাগুরু হিসাবে পেয়েছি। বাবার কাছ থেকে আমি অবশ্য কাব্যনাটকের তালিম পেয়েছিলাম, যেটা বাবার মৃত্যুর অনেক পরেও *প্রথম পার্থ* করতে গিয়ে কাজে দিয়েছিল। আবার, কাব্যনাটকের এই তালিমের পাশাপাশি *টিকটিকি*-র মতো নাটক করতে গিয়ে একটা সম্পূর্ণ অন্য ঘরানার প্রশিক্ষণ পেয়েছি সৌমিত্রকাকুর কাছে।

নির্দেশক হিসাবে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় খুবই কঠোর। পেশাদার থিয়েটারে যে-যার-মতো অভিনয় করে-যাওয়াটাই যখন নিয়ম ছিল তখন সেই অচলায়তনটাকে ভেঙে দিয়েছিলেন উনি। স্টার থিয়েটারে নাটক করতে গিয়ে দেখেছি, পরবর্তীকালেও দেখেছি, উনি একটাও extra dialogue বলতে দেন না। যদি কিছু পরিবর্তন করার দরকার হয় সেটা মহলার সময়ে করে দেখাতে পার, কিন্তু শো-চলাকালীন কোনো পরিবর্তন উনি বরদাস্ত করেন না। সহ-অভিনেতা যাতে বিপদে না-পড়েন সেটা সবসময় মাথায় রাখতে শিখিয়েছেন উনি। যে-শৃঙ্খলা আমরা গ্রুপ থিয়েটারে দেখতে অভ্যস্ত, সেটা উনি সাধারণ রঙ্গালয়ে আনতে পেরেছিলেন। এটা অত্যন্ত সৌভাগ্যের বিষয় যে, সাধারণ রঙ্গমঞ্চের অন্তিম পর্বে এই শৃঙ্খলাটা এসেছিল। এসেছিল সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের হাত ধরে। কিন্তু তাঁর এত প্রচেষ্টা সত্ত্বেও সাধারণ রঙ্গালয় বন্ধ হয়ে গেল—এটা খুব দুঃখজনক।

আর-একটা বিষয় খুব লক্ষণীয়। সেটা হল, মঞ্চে ও পর্দায় তিনি একসঙ্গেই দাপিয়ে অভিনয় করে যাচ্ছেন! ফেলুদা করতে যে-সূক্ষ্মতাটা দরকার, ঠিক একইরকম সূক্ষ্মতা মঞ্চে প্রয়োগ করলে ভুল হবে। এই দুই মাধ্যমের বিভাজনটা উনি খুব সুন্দরভাবে করতে পারেন। আমি যখন মৃণাল সেন কিংবা অপর্ণা সেনের ছবিতে অভিনয় করছি তখন যে-মাপটাতে অভিনয় করছি, মঞ্চে *মাল্যবান* করার সময়ে সেই মাপটা তো একরকম হবে না! এই মাপের পার্থক্যটা বুঝতে আমাকে খুব সাহায্য করেছেন সৌমিত্রকাকু। আমি দেখেছি কী অসাধারণ দক্ষতায় দু-জায়গাতেই উনি সুন্দরভাবে সাঁতরে যাচ্ছেন! এবং যত বয়স বাড়ছে, তাঁর অভিনয় যেন আরও সূক্ষ্ম হচ্ছে।

টিকটিকি নাটকের পর স্বপ্নসন্ধানীর আর-কোনো প্রযোজনাতেই সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় অভিনয় করেননি এখনও পর্যন্ত। অনেকে প্রশ্ন করতে পারেন—"কেন সৌমিত্রবাবু স্বপ্নসন্ধানীতে নিয়মিত অভিনয় করছেন না?" এর কারণ দুটো। প্রথমত, এখন নির্দেশক হিসাবে আমার একটা জায়গা তৈরি হয়েছে। আমার নিজস্ব ভাবনা, দর্শন, কাজের পরিসর তৈরি হয়েছে। দ্বিতীয়ত, তাঁর মতো বড়োমাপের নির্দেশক-অভিনেতা শুধু একটা দলের ক্ষুদ্র গণ্ডিতে আবদ্ধ থাকতে পারেন না। স্বপ্নসন্ধানীর বাইরেও যে উনি নির্দিষ্ট কোনো banner-এ কাজ করেন তাও কিন্তু নয়। কখনও আয়ন্দা, কখনও সিনেটেল, কখনও

মুখোমুখি, কখনও প্রাচ্য, আবার কখনও মিনার্ভা রেপার্টরি-র প্রযোজনায় তাঁর নাটক মঞ্চস্থ হচ্ছে। আর সেটাই তো স্বাভাবিক! সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় স্বাধীনভাবে নিজের জায়গা বেছে নিয়ে কাজ করবেন—এটাই তো কাম্য।

আমার অভিনয়প্রশিক্ষক সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়কে আমার নির্দেশনায় কাজ করানোর সৌভাগ্যও আমার হয়েছে। *প্রতীক্ষা* বলে একটা নাটকে তাঁর সঙ্গে আমি অভিনেতা হিসাবে রবি ঘোষকেও পেয়েছি। তখন দেখেছিলাম যে, যাঁরা সত্যিকারের বড়ো অভিনেতা তাঁদের ভেতরে কী অসাধারণ শৃঙ্খলাবোধ কাজ করে! এই শৃঙ্খলার ফলেই কৌশিক সেন কিংবা সুমন মুখোপাধ্যায়ের মতো 'বাচ্চা ছেলে'-র নির্দেশনাতেও তাঁরা সমস্ত রকমের সহযোগিতা করতে পারেন। এমনভাবে অভিনয় করেন যেন কিছুই জানেন না! অন্য নির্দেশকের ওপর ছড়ি ঘোরানোর কোনো মানসিকতা অভিনেতা সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের নেই। এটাও একটা দারুণ অভিজ্ঞতা। রবি ঘোষের কাছ থেকেও আমি অবশ্য একইরকম সহযোগিতা পেয়েছি।

এই সবটুকু মিলিয়ে বলতে পারি, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় আমার কাছে একটা institution, আর তাঁর সান্নিধ্য আমার কাছে চোদ্দো-পনেরো বছরের একটা workshop। ওঁর মতো মানুষের সংস্পর্শে আসাটাই একটা সৌভাগ্যের বিষয়। উনি যখনই কবিতা লেখেন তখন গাড়িতে যেতে যেতে সেটা আবৃত্তি করে শোনান। গাড়িতে পাশাপাশি বসে কোথাও শুটিংয়ে গেলেও ওঁর কাছে অনেককিছু শিখে নিই। এই workshop-টা আমার কাছে এক সপ্তাহের একটা সাধারণ workshop-এর চেয়েও অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

কিন্তু পাশাপাশি এটাও বলব যে, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় আমার শিক্ষাগুরু হলেও তাঁর প্রতি কোনো পক্ষপাতিত্ব আমার নেই। আমার এটা কখনও মনে হয়নি যে, অরুণ মুখোপাধ্যায়ের কাছে আমি কিছু শিখব না। এই পক্ষপাতহীনতার ভিত্তিটাও গড়ে দিয়েছেন ওই মানুষটি। সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়।

আলাপচারিতা ও রেকর্ডিং: **অনির্বাণ দে**
অনুলিখন: **অনন্যা দাস, সুজয় মণ্ডল ও অনির্বাণ দে**

MAN OF MANY SEASONS

Ashok Mukhopadhyay

Soumitra Chatterjee has been a wonder of our times. He has defied age to remain vibrantly youthful and has allowed his creative tentacles to reach unexpected frontiers. In one handsome frame of his, Soumitra has been able to accommodate several artistic identities. An actor of extremely high calibre, both in celluloid and on stage, he is also a poet of considerable talent, a deft writer of memoirs, a playwright of great potency, a renowned recitationist and a theatre director par excellence. When do you find such a conglomeration of talent? Rarely, is the answer.

I had my first glimpses of the man in the College Street Coffee House in the late fifties. Those were our undergraduate days, when Soumitra, a postgraduate student, had already shot into stardom with his debut in the famous Ray film *Apur Sansar*, the last of the great Apu trilogy. Soumitra personified Apu with such calm assurance and delicacy that we instantly knew that here was our very own star! Uttam Kumar remained the matinee idol, but Soumitra had become the blue-eyed boy (in films!) of the middle-class urban intelligentsia. Indeed, in the decades that followed the Satyajit–Soumitra combination produced a series of celluloid marvels that won universal acclaim. We were happy that our star had not failed us.

I know very little of the man Soumitra as he is revealed to his film colleagues. But this much I know that he has never been an ivory-towerwala hero who delights in creating a glamour curtain around himself and then hiding behind it. On the contrary, he has been a comrade in the community who has shared the well and the woe of the industry along with his fellow-travellers. In the process, he became the leader of his community, and not just an actor enjoying the milk and the honey. This trait in him led him to the very difficult task of forming an artistes' forum named Abhinetri Sangha, which still remains alive.

This same knack for organisation and respect for collective enterprise inspired Soumitra to patronise, in more senses than one, the publication of one of the most important literary magazines of our time. He was not content with just contributing his writings or helping its finance, he even

looked after the actual running of the journal. That he found time for this proves how genuinely keen he had been about affairs that were not his personal concern.

We in the world of theatre have always had an extra bit of admiration for Soumitra the theatrewala. He has proved to be one of the most significant director-actor-playwrights of our era. But once more, as in films and literature so in theatre, personal achievement has not been the final goal for the man. He has striven beyond. A professional to his boots, Soumitra fought bravely and heroically for the re-establishment of the tradition of good theatre on the public stage. It was a losing battle. The public theatre in Calcutta was decadent and beyond redemption. But that does not take away from the glory of the sensitive artiste lodging a lonely battle against insurmountable odds. The public theatre has nearly collapsed by now. There is no theatre for Soumitra to produce plays regularly. And yet he has not given up. Wonder becomes boundless as we find him still trying to form theatre ensembles, still busy contemplating new productions, still finding time for rehearsal and organisation. The indefatigable energy of the man takes one's breath away.

And yet, one has a lurking belief that it is not just a question of energy. The drive in the man must necessarily have its origin at a deeper level in his psyche. It must have something to do with creative discontent. Soumitra is another name for success. He has everything at his disposal. Professionally he is still at the top. The world around him is agog with admiration, adulation, recognition at the international level. And yet, he refuses to rust and ruminate. He chooses the harder option. He desires to remain living and kicking. So do we desire.

[This essay has been reprinted (with modifications) from the Mukhomukhi Souvenir 2009.]

এক অসাধারণ নাট্যনির্মাতা

মেঘনাদ ভট্টাচার্য

আমাদের সাধারণ রঙ্গালয়ে যাকে অনেকসময় ব্যাবসায়িক অথবা পেশাদার থিয়েটার বলে অভিহিত কথা হয়েছে, সেই থিয়েটারে ক্ষমতাবান অভিনেতা-অভিনেত্রীর খুব-একটা আকাল ছিল না। অভাব ছিল সর্বার্থে আধুনিকমনস্ক নাট্যপরিচালকের—যে-পরিচালক জানবেন কীভাবে থিয়েটারকে meaningful করা যায়, কীভাবে communicable করা যায়, কীভাবে থিয়েটারের সমস্ত বিভাগগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করে unified style আনা যায়। আমার অভিজ্ঞতায়, সাধারণ রঙ্গালয়ে এক এবং একমাত্র সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়কেই আমরা সেই আসনে বসাতে পারি। নাট্যাচার্য শিশিরকুমার ভাদুড়ীর পর তাঁর ভূমিকাতেই সবচেয়ে সমৃদ্ধ হয়েছে বাংলা সাধারণ রঙ্গালয় (একমাত্র উৎপল দত্ত-র মিনার্ভা-পর্ব এবং অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের রঙ্গনা-পর্ব বাদে)।

সাধারণ রঙ্গালয়ের বাইরে সমান্তরাল থিয়েটারে (যাকে আমরা 'গ্রুপ থিয়েটার' বলে অভিহিত করে থাকি, সেখানে) কিন্তু বহু বিদগ্ধ নাট্যপরিচালক কাজ করেছেন যাঁদের দক্ষতা ও বৌদ্ধিক ক্ষমতায় বাংলা থিয়েটার হয়েছে সমৃদ্ধ, উজ্জীবিত। কিন্তু সমান্তরাল থিয়েটারের পরিচালকরা স্বাধীনতা ও পরীক্ষানিরীক্ষার সুযোগ পেয়েছেন, কেন-না সমান্তরাল থিয়েটার ছিল পুরোপুরি অপেশাদার। তাঁদের না-ছিল প্রযোজকের ইচ্ছে-অনিচ্ছের চাপ, না-ছিল কর্মীদের নিয়মিত মাইনে দেবার অঙ্গীকার। থিয়েটারের ব্যাবসা করে আর্থিক লাভ ঘটাতেই হবে—এমন শর্ত কোনো প্রযোজক তাঁদের দেননি, কোনো কর্মীদল বা অভিনেতা-অভিনেত্রীও দেননি; ফলে তাঁরা ছিলেন অনেক স্বাধীন। সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়কে আমরা অনেক বেশি সম্মান করতে বাধ্য এই কারণে যে, তিনি ব্যাবসায়িক রঙ্গালয়ের এই আর্থিক দায়ভারের মধ্যেও সমান্তরাল থিয়েটারের সমমর্যাদার প্রযোজনা সাধারণ রঙ্গালয়ে মঞ্চস্থ করতে সাহসী ও সফল হয়েছেন। সমান্তরাল থিয়েটারের পরিচালকদের মতনই তিনি থিয়েটারে কোনো আপস করেননি—কী বিষয়নির্বাচনে, কী উপস্থাপনায়। সাধারণ রঙ্গালয়ে এইরকম আপসহীন প্রযোজনা একের-পর-এক করে গিয়ে তিনি একইসঙ্গে দর্শক, প্রযোজক, কলাকুশলী ও অভিনেতা-অভিনেত্রীদের মুখে হাসি ফুটিয়েছেন—কাউকে হতাশ করেননি। সমান্তরাল থিয়েটারের পরিচালকদের মতনই সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের প্রিয় বিষয় ছিল সময়, মানুষ ও তজ্জনিত সংকট—দুঃখী ও হেরে-যাওয়া মানুষের প্রতি দায়বদ্ধতা। এই প্রিয় বিষয়ে নাটকনির্বাচনের তাগিদে তিনি বারবার হাত বাড়িয়েছেন বিশ্বের দরবারে—সাধারণ রঙ্গালয়ে হাজির করেছেন ক্লিফোর্ড ওডেট্স, ডুরেনমাট, থর্নটন ওয়াইল্ডার, সাইমন গ্রে, অ্যান্টনি

শ্যাফারের মতন বিশ্বখ্যাত নাটককারদের। তবে সাধারণ রঙ্গালয়ের দর্শকদের কথা ভেবেই নামগুলিকে প্রচারের আলোয় না-রেখে নাটকগুলিকে বঙ্গীয় রূপান্তরে তাঁদের কাছে হাজির করেছেন। এইভাবে বিদেশি ফুল দেশি মাটিতে বপন করার ক্ষেত্রে একমাত্র অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় ছাড়া সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের ক্ষমতাকেও আমাদের স্বীকার করতেই হবে। সাধারণ রঙ্গালয়ের উপন্যাসনির্ভর হওয়ার প্রবণতাকে তিনি নাট্যকারনির্ভর করে তুলেছেন। বিদেশি নাটকের দিকে বারেবারে তাঁকে হাত বাড়াতে হয়েছে। এই কারণে সমান্তরাল থিয়েটারের বিদগ্ধ নাটককারদের সাধারণ রঙ্গালয়ে নাটক দেবার ব্যাপারে অনীহাই ছিল। সাধারণ রঙ্গালয়ে পরিচালক হিসেবে যোগ দেবার আগে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় অভিনেতৃ সংঘের ছত্রছায়ায় তাঁর এই total theatre concept-এর চর্চা শুরু করেছিলেন। ইবসেনের *Ghosts* নাটকের অনুবাদ তিনি যখন মঞ্চে আনেন সেই সময়ে nintinth century-র ইউরোপের পটভূমির set ও costume design-এর মধ্যে কিংবা Scandinavian music ব্যবহারের মধ্যে তাঁর এই পরিচালকসত্তার খোঁজ পাওয়া গিয়েছিল। এই সংঘের জন্য তিনি আবার নির্বাচন করেন ক্লিফোর্ড ওডেট্‌সের *The Big Knife*-এর adaptation *রাজকুমার*—এক চলচ্চিত্র নায়কের উত্থানপতন, বিশ্বাস, আদর্শহীনতা, বিচ্ছেদ, জটিলতা, আত্মহনন, প্রভৃতি নিয়ে এক শিল্পীর যন্ত্রণার ছবি। এই প্রযোজনায় তিনি ব্যবহার করেছিলেন চলচ্চিত্রের clipping যার এমন শিল্পিত ব্যবহার উৎপল দত্ত-র *অজেয় ভিয়েতনাম* কিংবা তরুণ রায়ের *অবতার* ছাড়া নেই; অর্থাৎ যে—আধুনিক দৃষ্টি নিয়ে তিনি থিয়েটারকে দেখতে চান তার চর্চার কাজ শুরু হয়ে গিয়েছিল ১৯৭৮ সনে *নাম জীবন* নাটকে নির্দেশক-অভিনেতা হিসেবে যোগ দেবার আগেই। তাই বোধকরি সাধারণ রঙ্গালয়ে যোগ দিয়েই তিনি আনতে পেরেছিলেন নতুন চিন্তাভাবনা, পরীক্ষানিরীক্ষা, প্রয়োগপদ্ধতির অনুসন্ধান—যা এখানে একরকম ব্রাত্যই ছিল দর্শকের অজুহাতে। সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় একইসঙ্গে আনতে পেরেছিলেন আধুনিকতা এবং maximum level of audience-এর support। নতুন চিন্তাভাবনার সঙ্গে দর্শকদের যে কোনো বিরোধ নেই তা তিনি প্রমাণ করেছিলেন। ১৯৭৮ সনে যখন তিনি পরিচালক-অভিনেতা হিসেবে সাধারণ রঙ্গালয়ে যোগ দিলেন (১৯৬৩-তে *তাপসী*-র অভিনয়ের বিষয়টি এখানে বাদ রাখছি) তখন চলচ্চিত্রে তাঁর তুঙ্গ-জনপ্রিয়তার support হয়তো পেয়েছিলেন, কিন্তু তাঁকে প্রবল লড়াই করতে হয়েছিল সাধারণ রঙ্গালয়ের অ-আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে—কী প্রযোজক, কী কলাকুশলী, কী পুরোনো ধাঁচের অভিনেতা-অভিনেত্রীদের সঙ্গে। কিন্তু সাধারণ রঙ্গালয়েও যে ভালো থিয়েটার মঞ্চস্থ করা যায় সমান্তরাল থিয়েটারের মতন, তা তিনি বারেবারে প্রমাণ করে গেছেন। দর্শকের বোধবুদ্ধির ওপর আস্থা রাখা এবং তাঁদের সম্মান করা—এটাই ছিল তাঁর জোরের জায়গা।

তাঁর vision যে পরিষ্কার ছিল, থিয়েটারের সমস্ত বিভাগের ওপরই যে তাঁর প্রশ্নাতীত দখল ছিল, তার প্রমাণ আমরা পাই তাঁর নির্দেশিত সাধারণ রঙ্গালয়ের প্রথম প্রযোজনা *নাম জীবন*-এই। পর্দা উঠে গেলে চোখের সামনে উদ্ভাসিত হল এক জ্যান্ত বাস্তববাদী বস্তির সেট (সুরেশ দত্ত-র মঞ্চপরিকল্পনায়)—পলেস্তারা-খসা দেয়াল, কল থেকে জল পড়া; দেড়তলার ঘরটা কখনও দৃশ্যমান, কখনও নয়; নানান detail-এর ছড়াছড়ি; ট্রানজিস্টার, টুথপেস্ট, ব্যাট, দাড়ি কামাবার যন্ত্র। এসব ছিল সাধারণ রঙ্গালয়ে নতুন, একেবারে নতুন। ত্যারচা আলোয় সিঁড়িতে রানি (লিলি চক্রবর্ত্তী)-র বসে-থাকা কিংবা বৃষ্টি আসার সম্ভাবনায় আস্তে-আস্তে আলো কমে এসে এক বিশ্বস্ত পরিবেশ তৈরি করা (তাপস সেনের আলোক পরিকল্পনায়); সাধারণ রঙ্গালয়ের প্রথা-অনুযায়ী একমাত্রিক নয়, প্রতিটি চরিত্রই ছিল বহুমাত্রিক—আবেগ, ক্রোধ, পলায়নি মনোবৃত্তি ও সংকটের প্রকাশে ভিন্ন স্বাদের, ভিন্ন মাত্রার।

এরপর বিশ্বরূপায়, রঙমহলে, স্টারে, বিজন থিয়েটারে, তপন থিয়েটারে দেখা গেল একের-পর-এক ব্যতিক্রমী প্রযোজনা—যত্ন, পরিশ্রম আর তাঁর বৌদ্ধিক ভাবনায় সমৃদ্ধ। ডুরেনমাটের *The Visit* সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের রূপান্তরে হল *ফেরা*। *ফেরা* নাটকের পটভূমিরচনাতে তিনি মেদিনীপুরের ভাদু গান, প্রবাদ-প্রবচন, ইত্যাদি ব্যবহার করেছে, এমনকি বিশ্বরূপার ছেঁড়াফাটা উইংস আর দেখতে-পাওয়া আলোর source-গুলোও যেন প্রযোজনার অঙ্গীভূত করে নিয়েছিলেন। 'নষ্ট' বলে চিহ্নিত একটি মেয়ের হঠাৎ ধনী হয়ে প্রাক্তন প্রেমিকের ওপর প্রতিশোধের নাট্যরচনায় তিনি যেন গ্রিক ট্র্যাজেডির আদল এনেছিলেন। এই বিশ্বরূপাতেই হল সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের *ন্যায়মূর্তি* (এটাই সাধারণ রঙ্গালয়ে তাঁর শেষ নির্দেশনার কাজ)—এক ন্যায়পরায়ণ পুলিশ অফিসারের বিচারব্যবস্থার ওপর আস্থা-না রেখে নিজেই দায়িত্ব নেওয়ার এক আলেখ্য। প্রায় ষাটজন শিল্পীকে ব্যবহার করেছিলেন সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়—যা সাধারণ রঙ্গালয়ের জন্য এক অসম্ভব ঘটনা। তিনি প্রতিটি শিল্পী—যদি তার এক মিনিটেরও কাজ হয়—সমান যত্ন নিয়েছিলেন। সেই সম্মিলিত অভিনয়ও এক দৃষ্টান্ত হয়ে রয়েছে সাধারণ রঙ্গালয়ের ক্ষেত্রে।

সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাটক *নীলকণ্ঠ* তাঁরই নির্দেশনা ও অভিনয়ে দেখা গিয়েছিল রঙমহলে। রঙমহলের ঘূর্ণায়মান মঞ্চটিকে যে-ব্যতিক্রমী ব্যবহারে তাঁর প্রযোজনার অঙ্গীভূত করেছিলেন, একমাত্র উৎপল দত্ত-র *টিনের তলোয়ার* ব্যতীত ঘূর্ণায়মান মঞ্চের এমত ব্যবহার বাংলা রঙ্গমঞ্চে আর হয়নি। মুখ্য চরিত্র নীলকণ্ঠ-র ভূমিকায় সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় এক আশ্রিত নিঃসঙ্গ মানুষের চরিত্রচিত্রণে ব্যঙ্গ ও পীড়নের যে-মেলবন্ধন ও শরীরে প্রকাশ করেছিলেন তা এক কথায় অনবদ্য। বিশেষত ধীরে-ধীরে মদ্যপ হয়ে-যাওয়ার দৃশ্যটিতে তাঁর পরিমিত ও বৈজ্ঞানিক অভিনয়ে যে-মাত্রা তিনি যোগ করেছিলেন, যেভাবে

তিনি নীলকণ্ঠ-র আত্মাকে ধীরে-ধীরে দর্শকের কাছে উন্মোচিত করছিলেন—কী বাচনে, কী আঙ্গিকে, সারা শরীর জুড়ে—তার তুলনা একমাত্র সাধারণ রঙ্গালয়েই *কোথায় পাব তারে* নাটকে সত্য বন্দ্যোপাধ্যায় (বড়ো)-এর অভিনয় ছাড়া আমার অন্তত আর দেখা নেই। থর্নটন ওয়াইল্ডারের *The Matchmaker* নাটকটি সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় *ঘটক বিদায়* নামে করেছিলেন স্টারে, পরে বিজন থিয়েটারেও। একটি বিশুদ্ধ কমেডি—চার জুটির ইচ্ছাপূরণের নাটক। কিন্তু সমকালীন রাজনীতি আর সামাজিক বৈষম্যের প্রতি কৌতুকের কুঠারাঘাত করেছিলেন তিনি। এ-নাটকে রবি ঘোষের পাশাপাশি তিনিও মঞ্চে প্রমাণ রেখেছিলেন কমেডি-অভিনয়ে তিনি কতটা সিদ্ধহস্ত।

তপন থিয়েটারে দেখেছি *দর্পণে শরৎশশী*। সম্ভবত এই প্রথম সাধারণ রঙ্গালয়ে তিনি মনোজ মিত্র-র মতন একজন নাট্যকারের নাটক পেলেন। তপন থিয়েটারের ছোটো মঞ্চটিতে একশো বছর আগেকার জমিদারবাড়ি, নাটমণ্ডপ, বাগান, বারান্দা, ফোয়ারা, দেউড়ি, প্রভৃতি বিশ্বস্তভাবে আনতে সাহায্য নিয়েছিলেন আমাদের বাংলা থিয়েটারে মঞ্চচিত্রণের প্রবাদপুরুষ খালেদ চৌধুরীর। এখনও মনে আছে এ-নাটকে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের *বিল্বমঙ্গল ঠাকুর* থেকে অভিনয়, আর বাসবী নন্দী আর লাবনী সরকারের অভিনয়। সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে যে-সংগত তাঁরা মঞ্চে করেছিলেন তাতে সময়, চরিত্র, পরিবেশ, সমাজ—সবকিছু বড়ো জ্যান্তভাবে আমাদের কাছে প্রকাশিত হয়েছিল। বড়ো সুন্দর আলো করেছিলেন তাপস সেন এই প্রযোজনায়।

সাধারণ রঙ্গালয়ে একটি ফরাসি আদলে *স্ল্যাপস্টিক* কমেডি দেখেছি শেখর চট্টোপাধ্যায়ের *জজসাহেব*, বিজন থিয়েটারে। এই অনবদ্য কাজটি দর্শক ততটা গ্রহণ না-করলেও (সাধারণ রঙ্গালয়ে যে-ধরনের কমেডি নাটক দেখতে তাঁরা অভ্যস্ত ছিলেন, এটি ছিল তার থেকে ব্যতিক্রমী—এক শিল্পিত বুদ্ধিদীপ্ত কমেডি) এর রেশ থেকে গিয়েছিল অনেক নাট্যামোদীর মনে। ঠিক তেমনই এক বুদ্ধিদীপ্ত পরিশীলিত স্ল্যাপস্টিক দেখেছি সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের *চন্দনপুরের চোর*। হয়েছিল বিজন থিয়েটারেই। এখানেও এক দামাল কমেডিয়ান অনুপকুমার এলেন সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে। প্রতিটি দৃশ্যে অনুপকুমারকে নির্দিষ্ট অভিনয়ে বেঁধে-রাখা বড়োই শক্ত কাজ। কিন্তু এ-অসম্ভবকে সম্ভব করেছিলেন সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়—বিশেষত তাঁদের দুজনের একসঙ্গে অভিনয়ের জায়গাগুলো কখনও লাগামছাড়া হতে দেননি। এই *চন্দনপুরের চোর* নাটক *জজসাহেব*-এরই মতন সাধারণ রঙ্গালয়ের দর্শকদের কতটা খুশি করেছিল, সন্দেহ আছে। কিন্তু বঙ্গনাট্যসংহতির জন্য একটা সাহায্য-অভিনয়ে রবীন্দ্রসদনে এই নাটকের একটি অভিনয়ের সাক্ষী ছিলাম। সমস্ত রবীন্দ্রসদন প্রেক্ষাগৃহ যেন ফেটে পড়ছিল হাসি আর উচ্ছ্বাসে। সেই হাসির তোড়ে অভিনেতাদের

মাঝেমধ্যেই অভিনয় সাময়িকভাবে থামিয়ে রাখতে হচ্ছিল—হাসির তোড়ে সংলাপ শোনা যাবে না বলে! সেদিনের অভিনয়ে বোধহয় পনেরো মিনিট বেশি সময় লেগেছিল তিন চোরের আখ্যানটি পুরোপুরি অভিনয় করতে!

ন্যায়মূর্তি-র পর যখন সাধারণ রঙ্গালয়ের প্রায় সবকয়টি মঞ্চ বন্ধ হয়ে গেল, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়কে সমান্তরাল থিয়েটারেই প্রযোজনা আনতে হল, কেন-না মঞ্চে অভিনয় ছাড়া তিনি জীবনধারণ করবেন তা তাঁর কল্পনার বাইরেই ছিল। যেহেতু তিনি সাধারণ রঙ্গালয়ে সমান্তরাল থিয়েটারের উপযুক্ত প্রযোজনাই করে এসেছেন এতদিন, তাই সমান্তরাল থিয়েটারের দর্শকরাও তাঁকে সাদরে গ্রহণ করলেন। তার সঙ্গে যুক্ত হলেন বন্ধ-হয়ে-যাওয়া সাধারণ রঙ্গালয়ের দর্শককুলও। অ্যান্টনি শ্যাফারের *Sleuth* নাটক *টিকটিকি* নাম দিয়ে শুরু করলেন কৌশিক সেনের সঙ্গে। এই নাটকটি নাকি একবার উৎপল দত্ত ও উত্তমকুমার করবেন বলে ভেবেছিলেন। অভিজাত বনাম সাধারণ মানুষের খেলায় সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের যোগ্য সংগত করলেন কৌশিক। অভিজাত মঞ্চসজ্জা, সংগীত, আলো, অভিনয়—এক কথায় চমকপ্রদ। বারবার দেখার নাটক হয়ে উঠেছিল সেটা। এখানে বলি, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের যাবতীয় প্রযোজনায় সংগীতের ব্যাপারটা দেখতেন তিনি নিজেই। তাঁর আবহসংগীতে সত্যজিৎ রায়ের সংগীতের কিছু প্রভাব ছিল; ফলে নাটকে তাঁর সংগীতপ্রয়োগ একটু অভিনব ছিল তো বটেই, একটু যেন চলচ্চিত্রঘেঁষাও ছিল।

এরপর তিনি সমান্তরাল থিয়েটারে পরপর করে গেলেন সাইমন গ্রে-র *Life Support—প্রাণতপস্যা* নামে। জটিল মানবসম্পর্ক। চেতনাহীন নষ্ট সম্পর্ককে বাঁচাবার লড়াই। সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের পাশাপাশি এ-নাটকে বড়ো ভালো অভিনয় করলেন দ্বিজেন বন্দ্যোপাধ্যায়। এই দুই অভিনেতার undertone acting-এ প্রযোজনাটি গভীর ও মনস্তাত্ত্বিক হয়ে উঠেছিল। শেষের দিকে দর্শকের নিশ্বাস প্রায় বন্ধ হয়ে যায়—এমন দম-বন্ধ-করা পরিবেশের সৃষ্টি হয় মঞ্চে।

লিলিয়ান হেলম্যানের *The Little Foxes* সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের রূপান্তরে এল *আরোহণ* নামে। তিন ভাইবোনের উচ্চাকাঙ্ক্ষা এই নাটকের বিষয়। এ-প্রযোজনায় সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় আনলেন পুরোনো থিয়েটারের অভিজাত্য। যা ছিল সাধারণ রঙ্গালয়ের প্রাণ, সেই অভিনয়-উৎকর্ষ ও আবেগ-ধর্মিতায় এই প্রযোজনার বুনোট। এই নাটক দেখে ফেলে-আসা সাধারণ রঙ্গালয়ের যা কিছু ভালো তা যেন নতুন করে খুঁজে পাওয়া গেল।

এরপর এক মৌলিক নাটক—অমিতরঞ্জন বিশ্বাসের *হোমাপাখি*। মনোবিজ্ঞানী যখন মনোরোগের শিকার হন, তারই আখ্যান এ-নাটক। সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের এ-নাটকের অভিনয়ে এক দার্শনিক intelectual ব্যাখ্যা আমরা দেখতে পেলাম। এ এক অন্য সৌমিত্র

চট্টোপাধ্যায়। বয়স মানেই যে ফুরিয়ে যাওয়া নয়, এ-নাটকে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়কে দেখে আমরা বুঝতে পারলাম। এই *হোমাপাখি* থেকে যেন শুরু হল এক ট্রিলজি—*হোমাপাখি*, *আত্মকথা*, আর *তৃতীয় অঙ্ক, অতএব*। সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের বিদগ্ধতা, wisdom acting, এবং সর্বোপরি তাঁর vision এই তিনটি প্রযোজনায় পরপর এল ঠিক যেন এক যোগসূত্রে। আশ্রয় করলেন ব্যক্তিচরিত্রকে, কিন্তু বর্ণনা করলেন সময়সংকট আর সংগ্রামকে। এ এক শিল্পীর মর্মবাণী—যা কিনা পৃথিবীর সমস্ত সৃজনশীল শিল্পীর মর্মকথা। সৃজনশীল মানুষ হিসেবে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় এই ট্রিলজিতে নিয়ে এলেন তাঁর নিজস্ব কথা—কখনও objectively, কখনও subjectively। *তৃতীয় অঙ্ক, অতএব*-এ দর্শক ব্যক্তি সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের জীবন খুঁজতে এসে পেলেন এক দর্শন—এক শিল্পীর দর্শন, তাঁর জীবনবেদ। *হোমাপাখি* থেকে যার শুরু তা যেন পরিপূর্ণ হল *তৃতীয় অঙ্ক, অতএব*-এ।

নাম জীবন থেকে *তৃতীয় অঙ্ক, অতএব* এক শিল্পীর বিবর্তনের ইতিহাস, যা আমরা প্রত্যক্ষ করলাম। মধ্যিখানে দুটি ছোটো নাটক করেছেন সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়—মাইকেল ডাইন্‌স থেকে *কুরবানি* আর জোসেফ কনরাড থেকে *আর একটি দিন*। আমার সৌভাগ্য, দেখেছি সবই—*নাম জীবন* থেকে *তৃতীয় অঙ্ক, অতএব*। এ বিরল সৌভাগ্যের জন্য আমি গর্বিত।

যে total theatre-এর concept নিয়ে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় কাজ করেছেন তাতে moment of truth-কে মঞ্চে অভিনয়ে ও প্রযোজনায় সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছেন তিনি। এই বিশ্বাসযোগ্যতা তাঁর প্রযোজনার অঙ্গে-অঙ্গে জড়ানো থেকেছে। কী অভিনয়, কী blocking, কী composition, কী picturisation—প্রতিটি ক্ষেত্রেই, প্রতিটি detail-এই এই justification; অর্থাৎ তিনি অজান্তে কিছু করেননি, অবহেলায় কিছু করেননি—থিয়েটারের প্রতিটি department-এর প্রতিই তাঁর আছে গভীর আগ্রহ, অনুসন্ধিৎসা, এবং অবশ্যই প্রয়োজনীয় দখল। নিজের এবং সহ-অভিনেতাদের প্রতিটি অভিনয়, প্রতিটি movement-এর পেছনে তাঁর homework থাকে; থাকে পরিচালক হিসেবে তাঁর নিজস্ব ব্যাখ্যা—যা একান্তই তাঁর নিজস্ব ভাবনাচিন্তার ফসল। একইসঙ্গে তিনি সবসময় সচেতন থাকেন যে, সহশিল্পীরা যেন মঞ্চে সমান মর্যাদা পান। কখনোই একা মঞ্চ দখল করার প্রবণতা তাঁর কোনো প্রযোজনাতেই আমরা দেখতে পাইনি। তিনি জানেন, দর্শকের কাছে তিনিই প্রধান আকর্ষণ; তবু তাঁর প্রযোজনায় সহশিল্পীদের যে-বিকাশ আমরা দেখেছি তা সত্যিই অভূতপূর্ব। থিয়েটারকে অমোঘ করে তুলতে, meaningful করে তুলতে পরিচালক হিসেবে তাঁর প্রচেষ্টা তাঁর অভিনেতৃসত্তাকে ছাড়িয়ে এক ধাপ এগিয়ে থেকেছে চিরকাল।

পরিচালক হিসেবে তিনি বোঝেন যে, প্রতিটি ভালো প্রযোজনার পেছনে থাকে একটি সুশৃঙ্খল back stage। তাঁর প্রযোজনার back stage-এর প্রতিটি বিভাগই তাঁর পূর্বনির্দিষ্ট সময় ও সূচি মেনে চলেছে চিরকাল। বিজন থিয়েটারে তিনি যখন প্রযোজনা করছেন, তা প্রত্যক্ষ করার সৌভাগ্য হয়েছে আমার। তিনি নিজে অভিনয়ের দিন কমপক্ষে দু-ঘণ্টা আগে চলে আসতেন। প্রতিদিন সেট, মিউজিক, লাইটের ব্যবস্থা নিজে দাঁড়িয়ে তদারকি করতেন—সে-প্রযোজনা শতরজনি অতিক্রম করলেও! চলচ্চিত্রের ব্যস্ততম শিল্পী হয়েও তিনি কোনোদিন থিয়েটারে গরহাজির থাকেননি। মঞ্চের ওপর পূর্বনির্দিষ্ট নয় এমন কিছু করেননি, সহ-অভিনেতাদেরও করতে allow করেননি পরিচালক হিসেবে। তাঁর প্রযোজনায় মঞ্চে দর্শক যা দেখতেন তার পেছনে থাকত এক পরিশ্রমী মহড়া, যেখানে নির্দিষ্ট হয়ে যেত সবকিছু। তার বাইরে কোনোকিছু করার অনুমতি কারুর ছিল না, এমনকি তাঁরও নয়। অর্থাৎ সমান্তরাল থিয়েটারের যে-নিয়মনীতি ও শৃঙ্খলা, তা তিনিই একমাত্র হাতেনাতে প্রয়োগ করেছিলেন সাধারণ রঙ্গালয়েও। এমনকি দর্শকদের নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারেও তাঁর নির্দেশ থাকত; অভিনয়ের আগে সেটা ঘোষণাও করা হত।

থিয়েটারের প্রতি আবাল্য প্রেম, নাট্যাচার্য শিশিরকুমারের সান্নিধ্যলাভ, বড়োমাপের অভিনয় দেখার সুযোগ, অন্যান্য শিল্পমাধ্যমের প্রতি গভীর আকর্ষণ ও সন্ধান, সাহিত্যপাঠ, এবং নাট্যবিষয়ক পড়াশুনা—এই সবকিছুই সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়কে নাট্যনির্মাণে প্রেরণা দিয়েছে, যোগ্যতর করে তুলেছে। তিরিশ বছরেরও বেশি সময় ধরে তিনি মূলত সাধারণ রঙ্গালয়ে এবং তার পরবর্তী সময়েও নাটকের কাজ করেছেন। ক্রমেই তিনি বাংলা থিয়েটারের এক অসাধারণ নাট্যনির্মাতা ও অভিনেতা হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। তাঁর এই সৃজনশীল নাট্যনির্মাণে প্রাতিষ্ঠানিক সাহায্য তিনি কিন্তু কখনও পাননি; এমনকি সাধারণ রঙ্গালয় যখন বন্ধ হয়ে গেল তখনও কেউ কিন্তু এগিয়ে এসে তাঁর হাতে একটি রঙ্গমঞ্চ তুলে দিয়ে বলেননি—"বাকি জীবনটা আপনি এখানে আপনার প্রিয়তম কাজটি করুন। নাটকের কাজ। নিশ্চিন্তে। পরমানন্দে।"

অভিনয়ের জাদুকর সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়

সুরেশ দত্ত

সৌমিত্রবাবুর সম্বন্ধে কিছু লেখা আমার পক্ষে খুবই দুঃসাহস। দীর্ঘদিন ধরে তাঁর সঙ্গে কাজ করার সূত্র ধরে সেই অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে আমি তাঁর সম্বন্ধে কিছু লেখার চেষ্টা করছি। অতীতে তাঁর সঙ্গে আমি এবং স্বর্গীয় তাপসদা যে-কাজগুলি করেছিলাম সেগুলি সবই ছিল প্রসেনিয়াম থিয়েটারের নাটক ও পুতুলনাটকের উপর ভিত্তি করে। এক কথায় যদি আমি বলতে চাই, আমাদের কাজগুলি ছিল সবই চরম পেশাদারির নিদর্শন।

পেশাদার এইজন্যই যে, তখনকার সময়ে আনুমানিক পাঁচ-ছয়ের দশকে পেশাদার রঙ্গমঞ্চগুলিতে—যেমন স্টার, রঙমহল, শ্রীরঙ্গম (বিশ্বরূপা) প্রভৃতিতে—প্রতি শনিবার, রবিবার ও বৃহস্পতিবার এবং ছুটির দিনে দু-তিনটি করে নাটকের শো হত, এবং গ্রামগঞ্জ থেকে তা লোকে দেখতে আসত।

কিন্তু তার কিছুদিন পরে যখন পেশাদার রঙ্গমঞ্চগুলি ঠিক চলছিল না এবং দেশও যখন বহুবিধ সমস্যায় জর্জরিত ছিল, তখন পেশাদার রঙ্গমঞ্চগুলিতে চলচ্চিত্রের শিল্পীদের আবির্ভাব ঘটতে লাগল এবং কিছু বিকৃত রুচির নাটক অনুষ্ঠিত হতে লাগল।

সেই সময়ে অপেশাদার গ্রুপ থিয়েটারগুলির—যেমন নিমু ভৌমিক-দের শৌভনিক, সবিতাব্রত দত্ত-র রূপকার, শম্ভু মিত্র-র বহুরূপী, অজিতেশ ও রুদ্রপ্রসাদের নান্দীকার, পার্থপ্রতিম ও মনোজের সুন্দরম, উৎপল দত্ত-র পিএলটি ইত্যাদির—অবস্থাও স্বস্তিদায়ক ছিল না।

সেইরকম একটি সময়ে নাটকের সৎ উদ্দেশ্যে ও তার পুনরুজ্জীবন করতে কাশী বিশ্বনাথ মঞ্চে শুরু হল সৌমিত্রবাবুর লেখা ও অভিনীত এবং হরিদাস সান্যালের প্রযোজিত নাটক *নাম জীবন*। এই নাটকের নায়িকার চরিত্রে ছিলেন চলচ্চিত্রাভিনেত্রী লিলি চক্রবর্ত্তী এবং নীলিমা দাস। এঁরা চলচ্চিত্র থেকে এলেও নাটকেও এঁদের দক্ষতা প্রশংসাতীত। সৌমিত্রবাবুর নাটকগুলিতে প্রধান চরিত্রের পাশেপাশে অপ্রধান বা ছোটো-ছোটো চরিত্রগুলোও খুব সুন্দরভাবে যথাযোগ্য গুরুত্ব-সহকারে প্রস্ফুটিত হতে দেখা গেছে। তিনি একাধারে আবৃত্তিকার, কালজয়ী চলচ্চিত্রশিল্পী তথা বাংলা চলচ্চিত্রের স্বর্ণযুগের অসামান্য কিংবদন্তি নায়ক, কবি, আবার অন্যদিকে সুদক্ষ নাট্যশিল্পী, নাট্যপরিচালক, নাট্যকার, নাট্যসচেতক এবং নাট্যপ্রেমীও বটে।

নাম জীবন নাটকের আলোর দায়িত্বে ছিলেন স্বর্গীয় তাপস সেন। তাপসদা ও বিশেষ করে সৌমিত্রবাবুর কাছ থেকে এবং এই নাটক থেকে আমি যেটা জেনেছি সেটা হল নাটকের টেবিলওয়ার্কের মাধ্যমে কীভাবে একটি নাটককে সুন্দর করে তোলা যায় তার কৌশল।

এবার স্বভাবতই প্রশ্ন জাগতে পারে যে, নাটকের টেবিলওয়ার্ক কী? এর উত্তরে বলা যায় যে, নাটকের খুঁটিনাটি জিনিসগুলোতে—যেমন ঝুরঝুরে ভাঙা দেয়ালে ঘুঁটে, পুরোনো টিনের চাল, প্রভৃতিতে—এমন দৃশ্যপর্বের অবতারণা করতেন যাতে করে দর্শকেরা মনে-মনে নিজেরাই ওই পরিবেশ এবং চরিত্রের সঙ্গে একাত্ম হতে পারে। দৃশ্য, চরিত্র ও তার সংলাপ, শব্দ, এবং আলোর সংমিশ্রণে যে-মায়াজাল প্রসেনিয়াম থিয়েটারে ও সেলুলয়েডের পর্দায় সৌমিত্রবাবু সৃষ্টি করেন তা আজও দর্শকের দৃষ্টিকে তীক্ষ্ণভাবে আকৃষ্ট করে এবং শ্বাসনালিকে বন্ধ করে পুনরায় তাকে আনন্দের সঙ্গে প্রস্ফুটিত করে।

উৎপল দত্ত একজন বিখ্যাত নাট্যকার, নাট্যপরিচালক, নাট্যশিল্পী ও নাট্যপ্রেমী। তিনি সারা পৃথিবীর বহু নাট্যপরিচালকের কাজ দেখেছেন এবং বই পড়েছেন। তিনিও সৌমিত্রবাবুর মতোই নাটক করার আগে নাটকের টেবিলওয়ার্ক করতেন।

শিশির ভাদুড়ীর মতো মহান অভিনেতার অভিনীত কয়েকটি চরিত্র আমি মঞ্চে দেখেছি। তিনি তাঁর নাটকের মহলাও আমাকে দেখার আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। তিনিও সেই টেবিলওয়ার্ককে কেন্দ্র করেই কাজ করতেন। তাই আজও সৌমিত্রবাবুর বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয়ের দক্ষতা, কর্মকুশলতা, পরিবেশনার ভাব ও ভাবনা, ইত্যাদি সকল দর্শকের মনকে পরিতৃপ্তভাবে রসে ভরিয়ে তুলতে পারে বলে আমার বিশ্বাস। তাই আমার মনে হয়, সৌমিত্রবাবু, উৎপল দত্ত এবং শিশির ভাদুড়ীর মতো মহান নাট্যকার ও নির্দেশক আজ বিরল।

এবার জানাই সৌমিত্রবাবুর সঙ্গে আমার আত্মার আত্মীয়ের মতো কাজ করার এক দৃষ্টান্ত। তখন আমি কাজ করছি সিপিটি-র *রামায়ণ* ও *সীতা* নিয়ে এইচএমভি স্টুডিয়োতে। তখন রেকর্ডিং করার স্টুডিয়ো ছিল মাত্র দুটো, যথা—দমদমের এইচএমভি স্টুডিয়ো এবং ভবানীপুরের পূর্ণ সিনেমার সামনে প্রসাদ রেকর্ডিং স্টুডিয়ো।

তিনটি মাইক আছে। একটি মাইকের সামনে আছেন সৌমিত্রবাবু—রামের ভূমিকায়; আর-একটি মাইকের সামনে আছেন বিকাশ রায়—বাল্মীকির ভূমিকায়; এবং অন্য মাইকটির সামনে আছেন গৌরী ঘোষ—সীতার ভূমিকায়।

স্ক্রিপ্ট ধরে আছেন লেখক মোহিত চট্টোপাধ্যায়। তিনি প্রত্যেককে তাদের চরিত্রগুলো

ভালো করে বুঝিয়ে দিচ্ছিলেন। সৌমিত্রবাবুকে আমি বুঝিয়ে দিলাম যে, আমরা যেরকম নাটক করি প্রসেনিয়াম থিয়েটারে, এখানে সেরকম মানুষ নেই; তার বদলে রামের চরিত্রে অভিনয় করছে একটি নিষ্প্রাণ পুতুল।

এখানে এক দৃশ্যে রাম গুরুদেব বাল্মীকিকে কিছু বলবেন। সেই দৃশ্যে রামের মাংসপেশির অনুভূতি, চোখ-হাত-পা-কানের নড়াচড়া ও চলাফেরার সঙ্গে সৌমিত্রবাবুকে এমনভাবে সংলাপ বলতে হবে যাতে রামের চরিত্রের ভাব ও রস সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর হয়ে ফুটে ওঠে। তাঁকে আমি একবার ভালো করে বুঝিয়ে দিলাম। কিন্তু আশ্চর্য হয়ে গেলাম, আমার আর উপস্থিত সকলের মনের চাহিদাকে ছাপিয়ে তিনি রামের সংলাপ এমনভাবে বললেন যেন পুতুল রাম তাঁর হৃদয়ের ভক্তিভরা মধুর কণ্ঠে বাল্মীকিকে বলছেন।

মোহিতদাও স্তম্ভিত হয়ে গেলেন যে, একবারও রিহার্সাল না-করেই উনি কী সুন্দরভাবে রাম চরিত্রের সংলাপ প্রস্ফুটিত করলেন। সবাই যাঁরা কাছে ছিলেন, একসঙ্গে তাঁরা করতালি দিয়ে উঠলেন। মনে হল, যেন সত্যিকারের নিশ্চল পুতুলের ভেতর থেকে সংলাপ বেরিয়ে এল!

বসে ছিলেন সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়, পার্থ ঘোষ, প্রমুখ। আমি বললাম, "আমি ঠিক এই জিনিসটাই চেয়েছিলাম। এবার আমরা টেক করব।" সঙ্গেসঙ্গে যিনি টেক করছিলেন তিনি বলে উঠলেন, "অদ্ভুত, অদ্ভুত! আমাদের ফাইনাল টেক করে নিয়েছি।" তখন যাঁরা রেকর্ডিং রুমে উপস্থিত ছিলেন, যেমন বিকাশ রায়ও বললেন, "তুমি এমন একজনকে নিয়েছ যিনি যে-কোনো চরিত্রে মিলেমিশে একাকার হয়ে যান। আমি তো ওঁর সঙ্গে সংলাপ বলতে ঘাবড়ে যাচ্ছি! সব চরিত্রেই তো আমি সবার সঙ্গে হাসিমুখে পেছনে অভিসন্ধিমূলক সংলাপ বলেছি। আমি তো সারাজীবন সেলুলয়েডের পর্দায় খলনায়কের ভূমিকায় অভিনয় করে হাততালি কুড়িয়েছি। সৌমিত্র নিজেই তো একজন রাম! আর আমাকে তুমি একজন জ্ঞানী-গুণী-সংযমী মহর্ষি বাল্মীকির ভূমিকায় সংলাপ বলতে বলছ ওঁর সঙ্গে? রাম হয়ে এক্ষুনি যে-সংলাপটা বললেন সৌমিত্রবাবু, আর-একবার উনি সেটা বললে আমি সেই সংলাপের সঙ্গেসঙ্গে আমার সংলাপও বলে যাব। তাহলে আমি খুব সহজসরলভাবে করতে পারব। তার আগে, সুরেশ, তুমি একটু আমার চরিত্রটা করে দেখাও।"

আমি বললাম, "আপনি করুন-না, আপনি ঠিক পারবেন।" বিকাশদা বললেন, "সৌমিত্র সৌমিত্রই, আমার বেলা একবারে হবে না। তুমি বরং একবার করেই দেখাও।" মোহিতদা ফিশফিশ করে ডায়ালগ বলতে লাগলেন, আর আমি সংলাপ বলতে শুরু করলাম।

একটুখানি এগিয়েছি, হঠাৎ বিকাশদা আমাকে বলে উঠলেন, "সাধু, সাধু! তুমি নাটক করছ না কেন?"

সৌমিত্রবাবু বললেন, "সুরেশকে আমি অনেক কাজের ভেতর দিয়ে দেখেছি। ও কেন প্রসেনিয়াম থিয়েটারের নাটকে আসে না?" আমি বললাম, "আমি যখন থেকে পুতুলনাটককে নতুন রূপ দিয়ে ঐতিহ্যবাহী করে তোলার চেষ্টা করছি,তখন থেকে সৌমিত্রদার মতো একজন ঋষিতুল্য মানুষ এবং আরও অনেক জ্ঞানীগুণী লেখক ও নাট্যশিল্পীর উপস্থিতিতে এই প্রচেষ্টা বিশেষ ঐতিহ্যবাহী ও নতুন রূপ নিয়ে উপস্থিত হয়েছে। বিশেষ করে কৃতজ্ঞতার সঙ্গে বলি, উনি যখন রাজি হয়েছেন, ওঁর সঙ্গে চলচ্চিত্র- ও থিয়েটারজগতের বিশিষ্ট শিল্পীরা এগিয়ে এসেছেন। তাঁরা আমাকে এই নতুন ধরনের কাজ করার অনুপ্রেরণা জুগিয়েছেন এবং কাজকে কত সুন্দরভাবে মর্মস্পর্শী করে স্থাপন করা যায় তার পরামর্শও দিয়েছেন। তখন স্বভাবতই আমি আমার এই শিল্পপ্রয়াসের ভাবী সফলতার কথা মনে করে এগিয়ে চলেছি।"

অনুরোধ করেছিলাম আমার পুতুলনাটকের এই সফল উপস্থাপনার জন্য সমস্ত জ্ঞানীগুণী কলাকুশলীকে তাদের যথাযথ পারিশ্রমিক নিতে; কিন্তু কোনো কলাকুশলী এতে রাজি হননি। এই নাটকের মুখ্য কলাকুশলীদের মধ্যে ছিলেন সৌমিত্রবাবু, বিকাশদা, সত্যদা, রবীনদা, গৌরী ঘোষ, পার্থ ঘোষ, দেবরাজ রায়, গীতা দে, কুমার রায়, জোছন দস্তিদার, কৌশিক সেন, বৃন্দা সেন, প্রমুখ। এঁরা কেউই কিন্তু এই কাজ করার জন্য কোনো অনীহা প্রকাশ করেননি, বরং উৎসাহ ও প্রেরণা জুগিয়েছেন। তাঁরা বলেছেন, "না সুরেশ, যেখানে সৌমিত্রদা, মোহিতদা, খালেদদা, তাপসবাবু এবং তুমি রয়েছ, তাঁরা যখন নিজের ইচ্ছায় এসেছেন, তাই আমরাও এসেছি। বরং তুমি যে আমাদের ঐতিহ্যবাহী পুরোনো দিনের পুতুলনাটকে একবার করে স্থান দিয়েছ এবং তার বিশাল উন্নতিসাধন করেছ তাতেই আমরা মোহিত ও যারপরনাই খুশি।" তাই, আমি মনে করি, এখানেই আমার পাপেট সার্থক।

শেষে আর-একটা কথা বলি। আমি বেনারসে *সীতা*-র শো করতে গেছি ২০০৮ সালে, নামদীন স্কুলে। বিরাট স্কুল। প্রায় তিন-চারহাজার ছাত্র। শো শেষ হওয়ার পর একজন বয়স্কা ভদ্রমহিলা ও তাঁর স্বামী তাঁদের নাতিকে সঙ্গে নিয়ে স্টেজে এলেন। ভদ্রমহিলা একটা ইংলিশ-মিডিয়াম স্কুলের প্রিন্সিপাল ছিলেন, আর ভদ্রলোক সংবাদপত্রে ফ্রিল্যান্স লিখতেন।

ভদ্রমহিলা মঞ্চে এসে হন্তদন্ত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, "পরিচালক কোথায়?" আমি বললাম, "আমিই সুরেশ দত্ত, পরিচালক।" উনি আমার গালে হাত দিয়ে চুমু খেলেন এবং

মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করলেন। তারপর বললেন, ''রাম কোথায়? তাঁকে আমি প্রণাম করব।'' আমি বললাম, ''এই যে রাম, বাক্সের উপর রাখা আছে। এটাকেই আমরা অভিনয় করিয়েছি এখান থেকে।'' ভদ্রমাহিলা বললেন, ''এটা তো একটা পুতুল! গ্রিন রুম কোথায়? আমাকে দেখান। আমি গ্রিন রুমে গিয়ে রামের চরণধূলি নেব।'' তখন ভদ্রমহিলার স্বামী—সেই ভদ্রলোক—এবং তাঁর নাতি একসঙ্গে বলে উঠলেন, ''সিংহ ও সিংহী কোথায়?'' আমার ছাত্র জগমোহন মণ্ডল পুতুলগুলি সুন্দর করে গোছাচ্ছিলেন। তিনি পিছন থেকে বললেন, ''সিংহ-সিংহী বাক্সে উঠে গেছে।''

তখন ভদ্রলোক বিস্ময় প্রকাশ করে বললেন, ''সিংহ কী-করে বাক্সে থাকবে? সে তো থাকবে খাঁচায়!'' জগমোহন বললেন, ''না।'' তখন বাক্স খুলে তাদের সিংহ-সিংহী দেখানো হল। তাঁরা বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলেন। ভদ্রমহিলা বললেন, ''এও কি সম্ভব? রামের অভিনয় কে করেছে? আমি তো দেখলাম, একজন মানুষ বুঝি রামের ভূমিকায় অভিনয় করছে। কে তিনি?'' আমি বললাম, ''উনি বাংলার বিখ্যাত অভিনেতা সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়। আপনি বিখ্যাত পরিচালক সত্যজিৎ রায়ের *অপুর সংসার* দেখেছেন?'' ভদ্রমহিলা বললেন, ''আমি দেখিনি, তবে আমার স্বামী দেখেছেন।'' ভদ্রলোক বললেন, ''ও, উনিই? উনি খুব সুন্দর অভিনয় করেছেন।''

ভদ্রমহিলা সবার সঙ্গে হ্যান্ডশেক করে বাইরে চলে গেলেন। এখানে বুঝতে পারি সৌমিত্রবাবুর অভিনয় কতখানি সার্থক—পুতুলের মধ্যে তিনি প্রাণ প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছিলেন। সৌমিত্রবাবুর আর-একটা ছোট্ট ঘটনার উল্লেখ না-করে পারছি না, যেটা ছোটো হলেও নাটকের ক্ষেত্রে একটা বৃহৎ আবহাওয়ার সৃষ্টি করে। সৌমিত্রবাবু তীক্ষ্ণ অনুভূতি, মধুর মানবিকতা, দৃঢ় মনোবল ও সরলতা দিয়ে নাটকের প্রতিটি চরিত্রের (তা সে ছোটো হোক বা বড়ো হোক) শিল্পীদের অঙ্গভঙ্গি ইত্যাদি সব ক্ষেত্রেই সতর্ক নজর রাখেন, কারণ তিনি মানেন যে, নাটকটিকে একটি নির্দিষ্ট জায়গায় পৌঁছোতে হবে যাতে প্রতিটি শিল্পী ওঁর নিজস্ব ভাবধারাকে যথাযোগ্য মর্যাদা দিয়ে সংলাপের মাধ্যমে তাঁদের স্বপ্নটাকে দর্শকের কাছে ঠিকমতো পৌঁছে দিতে পারেন—তার মধ্যে যেন কোনো অতিরিক্ত অভিনয় না-থাকে।

তাই দেখা গেছে, প্রায়ই ছোটো-ছোটো কাগজের টুকরোয় শিল্পীর দোষত্রুটিগুলি লিখে উনি শিল্পীর মেক-আপ টেবিলে রেখে দিয়ে আসতেন। কিন্তু ওঁকে কখনও দেখিনি রেগে গিয়ে মুখে কাউকে কিছু বলতে, যাতে শিল্পী নিজে অতিসহজেই নিজের ভুলগুলি শুধরে নিতে পারতেন। সেজন্য সবার কাছেই নির্বিশেষে তিনি পরম শ্রদ্ধেয়—তা সে বড়ো শিল্পীই

হোক অথবা ছোটো শিল্পী। আরও দেখা যায়, তিনি যখন কারও দোষত্রুটি নিয়ে কিছু বলেন, একগাল হাসিমুখ নিয়ে চেপে চেপে মিষ্টিমধুর স্বরে তাঁকে সুন্দরভাবে বুঝিয়ে দেন।

এখানেই সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় অন্যদের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। তিনি যেন অভিনয়ের জাদুকর—যে-কোনো চরিত্রই মঞ্চস্থ করার আগে, তা সে চলচ্চিত্রেই হোক বা নাটকেই হোক, তার রূপ ভেঙে ভেঙে তার নিজস্ব জাবদাখাতায় চিত্রিত করে নেন। তবেই তো তিনি ছোটো-বড়ো সবারই একান্ত আপন প্রিয় বন্ধু ও কলাকার। আমি সৌমিত্রবাবু সম্বন্ধে আপনাদের অল্প কিছু বলতে গিয়ে তাঁর মনের কথা, তাঁর গুণের কথা, তাঁর নাট্যপ্রেমের কথা, তাঁর অভিনয়জ্ঞান সম্বন্ধে বলতে পেরে নিজেকে ধন্য মনে করছি এবং পুতুলনাটকের পক্ষ থেকে সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

নাট্যমঞ্চ চলচ্চিত্রে ও অপ্রতিদ্বন্দ্বী স্রষ্টা নায়ক সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়

নৃপেন্দ্র সাহা

১

গত শতাব্দির পাঁচের দশক থেকে বঙ্গীয় চলচ্চিত্র ও গণনাট্য-উত্তর নবনাট্য আন্দোলনের কালে জনপ্রিয়তম যে সুদর্শন নায়কযুগল তাঁদের স্রষ্টা ও ভোক্তাসমাজকে শিল্পের সৃজনীরসে আমোদিত করে রাখতে আবির্ভূত হয়েছিলেন, তাঁরা হলেন উত্তমকুমার চট্টোপাধ্যায় ও সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়। নায়করূপে দুজনেই কিংবদন্তিসম প্রতিভার অধিকারী। উত্তমকুমার চলে গেলেন আটের দশকেই; আর সৌমিত্র এই একুশ শতকেও সজীব, সক্রিয়—অতিসম্প্রতি King Lear-রূপে নাট্যমঞ্চে দেখা দেবেন। তবে চলচ্চিত্রে বা রঙ্গমঞ্চে উত্তম উত্তমই, সৌমিত্র সৌমিত্রই। তবু, সৌমিত্র-র ভাষায়, "উত্তম অগ্রজ, অনুজ সৌমিত্র।" উত্তমের মুখের মিষ্টি হাসি যেমন ভোলা যায় না, তেমনই ভোলা যায় না সৌমিত্র-র মুখের দুষ্টু হাসি।

এই দুষ্টু হাসির রৌপ্যোজ্জ্বল মুখশ্রীর দীর্ঘদেহী সৌমিত্র ১৯৫৫ সালে আমাদের স্কটিশ চার্চ কলেজের সামনে হেদুয়ার রেলিংকে পেছনে রেখে দাঁড়াতেন, কিংবা বসন্ত কেবিনের সামনে অপেক্ষা করতেন তাঁর আকৈশোর-যৌবনের প্রেমিকা দীপা কখন কলেজ থেকে বেরোবে। সেই দীপা ছিল আমাদের সহপাঠিনী বন্ধু। দীপা ক্লাস থেকে বেরোলেই বলতাম, "যাও, ছোটো; আর কত অপেক্ষা করাবে!"

তা এইরকম একদিন ১৯৫৬-র মধ্যাহ্নে বসন্ত কেবিনের সামনে দণ্ডায়মান সৌমিত্রকে বললাম, "চলুন-না ভেতরে বসি, চা খাওয়া যাক। দীপা বলছিল, আপনি অভিনয় ভালোবাসেন। শেফালিকা 'পুতুল'-এর ছেলে বাবু (অর্ধেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়) বলছিল, আপনি শ্রীরঙ্গমে শিশিরকুমারের শেষ অভিনয় দেখতে গিয়েছিলেন। বাবু আমার বিশেষ বন্ধু।" পরে মার্কাস স্কোয়ারে ১৯৫৭-র বঙ্গসংস্কৃতি সম্মেলনে ওঁর সঙ্গে ওই *প্রফুল্ল*-তেই সুরেশ চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন। *পথের পাঁচালী* দেখে অসাধারণ ভালো-লাগার মতবিনিময়ও হল; হল সেনেট হলে সত্যজিৎ রায়ের সংবর্ধনা-অনুষ্ঠান উপভোগের আনন্দ। শেষে বলেছিলাম, "আপনি তো কবিতাও লেখেন? আমাদের *যাত্রী*-তে আপনার লেখা পেলে খুব ভালো লাগবে।" সৌমিত্র তাঁর চমৎকার আলাপনে আমার একতরফা কথাবার্তা অনুমোদন করে কী বলেছিল তা আজ আর মনে নেই। তবে আমার সঙ্গে সুসম্পর্ক গড়ে উঠেছিল।

২

এই সময়ে সৌমিত্ররা থাকতেন মির্জাপুর স্ট্রিটের একটা দোতলা বড়ো বাড়িতে। ওটা ওঁর

মামাবাড়ি ছিল। ওখানেও দু-একবার গিয়েছি, দেখাসাক্ষাৎ হয়েছে। সেই সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় এবার যখন ১৯৫৯ সালে সত্যজিৎ রায়ের *অপুর সংসার*-এর নায়ক হলেন, তখন থেকে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়; কারও সঙ্গেই আর তৌলবিচারের প্রয়োজন নেই—উত্তমকুমার উত্তমকুমার, সৌমিত্র সৌমিত্র।

সত্যজিৎ রায় তাঁর সারাজীবনে ১৯৫৫ থেকে ১৯৯১ পর্যন্ত যে-আটাশটি কাহিনিচিত্র নির্মাণ করেছেন, সৌমিত্র তার মধ্যে তেরোটিরই নায়ক। আর যে-ছয়টি তথ্যচিত্র করেছিলেন সত্যজিৎ রায়, তার মধ্যে একটি তথ্যচিত্র *সুকুমার রায়*-এ অভিনয় করেছেন সৌমিত্র। ক-জন অভিনেতা এই সুযোগ পেয়েছেন যা সৌমিত্র পেলেন!

যে-অভিনয়শৈলী সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় আয়ত্ত করেছিলেন নাট্যগুরু শিশিরকুমারের কাছে, তাকে ভেঙে চলচ্চিত্রে-র ভাষায় সে-অভিনয়রীতিকে তিনি বাংলা তথা ভারতীয় চলচ্চিত্রের স্বর্ণযুগের এই বরেণ্য স্রষ্টা সত্যজিৎ রায়ের অনুভববেদ্য প্রকরণকৌশলকে আয়ত্ত করে প্রয়োগ করতে সমর্থ হয়েছিলেন বলেই উত্তমকুমারের প্রয়াণের পর আজ এই একুশ শতকের প্রথম দশক অতিক্রমকালে তিনি বলতেই পারতেন তাঁর তুল্য নায়ক চরিত্রের অভিনেতা আর কেউ নেই। কিন্তু সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের সেই অহংকার নেই; তিনি শতাধিক চলচ্চিত্রের নায়ক হয়েও এখনও বিনয়ী, সুভদ্র, সজ্জন।

সৌমিত্র-অভিনীত উপর্যুক্ত চোদ্দোটি চলচ্চিত্র আমরা সবাই একবার কেন, একাধিকবার দেখেছি। চলচ্চিত্রগুলির কালানুক্রমিক তালিকা এইরকম:

১. *অপুর সংসার* (১৯৫৯)
২. *দেবী* (১৯৬০)
৩. *তিন কন্যা* (১৯৬১)
৪. *অভিযান* (১৯৬২)
৫. *চারুলতা* (১৯৬৪)
৬. *কাপুরুষ ও মহাপুরুষ* (১৯৬৫)
৭. *অরণ্যের দিনরাত্রি* (১৯৬৯)
৮. *অশনি সংকেত* (১৯৭৩)
৯. *সোনার কেল্লা* (১৯৭৪)
১০. *জয় বাবা ফেলুনাথ* (১৯৭৮)
১১. *হীরক রাজার দেশে* (১৯৮০)
১২. *ঘরে-বাইরে* (১৯৮৪)
১৩. *সুকুমার রায়* (১৯৮৭)

১৪. *গণশত্রু* (১৯৮৯)

১৫. *শাখা-প্রশাখা* (১৯৯০)

৩

সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় উপর্যুক্ত সময়ে এবং পরবর্তীকালে সে-যুগের অপরাপর চিত্রপরিচালকদেরও অসংখ্য চলচ্চিত্রে নায়ক বা প্রতিনায়কের ভূমিকায় অভিনয় করেছেন, যেমন তপন সিংহ-র *ক্ষুধিত পাষাণ* (১৯৬০), *ঝিন্দের বন্দী* (১৯৬১), *আতঙ্ক* (১৯৮৬), *অন্তর্ধান* (১৯৯২), *হুইলচেয়ার* (১৯৯৪), প্রভৃতি চলচ্চিত্রে। তপন সিংহ-র অভিমতে তাঁর তোলা *অন্তর্ধান*-ই সৌমিত্র-র জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ অভিনয়। এইরকমই তরুণ মজুমদারের *সংসার সীমান্তে* নামক সিরিয়াস ছবিতে যেমন, তেমনই হাসির ছবি *একটুকু বাসা*—সবেতেই সৌমিত্র তাঁর পারদর্শিতা প্রমাণ করেছেন। *গণদেবতা*-তেও অসাধারণ। এঁর আরও অনেক ছবিতে সৌমিত্রকে দেখা গেছে। পরিচালক সলিল দত্ত-র দশখানা ছবিতে সৌমিত্র যথারীতি অবিসংবাদী নায়ক। তার মধ্যে *শ্যাম সাহেব*-এর অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান বৃদ্ধের ভূমিকা ভোলা যায় না। ১৯৬৬ সালে সলিল সেনের পরিচালিত *মণিহার*-এ চরিত্রাভিনেতারূপেও সৌমিত্র ছিলেন অসাধারণ। *বঙ্গীয় শব্দকোষ*—প্রণেতা অভিধানকার হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবনকথা নিয়ে রাজা মিত্র-র *একটি জীবন* নামক ডকু-ফিচার ফিল্মও সৌমিত্র-র কৃতিত্বে উপভোগ্য হয়ে উঠেছিল।

বঙ্গীয় চলচ্চিত্রজগতে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় যখন উত্তমকুমারের মতোই কীর্তিমান, তখন এই চলচ্চিত্রক ব্যস্ততার মধ্যেই যথেষ্ট সময় দিয়ে সৌমিত্র তাঁর কাব্যচর্চা, সাহিত্যিক আড্ডা, আর পত্রিকা-সম্পাদনাতেও কীর্তিমান হয়ে ওঠেন।

৪

কফি হাউসের আড্ডাতেও সমান গতায়াত ছিল; কবি, সাহিত্যিক, লিট্‌ল ম্যাগের সম্পাদকদের সঙ্গে অনায়াসেই মিশে যেতে পারতেন তাঁর নিরহংকার দুষ্টুমিষ্টি হাসি নিয়ে। ১৯৬১ সালে তাঁর সহপাঠী বন্ধু নির্মাল্য আচার্য-র সঙ্গে যুগ্ম-সম্পাদনায় সেকালের বিখ্যাত লিট্‌ল ম্যাগে *এক্ষণ*-এর সম্পাদনা শুরু করলেন। এই *এক্ষণ* পত্রিকাতেই নাট্যকার বার্ল্টোট ব্রেশ্‌টের *দ্য এক্‌সেপ্‌শন অ্যান্ড দ্য রুল*-এর বাংলা রূপান্তর *বিধি ও ব্যতিক্রম* প্রথম বর্ষ দ্বিতীয় সংখ্যা (জুন–জুলাই ১৯৬১)-তে বেরোলো। নাটকের শেষে টীকায় সৌমিত্র উল্লেখ করেছেন, তাঁর নাট্যাচার্য শিশিরকুমার এ-নামকরণ করেছেন। নাটকটি অনুশীলন সম্প্রদায় কর্তৃক অভিনীত হওয়ার কথা ছিল; হয়েছিল কি না জানা নেই। তবে সাত কিংবা আটের দশকে ক্লাস থিয়েটার রমেন সরকারের নির্দেশনায় এ-নাটকটির একটি অসাধারণ প্রযোজনা আমাদের

উপহার দিয়েছিল। যাই হোক, একটানা ৬৪ বৎসর সৌমিত্র ও নির্মাল্য-র যুগ্ম-সম্পাদনায় পত্রিকা চলবার পর সৌমিত্র সময় দিতে না-পারায় ১৯৭৫ থেকে নির্মাল্য একাই আরও দুই দশককাল পত্রিকা চালান।

এই সময়কালে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় কেবল নাটককার নন, পত্রিকা-সম্পাদক ও রীতিমতো কবি। কবি বন্ধু শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের উদ্যোগে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের প্রথম কবিতার বইও বের হয়। পরে আরও সাতটি কবিতার বই বের হয়।

সৌমিত্র-র ৫০ বৎসরপূর্তিকালে অন্যতম নাট্যস্রষ্টা বিভাস যথার্থ লিখেছিল: "পৃথিবীর চলচ্চিত্র-ইতিহাসে এমন কোনো নায়ক অভিনেতা নেই যিনি একইসঙ্গে চলচ্চিত্রে অভিনয় করছেন, নাট্যপরিচালনা, নাট্যরচনা, নাটকে অভিনয় করছেন, পত্রিকা সম্পাদনা করছেন, কবিতা লিখছেন। পৃথিবীর কোনো নায়ক অভিনেতা নেই এমন—এটা এই দেশেই সম্ভব।"

৫

অভিনেতা সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের সৃজনশীলতায় আমাদের সাধারণ রঙ্গালয় যা পাঁচের দশকে পুনর্জীবিত হয়েছিল স্টার থিয়েটারকে কেন্দ্র করে সলিল মিত্র-র মালিকানায়, তাতে তেমনভাবে পরিস্ফুট হতে পারেনি—যেটা উত্তম-সাবিত্রীর অভিনয়ে দেবনারায়ণ গুপ্ত-নাট্যরূপায়িত *শ্যামলী*–তে হতে পেরেছিল। সৌমিত্র যখন স্টারে যুক্ত হলেন ১৯৬৩-তে, তখন *তাপসী* নাটকে অভিনয়ের সূত্রে ৪৬৭ রজনি অভিনয় হয়েছিল, যা উত্তমের *শ্যামলী*-র জনপ্রিয়তার তুলনায় কিচ্ছু না। আসলে সাধারণ রঙ্গালয়ের তখন দুর্দিন শুরু হয়েছে; দর্শকরুচিরও বদল হয়েছে। না-হলে গণেশ মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে রঙ্গনা চালু হল, কিন্তু রঙ্গনাকে জনপ্রিয় করল নান্দীকারের অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়–পরিচালিত *তিন পয়সার পালা*, *শের আফগান*, প্রভৃতি—নবনাট্য আন্দোলনের গ্রুপ-থিয়েটারি প্রয়োগবৈশিষ্ট্যে! সাতের দশকের এই ঘটনা সাধারণ রঙ্গালয়ের পাড়ায় আবর্তিত হল। এক দশক আগের মিনার্ভা থিয়েটারে উৎপল দত্ত-র সৃজনবৈভবে সমৃদ্ধ এলটিজি-র *অঙ্গার*, *কল্লোল*-এর সাফল্যের প্রতিকল্পে। না-হলে মেঘনাদ ভট্টাচার্যরা সত্তরের শেষে বিজন থিয়েটার প্রতিষ্ঠা করেও সাধারণ রঙ্গালয়ের সনাতনী দর্শকরুচিকে আকৃষ্ট করতে না-পারার আশঙ্কায় নিজেরা গ্রুপ-থিয়েটারি বৈশিষ্ট্যেই জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে কীভাবে?

সৌমিত্র তাঁর নাট্যসৃজনক্ষমতাকে কাজে লাগালেন তাঁর *নাম জীবন*-এর সফল নাট্যনির্মাণে। *নাম জীবন* নাটকের রূপান্তর করে দেয় সৌমিত্র-প্রিয়া দীপা, এরল জন–রচিত *মুন অন আ রেইনবো শল* অবলম্বন করে। ও নাম দিয়েছিল *রামধনু রঙের চাদর*। দীপার এই নাট্যরচনার প্রেরণা ছিল ওদের প্রতিষ্ঠিত প্রতিকৃতি নাট্যদলের তাগিদ।

সৌমিত্র এই টেক্সটকে অবলম্বন করে নাম বদলিয়ে যখন *নাম জীবন* মঞ্চস্থ করল খালপাড়ের কাশী বিশ্বনাথ মঞ্চে, তখন নাট্যনির্দেশক ও নাট্যাভিনেতা সৌমিত্র-র প্রতিভায় উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল এ-এলাকা। এ-নাটকের দর্শকরূপে সাধারণ রঙ্গালয়ের তথাকথিত দর্শকসমাজ থেকে ২৫ শতাংশ উপস্থিত থাকত; বাকি দর্শক ছিল আমাদের গ্রুপ থিয়েটারের দর্শক।

নাম জীবন-এর সাফল্য সৌমিত্রকে দীনবন্ধু পুরস্কারে ভূষিত করল ২০০১-এ। এর পরেই সৌমিত্র উৎসাহিত বোধ করলেন ওই সাধারণ রঙ্গালয়ের পাড়ার রঙমহল মঞ্চের আহ্বানে তাঁর পরবর্তী নাটক *নীলকণ্ঠ* মঞ্চস্থ করতে। *দেশ* পত্রিকার ৪ এপ্রিল ২০০২ সংখ্যায় এক নাট্যসমালোচনায় শেখর সমাদ্দার এই আটের দশকের পেশাদার প্রযোজনা প্রসঙ্গে লিখেছেন, "পত্রপত্রিকায় নাটকটি বিষয়ে যথেষ্ট আলোচনা হলেও যতদূর মনে হয় নাটকটি তার প্রযোজককে যথেষ্ট লাভ দিতে পারেনি। হয়তো ঐ থিয়েটারের দর্শকদের তরল আবেগমুখীনতার কাছে যথেষ্ট আবেদন সৃষ্টি করতে পারেনি।" আমাদেরও যতদূর মনে আছে, ওই সময়েই রঙমহলও তার ঝাঁপ বন্ধ করে দেয় বরাবরের জন্য। পেশাদার থিয়েটার আর পেশাদার নাট্যচর্চার কোনো আশ্বাস দিতে পারছে না। এমতাবস্থায় গ্রুপ থিয়েটারের পদাঙ্ক অনুসরণ করেই সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় তাঁর তারকাকৃতিত্বকে কাজে লাগিয়ে আয়ন্দা বা মুখোমুখি-জাতীয় ব্যাবসায়িক উদ্যোগী প্রতিষ্ঠানের আয়োজনে নাট্যসৃষ্টিতে ব্রতী হন এই নতুন একুশ শতকে।

এই পর্যায়ে আয়ন্দার ব্যানারে গ্রুপ থিয়েটারের মতো আজ নিজস্ব উদ্যোগে, কাল আমন্ত্রণে নাট্যাভিনয়ে *নীলকণ্ঠ* পুনঃপ্রযোজিত হয়।

নীলকণ্ঠ-ও বৈদেশিক ঋণে জন্ম নিয়েছিল রুশ নাটককার তুর্গেনেভের *আ পুয়োর জেন্টলম্যান* সূত্রে। পারিবারিক সমস্যার মধ্যে সদস্যরা সবাই নানান দ্বন্দ্বে আলোড়িত। শিল্পীরাও সবাই গ্রুপ থিয়েটারের কৃতী মানুষ। শ্যামল ঘোষ, দ্বিজেন বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্যামল চক্রবর্তী, স্বপন রায়, প্রমুখের সঙ্গে কন্যা পৌলমী বোসও এ-প্রযোজনায় নাট্যকার, নির্দেশক ও অভিনেতা সৌমিত্রকে পূর্ণ-প্রস্ফুটিত হতে সাহায্য করেছে। *নীলকণ্ঠ*-র সাফল্যের পরে *রাজকুমার* বলে একটি নাটক সৌমিত্র মঞ্চস্থ করেন; দেখার সুযোগ হয়নি। তারপর মনোজ মিত্র-র *দর্পণে শরৎশশী*-তে সাফল্য এসেছিল তপন থিয়েটারে। পরে *ঘটক বিদায়* ও *চন্দনপুরের চোর* কৌশিক সেনের বক্তব্যে, অগণিত দর্শক ও ভক্তকে নিরাশ করলেও কমেডির নানা সূক্ষ্ম ও সুন্দর মুহূর্তসৃষ্টির শিক্ষায় কৌশিক প্রেরণা পেয়েছিল। এরপর কৌশিক সেনের স্বপ্নসন্ধানীর প্রযোজনায় *টিকটিকি* বেশ উপভোগ্য প্রযোজনা হয়েছিল সৌমিত্র-র। এ-প্রযোজনা নিয়ে থিয়েটার আরামবাগের আমন্ত্রণে বাংলাদেশও ঘুরে এসেছিল *টিকটিকি*। ২০০৬-এ সৌমিত্র আর-একটি সংগঠনের পেছনে দাঁড়ালেন: সিনেটেল দুস্থ চলচ্চিত্রশিল্পী

ও কলাকুশলীদের পাশে দাঁড়ানোর জন্য এগিয়ে এল। এদের ব্যানারে মঞ্চস্থ হয়েছিল সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের নির্দেশনা-অভিনয়ধন্য *হোমাপাখি*। এ-নাটক দেখা হয়নি আমার; কিন্তু যাঁরা দেখেছেন তাঁদের মধ্যে *আজকাল* সংবাদপত্রের অলোকপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের অভিমতে, "সমাজ, সংসার ও গভীর ব্যক্তিগত স্তরের সংঘাত, সংঘর্ষ ও মুক্তির টানাপোড়েনে এক নতুন মাত্রার নাটক 'হোমাপাখি'। মানুষের মনোজগৎ যখন এই জ্বালাযন্ত্রণা থেকে মুক্তি খোঁজে, সেই মুক্তির সন্ধান নিয়ে ড. অমিতরঞ্জন বিশ্বাস এ নাটক রচনা করে দেন।"

সিনেটেল সংস্থা ইতিমধ্যে কী অবস্থায় আছে জানি না। কিন্তু নাট্যশিল্পী সৌমিত্র বসে নেই; তিনি মুখোমুখির ব্যানারে এখন লাগাতার দর্শকের দরবারে পৌছোচ্ছেন। বিলু দত্ত এই উদ্যোগের সর্বময় কর্তা। ওই প্রতিষ্ঠানের ব্যানারে ২০০৯-এ সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়কে পুলিশ অফিসারের ভূমিকায় দেখলাম *কুরবানি* নাটকে ঝাড়খণ্ডের বোকারো স্টিল সিটির *ঘুণপোকা* পত্রিকা-আয়োজিত নাট্যোৎসবে। বেশ ভালো।

৬

এই সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের অতিসাম্প্রতিক চলচ্চিত্র *আরোহণ* মুক্তি পেল, যাতে দর্শকেরা অভিভূত দীর্ঘদেহী গগনচুম্বীর প্রতিভায়। বই তত জমেনি; তবে সৌমিত্র জমিয়ে দিয়েছেন সৌমিত্র-ভক্ত দর্শকবৃন্দকে। সৌমিত্রকে অভিনন্দন, আরও বহুদিন তিনি মঞ্চনাট্য ও চলচ্চিত্রে অপ্রতিদ্বন্দ্বী থাকুন।

জীবন নিয়ে শিল্প: *তৃতীয় অঙ্ক, অতএব*

সৌমিত্র বসু

নাম, মুখ—কোনোটাই মনে পড়ছে না; তবু সেই মানুষটির প্রতি আমি কৃতজ্ঞ যিনি আমাকে বলেছিলেন, "*তৃতীয় অঙ্ক, অতএব* কোনো নাটকই হয়নি।" বিশ্বাস করি বা না-করি, এই ধরনের মন্তব্য তো একটা পূর্বধারণা তৈরি করে দেয়? বিশেষ করে, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের আগের একটি প্রযোজনা *হোমাপাখি* আমার ভালো লাগেনি, টেক্সটে আর প্রযোজনাবিন্যাস—দু-দিক থেকেই। এ-নাটকও খুব-একটা জুতের হয়নি—মনের তলায় এইরকম ধারণা নিয়ে দেখতে গিয়েছিলাম বলেই কি না জানি না, অভিঘাতটা তীব্র হয়ে নেমেছে আমার ওপর। সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় মানুষটিকে আমি নানা কারণে ভালোবাসি। তাঁর কাজ দেখে মুগ্ধ হওয়াটা অভ্যেসের মতো হয়ে গেছে বলেই বোধহয় মুগ্ধ হতে না-পারলে নিজের অস্বস্তি হয়। দ্বিজেন বন্দ্যোপাধ্যায়কে একদিন আলগা করে জিজ্ঞেস করেছিলাম কেমন হয়েছে। তাঁর মুগ্ধতার কথা শুনেও পাপী মন ভেবেছিল—প্রযোজনার সঙ্গে যুক্ত আছেন, খুব নিরপেক্ষভাবে দেখতে পারছেন কি না কে জানে! কিন্তু নাটকটা নিজের চোখে দেখবার পর মনে হল, ভালো-খারাপের প্রশ্ন বহুদূরে ফেলে রেখে এ-নাটক জীবনের একটা স্থায়ী অভিজ্ঞতার অন্তর্গত হওয়ার যোগ্য কাজ। যিনি নিন্দে করেছিলেন তাঁকে দোষ দেওয়ার কথা ভাবি না—সত্যিই এ-নাটক আমাদের প্রচলিত নাটক-দেখার ধাঁচা থেকে এতটাই আলাদা যে এটা আদৌ নাটক হয়েছে কি না তা নিয়ে একটু রক্ষণশীল মনে সন্দেহ জাগতেই পারে। *তৃতীয় অঙ্ক, অতএব* নাটক না নাটক নয় সেইসব কূটতর্কে ঢুকে সময়নষ্ট পণ্ডিতেরা করবেন। এই পর্যন্ত লিখে বেশ মজা লাগছে এ কথা ভাবতে, আত্মস্মৃতিময় এই নাটকের সমালোচনা লিখতে বসে আমি নিজেই আত্মস্মৃতির শুধু নয়, প্রায় খ্রিস্টীয় ভুলস্বীকারের ছকে লেখাটা শুরু করে ফেললাম।

প্রথমেই স্বীকার করি, নাটকের পাঠটা আমাকে অন্তত একটা বিপদের মধ্যে ফেলে দিয়েছে। শিল্পের মধ্যে দিয়ে শিল্পী নিজের কথা বলেন—এ তো পুরোনো কথা; কিন্তু এ কথাও নতুন নয় যে, বলেন একটা আড়াল রেখে, ছদ্মবেশে—যার নাম দিয়েছি আমরা 'শৈল্পিক দূরত্ব'। সবসময় যে তিনি ইচ্ছে করে রাখেন এই আড়াল, এমনটা নয়; অনেকসময়েই যে-কোনো যা-হোক-কিছু বানাতে গিয়েও তাঁর গোচরে বা অগোচরে নিজের জীবন সেখানে ছদ্মবেশে ভেসে ওঠে। সমালোচক, জীবনানন্দের ভাষায়, মাংস কৃমি খুঁটে শিল্পের মধ্যে থেকে যা-যা আবিষ্কার করতে চান তার মধ্যে শিল্পীর এই গহন জীবনের আখ্যানও পড়ে। এই প্রক্রিয়ার থেকে একটু দূরে রাখতে হবে আত্মজীবনীকে, অথবা ছবির বেলায়

আত্মপ্রতিকৃতিকে। সেখানে নিজের কথাই বলতে চাইছেন শিল্পী, নিজের ছবিই আঁকছেন, কোনো আড়াল না-রেখে। তবে আড়াল কি আর থাকে না? সাহিত্যেই হোক আর ছবিতে, নিজেকে একজন মানুষ যে-চোখে দেখেন তা তো আর পাঁচজনের থেকে আলাদা হতেই হবে। রবীন্দ্রনাথের শেষ বয়েসের লেখায় মাঝেমাঝেই তাঁর ব্যক্তিজীবনের নানা টুকরো চলে আসত। তিনি যেভাবে দেখেছেন জীবনকে—শঙ্খ ঘোষ যার নাম দিয়েছেন 'মূর্তিগত আমি', অর্থাৎ নিজের যে-মূর্তিতে বিশ্বাস করেন শিল্পী, প্রকাশ করতে চান—তাই প্রকাশ পেয়েছে তাঁর সৃজনের মধ্যে। সে তাঁর সত্য পরিচয় কি না সে-প্রশ্ন অবান্তর, এমনকি মানুষের 'সত্য পরিচয়' বলে কিছু থাকে কি না তাও বলা অসম্ভব।

নাটকে এমনটা হবার সম্ভাবনা কম। নানা কারণে নাটককার নিজেকে লুকিয়ে রাখতেই পছন্দ করেন। হয়তো এই সংরূপের দাবি তাঁকে সেইদিকেই নিয়ে যেতে চায়। বস্তুত, বাংলা সাহিত্যে খোলাখুলি নিজেকে নিয়ে নাটক লেখার উদাহরণ আছে বলেই মনে পড়ছে না। *চাঁদ বণিকের পালা*-য় শম্ভু মিত্র নিজের মূর্তিগত আমি-কেই মূলত প্রকাশ করতে চেয়েছেন বলে বিশ্বাস করি, কিন্তু সেও করেছেন মনসামঙ্গলের অন্তত কাঠামোগত আড়ালটুকু রেখে। সে-আড়ালকে অস্বীকার করে *চাঁদ বণিকের পালা*-কে আত্মজৈবনিক নাটক বলবার লোভ হয়েছে অনেকদিন, হয়তো বলেও ফেলেছি কোথাও-কোথাও। *তৃতীয় অঙ্ক*, *অতএব* দেখার এবং পরে শান্তনু দাসের সৌজন্যে নাটকটা পড়ার পর সে-লোভ মিলিয়ে গেছে। আপাতচোখে কোনো আড়াল না-রেখেই এ-নাটকে সরাসরি নিজের জীবনকথা বলেছেন সৌমিত্র—তাঁর ছোটো থেকে বড়ো হয়ে ওঠা, জীবনের নানা পর্বান্তর, এবং রোগভোগ ও তার চিকিৎসার শ্বাসরোধী জগতের কথা। কেন দেখব এই ব্যক্তিগত জীবনের আখ্যান তাও খুব স্পষ্ট হয়ে ওঠে আমাদের সামনে। ১৯৩৫ সালের পরাধীন ভারতবর্ষের একটি মফস্‌সল শহরে জন্ম; সৌমিত্র চোখের সামনে দেখেছেন গত পঁচাত্তর বছর ধরে ঘটে-যাওয়া, তাঁর অব্যবহিত পরিপার্শ্বে ঘটে-যাওয়া অজস্র আলোড়নময় ঘটনা; দেশ-বিদেশের অজস্র ঐতিহাসিক বাঁক-ফেরার কথাও জেনেছেন সময়ের প্রত্যক্ষতায় দাঁড়িয়ে; আর সামান্য পরিণত বয়েসে পৌঁছোবার পর থেকেই যেখানে তার যত ধ্বনি উঠেছে তাকে চারিয়ে দিয়েছেন নিজের অভিজ্ঞতা আর বোধের ভেতরে। তাই তাঁর জীবনকাহিনি শোনা মানে তো বস্তুত একটি সময়ের ইতিহাসের সাক্ষী হওয়া। সত্যিই, নাটক দেখে বেরিয়ে এসে খুব ভার লাগে মনের মধ্যে, মনে হয় কোনো আদিগন্ত টানেল পার হয়ে এলাম।

সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের পক্ষে খুবই স্বাভাবিক এবং যাঁরা তাঁকে ভালোবাসেন তাঁদের পক্ষে খুবই শ্লাঘনীয় মনে হবে এই ঘটনা যে, ব্যক্তিমানুষকে সামনে রেখেও সৌমিত্র-র এই নাটক সবসময় তাঁর সমকালকে ছুঁয়ে থাকে, ছুঁয়ে থাকে প্রযোজনার সময়কে, সেই সময়জীবী

দর্শকের আত্মাকে—যার মধ্যে দিয়ে উঠে আসে জীবন বিষয়ে নাটককারের ভাষ্য। তাঁর মেধা, বোধ একে নিছক কোনো স্টারের আত্মজীবনী হয়ে উঠতে দেয়নি। মানুষটির সঙ্গে অল্পস্বল্প মেলামেশার সূত্রে বুঝেছি, নিজেকে গ্ল্যামারের ঘেরাটোপে ঢুকিয়ে-ফেলার ব্যাপারে যেমন ঘোরতর অনীহা, তেমনি আবার নিজের সম্পর্কে অহেতুক বিনয়ের ন্যাকামিও তাঁর নেই। চলচ্চিত্রের জীবন স্বাভাবিকভাবেই চলে এসেছে নাটকে, কিন্তু তা নিছক কাজের জগৎ হিসেবে, কোনো আত্মম্ভরিতাকে সামান্যতম পাত্তা না-দিয়ে। বলা যেতে পারে, এ-নাটক স্বাধীনতার বছরদশেক আগে-জন্মানো কোনো-একটি মধ্যবিত্ত পরিবারের অনুভূতি আর বোধসম্পন্ন মানুষের কাহিনি, যে কবিতা লেখে, বিবিধ বিষয়ে আগ্রহ বোধ করে, এবং চলচ্চিত্রের নামকরা অভিনেতাও বটে। কৃষ্ণনগরের পটভূমিতে বেড়ে-ওঠা, আদর আর শাসন দিয়ে বুনে-যাওয়া জীবন থেকে শুরু হয়েছে এই আত্মকথন। শুনতে শুনতে আমার অন্তত রবীন্দ্রনাথের *জীবনস্মৃতি*-র কথা মনে পড়ে যাচ্ছিল। খানিকটা একইরকম করে সালতামামির ইতিহাস-সচেতনতায় না-গিয়ে সৌমিত্র স্মৃতির পটে জীবনের ছবিই আঁকতে চাইছেন, যা মনে পড়ছে তাই বলছেন, বলতে গিয়ে আগের কথাকে পরে ঠেলে জেগে উঠছে পরের কথা। আরও একদিক থেকে হয়তো এ-আত্মকথন *জীবনস্মৃতি*-র সঙ্গে তুলনীয় হতে পারে—এত মজায় ভরতি এর সংলাপ, এমনসব মেদুর স্মৃতি উঠে এসেছে তাঁর লেখায় যে নিজের অগোচরেই মুখ একটি স্নিগ্ধ হাসিতে ভরে থাকে, কখনো-কখনো তা অট্টহাসিতেও ফেটে পড়ে। নিজেকে নিয়ে মজা করার জন্যে স্বভাবের যেসহজতা দরকার হয়, নক্ষত্র হয়েও সৌমিত্র তার থেকে ভ্রষ্ট হননি।

মরমি মানুষ যখন বলেন তাঁর মনে-পড়ে-যাওয়া দিনের কথা, তখন তার মধ্যে অনেকসময়েই এমনসব আলো ছলকে ওঠে যা চিরায়ত কোনো সত্যকে প্রকাশ করে; আর যেহেতু তা করে তথ্যের শুকনো ভাষাকে পরিহার করে, জীবনের সঙ্গে মিলিয়ে, তাই জ্ঞানের চেয়েও বেশি করে জাগিয়ে তোলে আবেগ। এই আবেগ জেগে-ওঠার একটি ঘটনা স্বীকার করি। আজাদ হিন্দ ফৌজের বন্দি সৈন্যদের নিয়ে ট্রেন থেমেছে কৃষ্ণনগরে। কিশোর সৌমিত্র গেছেন তাঁদের দেখতে। এক শিখ সৈন্যকে জল দিলেন তিনি। সেই সৈন্য জিজ্ঞেস করল সৌমিত্র-র জাত কী। সৌমিত্র বলে ফেললেন, "Indian"। মুহূর্তে সৈন্যটি জড়িয়ে ধরলেন কিশোর সৌমিত্রকে। আর দর্শকাসনে বসে আমার চোখ ফেটে জল বেরিয়ে এল। কতসব কথা পড়ি আমরা, বলাবলি করি এই নষ্ট-হয়ে-যাওয়া সময়ে দাঁড়িয়ে! কিছুতেই কি অস্বীকার করা যাবে, স্বাধীনতার ষাট বছরের পরেও ব্যর্থ হয়ে রইল আমাদের 'ভারতবাসী' পরিচয়?

এমন উদাহরণ আরও অজস্র দেওয়া যায়। তাতে এ-লেখার পরিসরই বাড়বে শুধু, পাঠক তাঁর অভিজ্ঞতার মধ্যে সেইসব স্মৃতিকে ধারণ করতে পারবেন না। তবু যে-অংশটির

কথা না-বললেই নয় তার উল্লেখটুকু মাত্র করে নাটকের আলোচনায় ছেদ টানব। নাটকের শেষ অংশ জুড়ে আছে তাঁর অসুস্থতা এবং চিকিৎসার বর্ণনা। সে-পরিণতির কথা মাথায় রেখেই যে এ-নাটকের পরিকল্পনা তা বুঝতে পারা যায় নাটকের নামকরণ থেকে তো বটেই, সূচনা অংশ থেকেও। মৃত্যুচিন্তা দিয়ে শুরু হয় এ-নাটক, তারপর অনিবার্য গতিতে চলে যায় জীবনের দিকে। একজন মানুষ বুক চিতিয়ে বলছেন তিনি ক্যানসারের রোগী, বলছেন প্রথম সে-খবর পাওয়ার পর তাঁর স্বাভাবিক মানবিক প্রতিক্রিয়ার কথা, বলছেন দীর্ঘ কষ্টকর চিকিৎসার বিবরণ—যা প্রায় সহ্য করা যায় না। জীবন তার বাঁকে-বাঁকে কেমনসব উপহার রেখে গেছে তাঁর জন্যে, সেসব উপহার কোন্ দর্শনে পৌঁছে দিয়েছে তাঁকে, সে-কথা শুনতে শুনতে চলে যাই মৃত্যুকে কোন্ চোখে দেখছেন এই মানুষটি, তার বিবরণে। শেষের আবৃত্তিটি এই অভিযাত্রার নির্যাস হয়ে আসে আমাদের কাছে।

তিনটি চরিত্র মঞ্চে থাকে সারাক্ষণ—তিনজন সৌমিত্র, তাদের একজন নারী। তিনজনেরই একইরকম পোশাক, তিনটি একইরকম বইয়ের র‍্যাক আর লেখার টেবিল—বোঝা যায় কোন্ পরিচয় সৌমিত্র-র প্রিয়। তিনটি ঘোরানো চেয়ার—চরিত্ররা সচল থাকতে পারেন বসে থাকবার সময়েও। আমার অন্তত এমন মনে হয়নি যে, সংলাপবিভাজনের ব্যাপারে তাঁর বিশেষ কোনো উদ্দেশ্য কাজ করেছে এখানে—কথোপকথন দিয়ে নাটকীয়তা তৈরি করার জন্যেই হয়তো এদের ব্যবহার। সৌমিত্র-জায়া দীপা বা অন্য-কোনো নারী চরিত্রের অংশ স্বভাবতই করেছেন পৌলমী। দ্বিজেন বন্দ্যোপাধ্যায় মূলত এসেছেন অন্য পুরুষ চরিত্রগুলির অভিনয়ে। এই বিন্যাস ভেঙেও দেওয়া হয়েছে অবলীলায়। আলোর কোনো কাজ নেই, আবহের কোনো বাড়াবাড়ি নেই। স্লাইডে কিছু ছবি দেখানো হয়েছে; তাদেরই শুধু একটু বাড়তি বলে মনে হয়।

তিনজনে মিলে গল্পই বলবেন আমাদের, বর্ণনা করবেন ঘটনা, আর গল্প বলতে গিয়ে যতটুকু সম্পৃক্ত হয়ে পড়ি আমরা, ততটুকুই হবেন—এই নিশ্চয় ছিল নির্দেশ; তাই আখ্যানটাই মুখ্য হয়ে ওঠে এখানে, অভিনয় বা প্রযোজনার কারুকাজ নয়। দ্বিজেন বন্দ্যোপাধ্যায় যে সে-কাজ দক্ষতার সঙ্গে করতে পারবেন তাতে বিস্ময়ের কিছু নেই, পৌলমীও এ-কাজে ঠিকঠাক। 'ঠিকঠাক' শব্দটি লিখেই মনে হল, অন্তত কোথাও-কোথাও, দু-একটি খণ্ডমুহূর্তে যে পৌলমী তাঁর বর্ণনার মধ্যে থেকে ফেটে বেরিয়ে আসেন, মনে হয় স্তানিস্লাভ্স্কি-কথিত সেই 'গিভ্‌ন সারকামস্টানসেস'-এর শর্তকে উড়িয়ে দিয়ে তৈরি হয়ে উঠল তাঁর আত্মজীবনীর একটা ঝলক, সে কি কোনো ব্যক্তিগত স্মৃতির তাড়নায়? একটি অংশের কথা বলতে ইচ্ছে করছে। ফিল্‌মজগতের কর্মীদের নিয়ে আন্দোলনের দিনে যখন অনেক অভিনেতাই ছেড়ে যাচ্ছেন পুরোনো লড়াকু অবস্থান, সৌমিত্রও একটু অসহিষ্ণু হয়ে পড়েছেন, তখন এক

রাত্রে শুতে যাবার পর নিভৃত মুহূর্তে দীপা তাঁকে বলেন, "তুমি যদি গরিব মানুষগুলোর পাশ থেকে সরে যাও তাহলে আমিও কিন্তু তোমার জীবন থেকে সরে যাব। সত্যিসত্যি।" পৌলমী এমন-একটা নিষ্পাপ গলায় এই সংলাপটি উচ্চারণ করেন, এমন ব্যক্তিগত মমতা, অভিমান আর বিশ্বাস মিশিয়ে, যাকে নিছক অভিনয় বলে ভাবতে ইচ্ছে করে না।

আর সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়? আমার মতো অভিনেতাকে বড়ো বিপদে ফেলে দেন ভদ্রলোক। এত স্বাভাবিক করে অভিনয় করা যায়, অভিনেতার যে-কোনো প্রথাগত অস্ত্রকে এত অবহেলায় সরিয়ে রেখে? মনে হয় শুধু কথাগুলো বলছেন বুঝি, কিন্তু তাতে আবেগ জেগে উঠতে তো কোনো বাধা আসে না! মনকে সান্ত্বনা দিই এই বলে—সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের পক্ষে যা সম্ভব, সৌমিত্র বসু-র দ্বারা তা কেমন করেই বা হবে, সে শুধু এইসব নিদর্শনগুলো দেখে নিজেকে তাড়না করতে পারে।

সব গল্প নিশ্চয় বলা হল না এ-আখ্যানে; সমগ্রকে কেই বা দু-হাতের বেড়ে ধরতে পারে? নিশ্চয় আরও বহু বাঁক ছিল জীবনের—বহু উদ্ভাস আর পরাভব, বঞ্চনা আর আকস্মিক প্রাপ্তি দিয়ে ভরা। সবটা বলেননি সৌমিত্র, বলা উচিতও নয়। শিল্পীকে তো তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের পবিত্রতাও রাখতে হবে? তাই একটা সময়ে পর্দা পড়ে যায়, আমাদের অতৃপ্ত রেখেই। সেই অতৃপ্তি ভেতরে-ভেতরে এ কথা বলে—পর্দা পড়ে গেলেও এমন নাটক শেষ হয় না কখনও, একজন মানুষের যাত্রাপথের আনন্দগান যার পরতে-পরতে বিজড়িত হয়ে আছে।

সৌমিত্রকাকুকে যেমন দেখেছি

সন্দীপ রায়

সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়কে আমি বহু বছর ধরে—মানে সেই ১৯৫৮—৫৯ সাল থেকে—দেখছি। প্রথম তো উনি আমার বাবার ছবিতেই অভিনয় করেন—*অপুর সংসার*-এ। তার আগেও বাবার কাছে একবার এসেছিলেন, যদিও সেটা আমার মনে নেই একেবারেই। তখন *অপরাজিত* ছবিতে অভিনয় করবেন ভেবে এসেছিলেন। অবিশ্যি আমার নিজের মনে আছে *অপুর সংসার*-এর সময়টা থেকেই। তবে সেটাও খুবই ভাসাভাসা, কারণ তখন আমি খুবই ছোটো ছিলাম। তখন থেকে শুরু করে তাঁর সঙ্গে আমাদের পরিবারের বহুদিনের সম্পর্ক। বাবার অনেকগুলো ছবিতেই তিনি কাজ করেছেন। এই সূত্রে আমাদের বাড়িতে তাঁর যাতায়াতও খুব বেশি রকমের ছিল। সেইভাবেই ব্যক্তিগতভাবে তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয়টা হয়েছিল। তারপর বাবার ছবির শুটিংয়ের সময়ে তাঁকে দেখেছি গল্পগুজবে আর আড্ডায়। তিনি যে খুব আড্ডাবাজ লোক এটা তো সকলেই জানেন। কলকাতায় শুটিং হলে অবিশ্যি শুটিংয়ের শেষে সবাই বাড়ি ফিরে যেত; কিন্তু আউটডোরে শুটিং হলে তো সবাই মিলে একসঙ্গে থাকা হয়, কাজেই আড্ডাটা তখন একটু বেশিই হত।

পরবর্তীকালে আমার সঙ্গেও সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় কাজ করেছেন। আমার টেলিভিশনের বেশকিছু ছবিতে তিনি কাজ করেছেন। এ ছাড়াও বড়োপর্দায় *উত্তরণ* ও *নিশিযাপন* ছবিতেও আমি তাঁকে পেয়েছি। সেগুলো সবই খুব সুখের অভিজ্ঞতা।

ব্যক্তিগতভাবে বিশেষ কোনো মজাদার কিংবা মনে-রাখার-মতো ঘটনা আলাদা করে এই মুহূর্তে মনে পড়ছে না। তবে *সোনার কেল্লা* ছবির আউটডোর শুটিংয়ের সময়ে আমরা সকলে যখন একসঙ্গে ছিলাম, খুব হইহই করে কাজ হয়েছিল। *জয় বাবা ফেলুনাথ*-এরও ক্ষেত্রেও তাই। তারপর *হীরক রাজার দেশে* ছবিতেও খুব মজা হয়েছিল। আমি তখন বাবাকে assist করছি। আমি তার অনেক আগে ছবি তোলার কাজ শুরু করেছি। ওই পড়াশোনার ফাঁকে-ফাঁকে শুটিং দেখতে যাওয়া।

আমাকে যেহেতু মূলত নাটক নিয়েই বলতে হবে এই পত্রিকার জন্য, তাই এখন সেই প্রসঙ্গে আসা যাক। তবে দর্শক হিসেবেই সৌমিত্রকাকুর নাটকের সঙ্গে আমার পরিচয়। তাঁর সব নাটক না-দেখলেও অনেক নাটকই আমি দেখেছি। বিশেষ করে গোড়ার দিকের নাটকগুলো আমার দেখার সুযোগ হয়েছিল; যেমন আমার *বিদেহী*-র কথা মনে পড়ছে, *রাজকুমার*-এর কথা মনে পড়ছে। শেষ নাটক যেটা করলেন—*তৃতীয় অঙ্ক, অতএব*—সেটাও খুবই ভালো লেগেছে। এটা তাঁর আত্মজীবনীমূলক নাটক। দর্শকদের মনকে খুবই

নাড়া দিয়েছে এটা। তবে আমার দারুণ ভালো লেগেছিল *টিকটিকি* নাটকটি। কৌশিক সেনের সঙ্গে তাঁর অভিনয় খুবই উপভোগ্য হয়েছিল। ইংরিজি যে-নাটক থেকে উনি গল্পটা নিয়েছেন, আমার নিজের মনে হয়েছে, সেই *Sleuth*-এর থেকেও *টিকটিকি* অনেক বেশি ভালো হয়েছিল। Adaptation বা রূপান্তরটা একেবারে নিখুঁত ছিল, আর অভিনয় ইত্যাদি সব দিক থেকেই খুব ভালো হয়েছিল নাটকটি। আমি যদিও মঞ্চে *Sleuth*-এর অভিনয় দেখিনি, তবে সিনেমায় Laurence Olivier ও Michael Caine–অভিনীত *Sleuth* আমি দেখেছি। অন্তত এই ছবির থেকে সৌমিত্রকাকুর টিকটিকি নাটকটা যে অনেক better, সে-বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

মাঝেমাঝে ছবির শুটিংয়ের মধ্যেও দেখতাম, পরের নাটক নিয়ে সৌমিত্রকাকু চিন্তাভাবনা করছেন। ওঁর নাটকের খাতাটা কিন্তু আমার বাবার খাতার মতোই একটা লাল খেরোর খাতা। আমার যদ্দূর মনে হয়, এখনও সেই নিয়ম বজায় রয়েছে। সে-কথায় পরে আসছি।

নাম জীবন নাটকের কথাও বিশেষভাবে আমার মনে আছে, কারণ এই নাটকের folder বা booklet-টা আমি design করেছিলাম যদিও নাটকের নামাঙ্কনটা বাবা করে দিয়েছিলেন। সেটা অবশ্য অনেকদিন আগেকার কথা। উনি নিজেই আমাকে সেটা করতে বলেছিলেন। কাজেই খুব সামান্য হলেও তাঁর নাটকের জন্য এইটুকু কাজ করতে পেরে আমি ধন্য হয়েছি। আমরা সিনেমার লোক হলেও সৌমিত্রকাকুর নাটক যখন, তখন আলাদা একটা interest তো হবেই—এতদিনের সম্পর্ক। আর অসম্ভব ভালো একটা সেট হয়েছিল *নাম জীবন*-এর। সেটটাকেই একটা চরিত্র বলা যায়। ওঁর সেই খেরোর খাতায় উনি নিজের হাতে সেই সেট এঁকেছিলেন। সৌমিত্রকাকুর নাটকের এই খেরোর খাতাটা কিন্তু খুব important একটা ব্যাপার বলে আমার মনে হয়। যখন যা উনি ভাবছেন, তার সমস্তটাই লিপিবদ্ধ করা হচ্ছে ওই খেরোর খাতায়। আমার মনে হয়, উনি সেই লাল খেরোর খাতা এখনও maintain করেন। *নাম জীবন*-এর সময়ে আমাকে ওঁর সঙ্গে দু-একবার দেখা করতে হয়েছিল এর folder-এর কাজ করতে গিয়ে—ওখানে কোন্-কোন্ ছবি বা লেখা যাবে সেইসব ব্যাপারে। তো তখন উনি নিজেই সেই খেরোর খাতাটা উলটেপালটে আমাকে দেখিয়েছিলেন। সেখানে যেমন নাটকের সেট রয়েছে, অন্যান্য বিভিন্ন আঁকাজোকা রয়েছে, কস্টিউম ডিজাইন রয়েছে। আমি জানি না সাধারণ লোক এটার কথা কতটা জানেন, তবে সমস্ত ব্যাপার খুব detail-এ সেখানে থাকে। আমার মনে হয়, তাঁকে নিয়ে যখন এরকম একটা বিশেষ সংখ্যা হচ্ছেই, তখন লাল খেরোর খাতার কিছু নমুনা এর মধ্যে দিয়ে দিলে তাঁকে আরও ভালোভাবে চিনতে পারবেন পাঠক। খেরোর খাতার কিছু নমুনা-পৃষ্ঠা জুড়ে

দিলে আপনাদের পত্রিকার এই সংখ্যাটি খুবই উপভোগ্য হবে বলে আমার নিজের মনে হয়। আসলে এটাকে খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা দলিল বলেই আমি মনে করি।

নাট্যপরিচালক সৌমিত্র না অভিনেতা সৌমিত্র—কে বেশি বড়ো সেটা বিচার করা আমার পক্ষে খুব মুশকিল। উনি নিজে বোধহয় বলবেন যে, নাট্যপরিচালক হিসেবেই কাজ করতে উনি বেশি ভালোবাসেন, বেশি স্বচ্ছন্দ। কিন্তু অভিনেতা সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়কে কীভাবে তার চেয়ে কম চোখে দেখি সেটাই তো খুব মুশকিল! এত বড়োমাপের একজন অভিনেতা উনি। তবে একটা কথা বলব যে, তাঁর background-টা থিয়েটার হয়ে খুব ভালো হয়েছে আমাদের জন্য, যদিও সিনেমা আর থিয়েটার এক জিনিস নয় মোটেই। তবে উনি সেটাও খুব সহজে switch off আর switch on করতে পারেন বলে আমার মনে হয়েছে। আর এতদিন ধরে কাজ করে technical ব্যাপারগুলো naturally উনি খুব ভালো বোঝেন। উনি জানেন যে, কোথায় কতটা দিতে হবে। উনি এমন একজন লোক যিনি নাটক, ছোটোপর্দা, বড়োপর্দা—সব মাধ্যমেই কাজ করেছেন। এমনকি উনি রেডিয়োতেও কাজ করেছেন—প্রথম জীবনেই তো radio announcer ছিলেন! হারাধনদাও রেডিয়োতে ছিলেন। আমরা সৌমিত্রকাকুকে নিয়ে দুটো বেতার-নাটক করেছিলাম—একটা *বাক্স-রহস্য*, আর-একটা *গোঁসাইপুর সরগরম*। দুটোতেই উনি ফেলুদার ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন। নাটকদুটি পরিচালনা করেছিলেন আমার বাবা সত্যজিৎ রায়, তবে সম্পাদনার কাজে আমিও ছিলাম। কাজেই এক কথায় বলা যায়, সৌমিত্রকাকু সব মাধ্যমেই কাজ করেছেন, যেটা একটা খুব unique ব্যাপার। আমার মনে হয় না যে, অন্য কেউ এতগুলো দিক cover করেছেন। এবং যেদিকেই গেছেন সেদিকেই উনি নাম করেছেন—এটাও খুব লক্ষণীয় ব্যাপার।

ইদানীং যেটা সৌমিত্রকাকু শুরু করেছেন সেটা হল নাটক নিয়ে নানারকম পরীক্ষানিরীক্ষা। নতুন-নতুন format বা আঙ্গিকের নাটক করছেন। সম্প্রতি যে আত্মজীবনীমূলক নাটকটা করেছেন সেটাও তো একদম অন্যরকম। হঠাৎ দেখলে মনে হয় যে, তিনজন চরিত্র অভিনয় করছেন। কিন্তু আসলে তো তিনজনেই সৌমিত্র, তাঁরই তিনটে সত্তা! এরকম ক্ষেত্রে নাটকটা ঝুলে যাবার একটা সম্ভাবনা থাকেই, কারণ তিনজন শুধু কথাই বলে যাচ্ছেন। মাঝেমাঝেই এক-একজন খুব interesting-ভাবে উঠছেন, বসছেন, নড়াচড়া করছেন। তিনজনের নড়াচড়াগুলো খুব ভেবেচিন্তে করা বলেই আমার মনে হয়েছে। কোনো সময়েই কিন্তু নাটকটা এতটুকুও drop করেনি, যেটা গোড়ার দিকে আমার একটু ভয় লেগেছিল। পুরো নাটকটাই একেবারে টানটান! আর ঠিক যতটুকু যা হওয়া উচিত, তার থেকে একটুও কমবেশি নয়। Timing-এর ব্যাপারটাও উনি খুব ভালোভাবে বোঝেন। এটা অবশ্য experience-এর ওপর নির্ভর করে। একটা নাটক কতটা লম্বা হওয়া উচিত,

কতটুকু হলে দর্শকের concentration থাকবে, ইত্যাদি ব্যাপারস্যাপার খুব ভালো বোঝেন সৌমিত্রকাকু। সেদিক থেকে দেখতে গেলে, উনি খুবই বড়োমাপের নাট্যকার ও পরিচালক, কিংবা বলা ভালো, একজন বিরাট নাট্যব্যক্তিত্ব। নাট্যকার হিসেবেও *তৃতীয় অঙ্ক*, অতএব নাটকটি একেবারে নতুন ধরনের একটা কাজ। এর আগে অনেক বিদেশি নাটক উনি বাংলায় adapt করেছেন; কিন্তু এটা তো একেবারেই ওঁর নিজের কথা, নিজের আত্মজীবনী, যদিও লন্ডনে একটা ইংরিজি নাটক দেখে উনি এই নাটকটি লিখতে অনুপ্রাণিত হয়েছেন বলেই আমি শুনেছি।

এ ছাড়া *প্রাণতপস্যা* বলে একটা নাটকের কথা আমি জানি। সেটা দেখার সুযোগ হয়নি আমার। তবে *হোমাপাখি* আমি দেখেছি। সব নাটক আমি অবশ্যই দেখতে পারিনি; কিন্তু বিভিন্ন দিক নিয়ে উনি যে নাটকে কাজ করে চলেছেন, এ কথা খুব স্পষ্টভাবেই বুঝতে পারি।

ইদানীংকালে বাবার লেখা অনেক ছোটোগল্প-অবলম্বনে মঞ্চে কাজ হচ্ছে। সব নাটক যে খুব ভালো হয়েছে তা আমি বলব না। কিছুকিছু নাটক অবশ্যই ভালো হয়েছে। আসলে মুশকিল হচ্ছে, বাবার গল্পগুলোকে বড়ো করা খুব কঠিন। কাজেই যাঁরা বড়ো করেছেন তাঁরা একটু মুশকিলে পড়েছেন। তবে কৌশিক যেটা করেছে—*বঙ্কুবাবুর বন্ধু*—সেটা আমার খুব ভালো লেগেছে। *অনুকূল*-ও বেশ ভালো হয়েছে। একটা ফেলুদা-কাহিনিও হয়েছে—*অপ্সরা থিয়েটারের মামলা*। সেটাও ভালো। তবে ফেলুদার গল্প বললেই ফিল্মের কথা এসে পড়ে। আসলে নাটকের মঞ্চের স্বল্পপরিসর সেটে ফেলুদা করাটা খুব মুশকিল। *অপ্সরা থিয়েটারের মামলা* গল্পটা অবিশ্যি মঞ্চে করা সম্ভব। প্রথমে যখন বেণু (সব্যসাচী চক্রবর্তী) এসে বলেছিল, "আমরা একটা ফেলুদা করব ভাবছি।"—তখন আমি বললাম, "কোন্ ফেলুদা?" আসলে ফেলুদা মানেই তো বাইরে যাওয়া ইত্যাদি; ফেলুদা মানেই action, খুব বড়োমাপের একটা ব্যাপার! তখন ওরাই ওই গল্পটা suggest করেছিল। আমি বললাম, "হ্যাঁ, এই গল্পটা চলতে পারে।" শেষপর্যন্ত নাটকটা মোটামুটি ঠিকঠাকই হয়েছে। আমি নিজেও টেলিভিশনে *অপ্সরা থিয়েটারের মামলা* করিনি। আসলে এই গল্পের একটা মুশকিল হল, ফেলুদা নিজেই অনেকটা সময় জুড়ে থাকছে না, অর্থাৎ ফেলুদার presence বা উপস্থিতিটা খুবই কম। এই কারণে আমার মনে হয়েছিল, ওটা টেলিভিশনে করাটা ঠিক হবে না। যাই হোক, এই কথাগুলো বললাম এই কারণেই যে, অনেকে জানতে চাইতে পারেন—সৌমিত্রকাকু এখন ফেলুদা হিসেবে মঞ্চে আসতে পারেন কি না। এর উত্তরে আমি বলব যে, এখন যে-বয়সে এসে উনি পৌঁছেছেন, তাতে ওঁর পক্ষে ফেলুদা হওয়াটা বেশ মুশকিল; তবে অন্য-কোনো চরিত্র বাবার গল্পে উনি করতেই পারেন। শুধু ফেলুদা কেন, বাবার প্রচুর

অন্য গল্পও তো রয়েছে!

তবে ফেলুদা না-করতে পারলেও আমার কিন্তু খুব মনে হয়, সৌমিত্রকাকু তো ভালো শার্লক হোম্‌স হতেই পারেন। এখন যে-বয়সটায় এসে উনি পৌঁছেছেন সেটা শার্লক হোম্‌সের পক্ষে খুবই উপযুক্ত বলে আমার মনে হয়। ব্যক্তিগতভাবে আমি বিশ্বাস করি, এই ধরনের কোনো চরিত্রেরই বয়সটা বিশেষ বাড়ানো উচিত নয়। মোটামুটি একটা বয়স পর্যন্ত আটকে রাখা উচিত। অবিশ্যি অনেকে সেটা try out করেছেন; কিন্তু তাতে খুব-একটা সাফল্য আসেনি। এতে পাঠক তথা দর্শকদের কাছে acceptance-এর একটা problem হয়। কিছুকিছু ক্ষেত্রে যুগপরিবর্তন হয়তো করা যেতে পারে; যেমন ফেলুদাকে হয়তো এখনকার context-এ নিয়ে আসা যায়—দর্শক হয়তো মেনেও নেবে। তবে ব্যোমকেশকে নিয়ে আসা ততটা যায় না; শার্লক হোম্‌সকে তো আরোই আনা যায় না। শার্লক হোম্‌সকে একেবারে turn of the century-তে রাখাই ভালো। তবে এসব কথা বলতে গিয়ে আমরা মূল বিষয় অর্থাৎ সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় থেকে সরে যাচ্ছি। যাই হোক, সৌমিত্রকাকু কিন্তু শার্লক হোম্‌স নিয়ে মঞ্চে কিছু-একটা করলে মন্দ হয় না।

সত্যিকথা বলতে কি, নাটক একটা সম্পূর্ণ different জিনিস। বাবাও সারাজীবনে সম্ভবত একটিমাত্র নাটক লিখেছিলেন; সেটা স্টেজে হয়েছে বলেও আমার জানা নেই। আসলে আমরা যতটা সিনেমার লোক, ততটা নাটকের লোক নই। কাজেই সৌমিত্রকাকুর নাটকের বিষয়ে খুব detail-এ ওইভাবে discuss করাটা আমার সাধ্যের বাইরে। নাটকের দর্শক হিসেবে যেটুকু বুঝেছি সেটুকুই বলতে পারলাম। তবে সিনেমার প্রয়োজনে আমাদের অনেক নাটক দেখতে হয়। আমার বাবাও খুব নাটক দেখতেন; আর তখন তো খুবই ভালো নাটক হত! বাবা সৌমিত্রকাকুর নাটক গোড়া থেকেই দেখেছেন, এবং যতদিন সুস্থ ছিলেন ততদিন পর্যন্তই দেখেছেন। তার কারণ, ওই যে বললাম, নাটক দেখতে হতই—এই ভেবেই যে, যদি কোনো ভালো অভিনেতা খুঁজে পাওয়া যায়। বাবা নাটকের মঞ্চ থেকেই অজিতদাকে (প্রখ্যাত অভিনেতা অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়কে) পেয়েছিলেন। দিব্য ভট্টাচার্যকেও সেভাবেই পেয়েছিলাম আমরা। তাই নাটক দেখাটা বরাবরই আমাদের জন্য খুব important। থিয়েটার থেকে সিনেমায় এসে সকলেই যে খুব ভালো খাপ খাওয়াতে পারেন, এমনটা কিন্তু নয়। এর সুবিধের দিক যেমন আছে, অসুবিধের দিকও আছে। থিয়েটারে অত দর্শকের সামনে অভিনয় করতে গিয়ে অভিনেতাদের সাধারণত একটা সাহস এসেই যায়; তাই ক্যামেরাটাকেও তাঁরা সেভাবে তোয়াক্কা করেন না। তবে এর উলটো ফলও হতে পারে অনেকের ক্ষেত্রে। যেহেতু ক্যামেরাটা একেবারে সামনে থাকে, theatrical অভিনয়টা একটু কমিয়ে নিতে হয় পর্দায় অভিনয়ের সময়ে। সকলে সেটায় স্বচ্ছন্দ নন। আর ঠিক এই ব্যাপারটাতেই সৌমিত্রকাকু

অসাধারণ। তিনি যে-কোনো মাধ্যমের সঙ্গে সুন্দরভাবে নিজেকে adapt করে নিতে জানেন। নাটকের লোক হলেও ওঁর একটা ব্যাপার ছিল যে, উনি ফিল্‌ম দেখতেন খুব। দেশি ছবি খুব যে দেখতেন তা অবশ্য আমার মনে হয় না, তবে বিদেশি ছবি খুবই বেশিরকম দেখতেন। এই কারণেই তাঁর ওই switch off করার ক্ষমতাটা ছিল; অর্থাৎ উনি জানতেন যে, ফিল্‌মে কতটুকু করতে হবে।

সৌমিত্রকাকু নিজের চেষ্টায় অনেককিছু বদলে ফেলেছিলেন অভিনয়ের প্রয়োজনে। আপনাদের হয়তো মনে আছে যে, *অপুর সংসার* যখন করছেন তখন ওঁর গলাটা ভীষণই পাতলা ছিল। যদিও উনি তার আগে radio announcer ছিলেন, তাও এটা সত্যি। সেই গলাটা কিন্তু উনি একেবারে নিজের ইচ্ছায়, নিজের চেষ্টায় বদলাতে পেরেছিলেন। আর এখন যত বয়স বাড়ছে ততই যেন সেটা আরও পরিণত হচ্ছে! এ ছাড়া ওঁর হাতের লেখা বদল করার ঘটনাটা তো সকলেই জানেন। বাবার *চারুলতা* ছবিতে ওঁর লেখার একটা দৃশ্য ছিল। বাবা সৌমিত্রকাকুকে বলেছিলেন, "তুমি এরকম একটা calligraphic style আনার চেষ্টা করো।" সেটা উনি নিজের চেষ্টায় আয়ত্ত করেছিলেন, এবং আশ্চর্যজনকভাবে ওঁর সেই হাতের লেখাটা এখনও রয়ে গেছে! এখনও ওঁর হাতের লেখা, ওঁর নিজের সই অদ্ভুত সুন্দর। তাঁর হাতের লেখা আর আঁকা যে কতটা অসাধারণ সেটা বোঝাতে গেলে তাঁর খেরোর খাতার কিছু অংশ এই পত্রিকায় থাকা উচিত; তা না-হলে এটা কিন্তু incomplete থেকে যাবে। অনেকেই মঞ্চে তাঁর বহুমুখী কাজের কথা বলেন; কিন্তু যদি আমরা নিজের চোখে দেখতে পাই কীভাবে উনি সেট এঁকেছেন, কস্টিউম এঁকেছেন, চরিত্রগুলোর মেক-আপের চিন্তা কেমনভাবে করেছেন, তাহলে সেটা একটা দারুণ ব্যাপার হবে।[৪] শুধু তাই নয়, নাটকের মিউজিক নিয়েও ওঁর নিজস্ব ভাবনা থাকে। সংগীত নিয়ে ওঁর আকর্ষণ বরাবরই ছিল। অনেকেই হয়তো জানেন না, উনি অসম্ভব ভালো গান গাইতে পারেন। আমরা হয়তো গাড়িতে করে কোথাও চলেছি, উনি সেখানেও গান গাইতে গাইতে চলেছেন। তবে একটা ব্যাপার ঠিক যে, সকলের সামনে উনি গান না। নাটকেও সেরকম কিছু দৃশ্য আমার মনে পড়ছে না যেখানে উনি গান গাইছেন বা গুনগুন করছেন। তবে ওঁর যে গানের গলা আছে সে-বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। আর উনি যে একটা মিউজিকের বিশেষ ভক্ত সেটা আমি ব্যক্তিগতভাবে জানি; উনি Western classical music নিয়মিত শোনেন। সংগীতের এই চর্চাটা না-থাকলে নাটকের মিউজিক ওইভাবে অত appropriately দেওয়া সম্ভব নয়।

সৌমিত্রকাকু এই বয়সেও সারাক্ষণ ব্যস্ত রেখেছেন নিজেকে। ওঁকে তো ফোনে পাওয়াই যায় না! উনি এই বয়সে যেভাবে এতকিছুর মধ্যে নিজেকে ব্যস্ত রেখেছেন, সেটাই খুব

আশ্চর্যের। ওঁর শারীরিক অসুস্থতা যে আছেই সেটা অস্বীকার করার তো কোনো জায়গা নেই। তার মধ্যেও এতগুলো মাধ্যমে একনাগাড়ে কাজ করে চলেছেন! তার মধ্যেও আজ এখানে special guest, কাল ওখানে chief guest, পরের দিন কোথাও হয়তো কোনো কিছু উন্মোচন করছেন কিংবা পুরস্কার দিচ্ছেন! কখনও আবৃত্তি করছেন, কখনও-বা রেডিয়ো বা টেলিভিশনে কিছু করছেন! আমি তো বলছি, ওঁকে পেতে গেলে এখনও আমাদের গলদঘর্ম হতে হয়। সে একটা সাংঘাতিক দুরূহ ব্যাপার! আমি কামনা করি, সৌমিত্রকাকু এইভাবেই নিজেকে ব্যস্ত রাখুন আগামী দিনগুলোতেও। উনি সুস্থ থাকুন।

আলাপচারিতা ও রেকর্ডিং: অনির্বাণ দে ও রুমা চন্দ
অনুলিখন: অনির্বাণ দে

---

৪. খোঁজখবর নিয়ে জানা গেল, এখনও সৌমিত্রবাবু তাঁর নাটকের চিন্তাভাবনা একইভাবে তাঁর খসড়াখাতায় ধরে রাখেন। তবে এখন যে-খাতা ব্যবহার করেন সেটা আক্ষরিক অর্থে ঠিক 'খেরোর খাতা' নয়। আগেকার সেইসব খেরোর খাতার হদিশ আমরা কিন্তু শেষপর্যন্ত পাইনি! সেগুলো কোথায় কার কাছে অবহেলায় পড়ে আছে (কিংবা অতিযত্নে রক্ষিত আছে) তাও জানতে ব্যর্থ হলাম। অনুগ্রহ করে কেউ সেই অমূল্য সম্পদের সন্ধান দিলে আগামী দিনে আমরা তার যথাযোগ্য বৈদ্যুতিন সংরক্ষণ ও প্রকাশের দায়িত্ব নিতে চাই। — সম্পাদক

স্যার

অশোক দাশগুপ্ত

স্যার, অধ্যাপক নিরঞ্জন গাঙ্গুলি, আপনি শুধু শ্রাবণীর নন, অসংখ্য ছাত্রছাত্রীর নন, আমাদেরও—'স্যার'। স্যার, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, শিখতে থাকি এবং বেঁচে থাকতে শিখি আপনার কাজ শুনে ও দেখে, আপনাকে দেখে। অনেক-অনেক উঁচুতে, মহাকাশে-থাকা হোমাপাখি? আপনি?... আগে বরং নাটকটা দেখতে থাকি। কেন নিঃশব্দ নৃত্য, কেন পেছনে একপাশে পর্দায় একের-পর-এক পেইন্টিং, কেন সাধারণ কথাবার্তা থেকে মাঝেমাঝেই গানে-কবিতায় অসাধারণ অস্বাভাবিক উচ্চতায় চলে-যাওয়া, বুঝতে একটু সময় লাগে। আর, স্যার, বোঝারই বা কী দরকার! বসেছি আপনার সামাজিক ক্লাসরুমে, কোথাও-একটা নিয়ে যেতে চাইছেন, সেজন্য এ সবই জরুরি, বিশ্বাস তো আছেই। আপনি আমাদের প্রস্তুত করে নিলেন—''তোমরা 'আরও-একটা নাটক' দেখতে আসনি, কান-প্রাণ খোলা রাখো, চলো।'' ....গানগুলো এসেছে ঝরনার মতো, না কি 'আমাদের ছোট নদী'-র মতো, 'চলে আঁকেবাঁকে'? শেষ গানে রীতা গঙ্গোপাধ্যায়ের মার্গীয় কণ্ঠ যখন হোমাপাখির উচ্চতায় হানা দিচ্ছে, আমাদের ভেতরটাকে নাড়া দিচ্ছে, তখনও, তখনও স্যার, দাঁড়িয়ে আছেন আপনি, অধ্যাপক নিরঞ্জন গাঙ্গুলি, স্যার সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়।

সুন্দর সরল দুই স্তরের সেট, সকলেরই চমৎকার অভিনয়, চলচ্চিত্রকর্মীদের সংগঠন 'সিনেটেল'-এর জন্য মহৎ প্রয়াস, আপনার নিখুঁত নেতৃত্বে সম্পূর্ণ সমন্বয়—আর কী চাই! ''যাহা চাই তাহা পাই না'' নয়, যা পাওয়ার আশা করি না, তাও পাই! তাই বলে এত পাওয়া? এতখানি পাওয়ার যোগ্য কি আমরা? হীনম্মন্যতা ছুড়ে উঠে দাঁড়াতে অবশ্য সময় লাগে না—স্যার, আপনার কাছে পাওয়ার অধিকার আছে আমাদের। জীবন থেকে জীবন পাওয়ার অধিকার আছে আমাদের। আমাদের স্যারের নাম যে নিরঞ্জন গাঙ্গুলি ওরফে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়! এমনিতে অমিল কম নয়। একজন অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক; অন্যজন চিরজীবন্ত শিল্পী—চূড়ান্ত ব্যস্ত ও সফল। একজন পাঁচবার আত্মঘাতী হতে চেয়েছেন 'ওভারডোজ' করে; অন্যজনের এই ভাবনার প্রশ্ন নেই, সময়ও নেই। কিন্তু আমাদের মতো সাধারণ মানুষকে আশ্চর্য উচ্চতায় নিয়ে যাওয়ার গল্পে, জীবনের ক্ষুদ্র ঘন বিপর্যয়ের সঙ্গে লড়াইয়ের ক্ষেত্রে, একই জায়গায়—বলা যায়, একই হয়ে গিয়ে—দাঁড়িয়ে আছেন নিরঞ্জন গাঙ্গুলি এবং সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়। উনি ও আপনি, অথবা দুজন আপনি, আমাদের 'স্যার'।

মনোরোগের বিজ্ঞান *হোমাপাখি* নাটকে এসেছে আধার হিসেবে, বিষয়পাত্র হিসেবে, না-হলে শ্রাবণী লন্ডনপ্রবাসিনী সাইকিয়াট্রিস্ট নাও হতে পারত। শুরু হয় বিষয় থেকে, কিন্তু সে তো আর ওই জায়গাতেই আটকে থাকে না! আপনি, আপনিই ভেঙেচুরে এগিয়ে যান,

বিষয়কে অবজ্ঞা না-করে বিষয়োত্তর বিস্ময়ে পৌঁছে দেন আমাদের। এবং পৌঁছে দিয়ে ছেড়ে চলে যান না। গভীর রাত, পরদিন সকাল, বাকি জীবনেও থেকে যায়, থেকে যান।

প্রাক্তন ছাত্রী, সাইকিয়াট্রিস্ট শ্রাবণীকে মানসিক সংকট থেকে মুক্ত করছেন আপনি, গান ও কবিতায় ভরপুর থেকে যিনি আবেগ ও আনন্দ নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন, পাঁচ ফুট-সাড়ে এগারো ইঞ্চি কে বলল, আরও অনেক-অনেক লম্বা। লম্বা নয়, উঁচু। উঁচু, কিন্তু তাকিয়ে থাকতে থাকতে আমাদের ঘাড়ে ব্যথা হয় না, আমরা কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখার পুলকে বিস্ময়ে স্থির ও অস্থির হয়ে থাকি। অসুখ ও অবসাদের বিরুদ্ধে পরিবেশ ও পারিপার্শ্বিকের বিরুদ্ধে, অথবা এ সবই সঙ্গে নিয়ে এক আশ্চর্য লড়াই নিরঞ্জন গাঙ্গুলির, নিখুঁত ও রোমাঞ্চকর অভিনয় সত্ত্বেও যিনি আমাদের কাছে হয়ে থাকেন সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, স্যার। জয়ী মেধা, জয়ী মন, জয়ী প্রাণ, জয়ী মনুষ্যত্ব। এই লড়াইটায় আমাদেরও থাকতে হবে, একাত্ম হয়ে লড়তে হবে, প্রথমার্ধে বুঝতে দেননি। আমরা বোঝার চেষ্টাও করিনি। কী দরকার! আমরা তো স্যারের সামনে বসে আছি, শ্রোতা ও দর্শক, ছাত্র ও ছাত্রী।

স্যার, সৌমিত্র স্যার, একটা সমস্যা আছে। কুড়ি বছর পর এই নাটকটা কী-করে মঞ্চস্থ হবে? কে থাকবেন অধ্যাপক নিরঞ্জন গাঙ্গুলির চরিত্রে? ভাবলে ভাবা যায়, কেউ আসবেন, কেউ একজন যিনি পারবেন। কিন্তু স্যার, চূড়ান্ত আশাবাদী হয়েও তেমন ভাবতে পারছি না। রবীন্দ্রনাথ, জীবনানন্দ, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, শক্তি চট্টোপাধ্যায় এবং আপনার লেখা কবিতা এমন সহজ দাপটে কে আনবেন স্বচ্ছন্দ সংলাপে? যদি তা না-আসে, কী-করে 'প্রস্তুত' হবেন বিশ বছর পরের দর্শক?

৪ আগস্ট প্রথম অভিনয়। নাটক শেষ, কার্টেন কল। মঞ্চের কাছে গিয়ে ঝুঁকে পড়ে অভিনন্দন জানালেন মৃণাল সেন। আমাদের 'প্রতিনিধি'। আপনি, পাঁচ সাড়ে-এগারো, আশ্চর্য ভঙ্গিতে হয়ে গেলেন তাঁর মুখোমুখি, নিখুঁত মুদ্রায় বললেন, "সকালে ফোনে কথা হবে।" না কি সেই রাতেই? অত্যাশ্চর্য নাটকের প্রথম সন্ধ্যা। স্যার, যতই আপনি 'স্যার' হন, চাপা টেনশন তো থাকেই! ক্লান্তি কি শুধু শরীর বেয়েই নামে? এবার আপনি যাবেন গ্রিন রুমে। সেখানেও অভিনন্দনের কোলাহল, তবু তো মঞ্চ থেকে ছুটি? ...না। দর্শকদের দাবি, কিছু বলতে হবে। শেষ লাইন এইরকম: "যদি শরীর ঠিক থাকে, যদি মন ঠিক থাকে, আমি চেষ্টা করে যাব। আর কোনোভাবে তো আপনাদের সেবা করতে পারব না!" স্যার, নিরঞ্জন স্যার, সৌমিত্র স্যার, আপনি এভাবে এ কথা বলে আমাদের অবসাদে ঠেলে দিতে পারেন না। শরীর ও মন ভালো তো রাখতেই হবে—আমাদের, আমাদেরই জন্য। সমাজের জন্য।

স্যার, আপনার কাছে শিখে শিখে আমাদেরও কিছু বলার সাহস হয়েছে। 'হোমাপাখি' নন—যে-পাখি অসীম আকাশে অনন্ত উচ্চতায় ডিম পাড়ে, নামতে নামতে ডিম ফোটে,

পাখিশিশু তখন অনন্ত মহাশূন্যে ফিরে যায়, উড়ে যায়, মর্ত্যভূমি স্পর্শ করে না। অধ্যাপক নিরঞ্জন গাঙ্গুলি ওরফে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, কানমলা খাওয়ার ঝুঁকি নিয়েও বলব, আপনি 'হোমাপাখি' নন, মানুষ—যে-মানুষ শক্তি ও সৌন্দর্য, সাহস ও ভালোবাসা শুষে নেয় এই মাটি থেকেই, এবং তা ছড়িয়ে দেয় অন্য মানুষের মধ্যে। স্নিগ্ধতায়, অপাপবিদ্ধতায়, মানবিক ঐশ্বর্যে আপনি এবং আপনি—দুই স্যার—অবশ্যই হোমাপাখি, উচ্চতায়। কিন্তু আপনারা দুজনই, অথবা দুজনে একজনই, আছেন আমাদের সঙ্গে, এই মাটির পৃথিবীর মানুষের সঙ্গে। কে উড়ে ফিরে যেতে দিচ্ছে?

[আজকাল *সংবাদপত্রের ১৩ আগস্ট ২০০৬ সংখ্যা থেকে লেখকের অনুমতিক্রমে এবং গ্রন্থাগারিক দেবাশিস মুখোপাধ্যায়ের সৌজন্যে (ঈষৎ পরিমার্জনা-সহ) পুনঃপ্রকাশিত হল।*]

অসীমের মাঝেও সীমা: আমার দেখা সৌমিত্রদা

জগন্নাথ বসু

আমি বরাবরই সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের বিশেষ অনুরাগী। বিভিন্ন ক্ষেত্রে বাঙালি এক-একটা বিভাজন করে নেয়, নিজেদের মধ্যে দুটো গোষ্ঠী তৈরি করে নেয়, ঠিক যেমন মোহন বাগান বনাম ইস্ট বেঙ্গল। তেমনই আমাদের ছোটোবেলায় ছিল উত্তমকুমার বনাম সৌমিত্র। তো এই সময়ে বেশিরভাগ মানুষই উত্তমকুমারের দিকে ঝুঁকে থাকলেও আমার পাল্লাটা কিন্তু সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের দিকেই একটু ভারী ছিল। যদিও রোমান্টিক অভিনেতা হিসাবে উত্তমকুমারকে অন্যান্য দর্শকদের মতোই আমারও অসাধারণ লাগত, তবু আমি সৌমিত্রকে বেশি পছন্দ করতাম এই কারণেই যে, ওঁর অভিনয়ের মধ্যে যে প্রথাভাঙার ব্যাপারটা ছিল, সেটা আমাকে খুব টানত।

আসলে অভিনয়ের ক্ষেত্রে মূলত দুটো ধারা (schools) আছে। প্রথম ধারাটা খুব পুরোনো দিন থেকেই আমরা দেখে এসেছি; সেটা হল theatrical acting-এর ধারা, অর্থাৎ নাটকের ঘাত-প্রতিঘাতকে একটা কাব্যিক অভিনয়ের মাধ্যমে ফুটিয়ে তুলে দর্শকাবেগকে একটা অন্য মাত্রায় পৌঁছে দেওয়া। এই ধারার সর্বশ্রেষ্ঠ উদাহরণ শম্ভু মিত্র। আর-একটা ধারা অপেক্ষাকৃত নতুন; একে বলা যায় non-acting-এর ধারা। এই ধারার অভিনেতাদের মধ্যে ছিলেন যোগেশ চৌধুরী, মহর্ষি মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, তুলসী লাহিড়ী, গঙ্গাপদ বসু, প্রমুখ দিক্‌পাল অভিনেতা। মনে করুন, এই গঙ্গাপদ অভিনয় করছেন বহুরূপীতে, শম্ভু মিত্র-র বিপরীতে। শম্ভু মিত্র যেখানে তাঁর কাব্যিক অভিনয় দিয়ে দর্শকাবেগকে একটা অন্য মাত্রায় নিয়ে যাচ্ছেন যা অনেকসময় বাস্তব জীবনের চেয়েও অনেক ওপরে চলে যাচ্ছে, সেখানে গঙ্গাপদ বসু তাঁর জীবনানুগ অভিনয় দিয়ে দর্শককে ধরতে চাইছেন। একজন more than reality-তে চলে যাচ্ছেন, তো আর-একজন থাকছেন reality-তেই। এই দ্বিতীয় ধারার অভিনয়কে আলাদা করে অভিনয় বলে মনে হয় না বলেই একে non-acting বললাম।

অভিনয়ের এই দ্বিতীয় ধারার পরবর্তীকালের অভিনেতা হলেন সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়। আমার ছেলেবেলায় যখন ওঁর অভিনয় দেখেছি তখন অভিনয়ের এইসব ধারাটারার কথা আমি জানতাম না। কিন্তু দেখতাম, পাশাপাশি দুজন অভিনেতার অভিনয়ের মধ্যে একটিকে অতিস্বাভাবিক ও জীবনানুগ মনে হচ্ছে—অভিনয়টাকে যেন অভিনয় বলে মনেই হচ্ছে না! আমি নিজে যেহেতু সবাই যে-পথে চলে তার থেকে অন্য পথে চলতেই বেশি ভালোবাসতাম (এমনকি পরবর্তীকালে বেতার-নাটকের ক্ষেত্রেও আমি নিজে সেই ধারা প্রয়োগ করেছি

এবং প্রথাভাঙা শিল্পীদের নিয়েই কাজ করেছি), তাই স্রোতের-বিপরীতে-হাঁটা এইসব অভিনেতাদের—বিশেষ করে সৌমিত্রদাকে—আমার খুব পছন্দ ছিল।

তবে অভিনয়ের প্রতিভার পাশাপাশি আর-একটা ব্যাপারও সৌমিত্রদার ক্ষেত্রে খুব উল্লেখযোগ্য। তিনি খুব কম বয়সেই নাট্যাচার্য শিশিরকুমার ভাদুড়ীর সান্নিধ্যে আসতে পেরেছিলেন, এমনকি তাঁর সঙ্গে এক-আধবার মঞ্চাভিনয় করার সুযোগও পেয়েছিলেন। একই মানুষ আবার পরবর্তীকালে চলচ্চিত্রে অভিনয় শুরু করেন বিশ্ববন্দিত চলচ্চিত্রনির্মাতা সত্যজিৎ রায়ের হাত ধরে, এবং ক্রমে-ক্রমে সত্যজিৎবাবুর মানসপুত্র হয়ে তাঁর সেরা ছবিগুলোতে কাজ করার সুযোগ লাভ করেছিলেন। মঞ্চে শিশির ভাদুড়ী আর চলচ্চিত্রে সত্যজিৎ রায়ের সান্নিধ্য—এই দুর্লভ সঙ্গম কিন্তু খুব কম লোকের জীবনেই আসে! আমি শিশিরবাবুকে পাইনি, কিন্তু আকাশবাণীতে সত্যজিৎ রায়ের লেখা গল্প নিয়ে *সেপ্টোপাসের খিদে* নামক বেতার-নাটক করার সুবাদে লেখক সত্যজিতের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার সুযোগ আমার হয়েছিল। একটা নাটকে তাঁর সঙ্গে ওই দিনকয়েকের জন্য কাজ করেই আমি যদি এত পাথেয় সংগ্রহ করতে পারি, সৌমিত্রদা তাহলে এরকম একজন মানুষের সঙ্গে বছরের-পর-বছর কাজ করার সুযোগ পেয়ে যে কত মণিমুক্তো সংগ্রহ করতে পেরেছিলেন তা সহজেই অনুমান করতে পারি। এইদিক থেকে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়কে সৌভাগ্যবান বলা যায়। এর পাশাপাশি জন্মগত কারণে আর-একটি জিনিস তাঁকে সৌভাগ্যবান করে তুলেছে। সেটি হল তাঁর সুন্দর চেহারা। ওঁর মতো সুপুরুষ অভিনেতা খুব কমই এসেছেন।

তবে সৌভাগ্য থাকলেই তো শুধু হয় না, তাকে সঠিকভাবে ব্যবহার করতে ক-জন পারেন? সৌমিত্রদার মতো অধ্যবসায়, পরিশ্রম করার ক্ষমতা আর অফুরন্ত প্রাণশক্তিই বা ক-জন শিল্পীর আছে? ওঁকে শিল্পী বললাম এই কারণেই যে, উনি নিজেকে শুধু অভিনয়েই সীমাবদ্ধ রাখেননি, শিল্পসংস্কৃতির প্রায় সমস্ত শাখাতেই উনি অবাধে বিচরণ করেন। সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় শুধু একজন নাট্যব্যক্তিত্ব ও চিত্রতারকা হয়েই থেমে থাকেননি, উনি আবৃত্তি করেন, নিজে কবিতা লেখেন, প্রবন্ধ লেখেন, সাহিত্যপত্রিকার সম্পাদনাও করেছেন একইসঙ্গে। এবং সমস্ত ক্ষেত্রেই তিনি অল্পবিস্তর সাফল্য পেয়েছেন। হয়তো তিনি কবিতা লেখার ক্ষেত্রে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় কিংবা শক্তি চট্টোপাধ্যায় হননি, হয়তো তিনি আবৃত্তির ক্ষেত্রে কাজী সব্যসাচী কিংবা শম্ভু মিত্র হয়ে ওঠেননি, কিন্তু একটা কথা নিঃসন্দেহে বলা যায়—তিনি সমস্ত ক্ষেত্রেই সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় হয়ে উঠেছেন। তিনি যখন যে-কাজটাই করেছেন, সেটাই নিজের মতো করে করেছেন, প্রচলিত পথে না-হেঁটেই করেছেন। এই যে শিল্পের সমস্ত ক্ষেত্রেই পরীক্ষানিরীক্ষা করে নিজস্বতা বজায় রাখার চেষ্টা, এটাই সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়কে করে তুলেছে একজন যথার্থ শিল্পী, একজন complete artiste। অভিনেতা

হিসাবেও উনি নিজেকে একটা নির্দিষ্ট গণ্ডিতে আটকে রাখেননি। একজন বিশিষ্ট চিত্রতারকা হয়েও উনি মানুষের কাছ থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখেননি। উনি সবার সঙ্গেই মিশতে পারেন। প্রকৃত বুদ্ধিজীবী হয়েও সাধারণ মানুষের কাছাকাছি আসতে চেয়েছেন বলেই হয়তো অত্যন্ত সাধারণ মানের চলচ্চিত্রেও খ্যাতিমান অভিনেতা হওয়া সত্ত্বেও উনি কাজ করতে পিছপা হননি কখনও। যে-পরিচালক যেমনভাবে ওঁকে চেয়েছেন, সেভাবেই কাজ করেছেন। বুদ্ধিজীবী হয়ে বসে-থাকার চেয়ে পেশাদার শিল্পী হিসাবেই কাজের মধ্যে থাকতে চেয়েছেন চিরকাল। এখনও এই বয়সেও উনি থেমে নেই! কিছুদিন আগে উনি একটা দুরারোগ্য ব্যাধির কবলে পড়েছেন। সঙ্গেসঙ্গে লন্ডনে চিকিৎসা করাতে চলে গেলেন বটে, কিন্তু ফিরে এসেই আবার ডুবে গেলেন কাজের মধ্যে। এই প্রাণশক্তি আর মনের জোর আমাকে বিস্মিত করে।

যদিও সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় তাঁর কর্মজীবন শুরু করেছিলেন আকাশবাণী কলকাতা কেন্দ্রের বেতার-ঘোষক (radio announcer) হিসাবে, আর পরবর্তীকালে আমিও আকাশবাণীতে যোগ দিই, তবুও আমি তাঁকে তখন সেখানে পাইনি। এর কারণ একটাই— উনি মাত্র বছরদেড়েকের জন্য বেতারে কাজ করেছেন! পরবর্তীকালেও বেতারে কাজ করতে ওঁর খুব-একটা আগ্রহ দেখা যায়নি, অন্তত আমার দীর্ঘ বেতারজীবনেও তাঁকে আকাশবাণীমুখো হতে আমি তেমনভাবে দেখিনি। একসময় বিবিধ ভারতী-তে সত্যজিৎ রায়ের পরিচালনায় ফেলুদা-কাহিনি নিয়ে দুটো বেতার-নাটকে অভিনয় করেছেন বলে শুনেছি। বেতার-নাটক বলতে ওইটুকুই করেছেন, তাও হয়তো সত্যজিৎবাবুর অনুরোধ ফেলতে পানেনি বলেই। ইদানীং অবশ্য দু-একটা বেসরকারি FM channels-এ ওঁকে বিচ্ছিন্ন কিছু কাজ করতে শুনছি; তবে সেটাও যে খুব মনের তাগিদে করছেন, এমনটা মনে হয় না। আর এই ব্যাপারটা আমার কাছে এক মহাবিস্ময়! যে-মানুষটা বেতারে নিজের কর্মজীবন শুরু করলেন, যাঁর অভিনয়দক্ষতা প্রশ্নাতীত, যাঁর উচ্চারণ এত স্পষ্ট, যাঁর tonal quality এত ভালো, কণ্ঠস্বরের modulation-এ যিনি পারদর্শী, সেই সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় বেতার-নাটকের স্বর্ণযুগেও বেতারের অপার শক্তিকে ধরতে পারলেন না কেন? আমি জানি না, তিনি যখন আকাশবাণীর ঘোষক ছিলেন তখন কোনো কারণে আহত হয়ে বেতার সম্পর্কে উৎসাহ হারিয়ে ফেলেছিলেন কি না। হয়তো তিনি নিজেও বেতারকে গুরুত্ব দেননি, আবার তখনকার বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র প্রমুখেরাও তাঁকে তেমনভাবে আমন্ত্রণ জানাননি। যে-কোনো কারণেই হোক, একজন বাচিক শিল্পী হয়েও উনি বেতারের অনন্ত শক্তি সম্বন্ধে উদাসীন থেকেছেন। এর ফলে দুটো ব্যাপার ঘটল। এক, সৌমিত্রবাবুর মতো একজন যথার্থ শিল্পী নিজে বেতার-নাটকে অভিনয়ের স্বাদ পূর্ণমাত্রায় পেলেন না। অন্যদিকে বেতার মাধ্যম এবং তার অগণিত মন্ত্রমুগ্ধ শ্রোতা বঞ্চিত

হল তাঁর মতো বিরল অভিনেতার কণ্ঠস্বর থেকে। তার মানে, দু-পক্ষেরই ক্ষতি হল। প্রকৃতপক্ষে বেতার-নাটক অন্য সমস্ত নাটকের চেয়ে প্রকৃতিতে সম্পূর্ণ ভিন্নতর। শুধুমাত্র শব্দের প্রয়োগে শ্রোতামানসে এক-একটা ছবি তৈরি করা হয় প্রতিমুহূর্তে। মহাভারতের সঞ্জয় ঠিক যেভাবে ধৃতরাষ্ট্রকে যুদ্ধের ধারাভাষ্য দিয়েছিলেন, বেতার-নাটকে অভিনয়ের ব্যাপারটাও অনেকটা সেইরকম। বেতার-নাটক একটা সময়ে কোন্ উচ্চতায় পৌঁছেছিল তা সারা বাংলার মানুষ জানেন। বিকাশ রায়, অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, দিলীপ রায়, প্রমুখ খ্যাতিমান অভিনেতা দুর্ধর্ষ অভিনয় করে গেছেন আকাশবাণী-প্রযোজিত বিখ্যাত সব বেতার-নাটকে। আর সেখানে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ই নেই!

ব্যক্তিগতভাবে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে আমার সম্পর্ক খুবই মধুর। আকাশবাণী-তে না-পেলেও তাঁর সঙ্গে আলাপের সুযোগ থেকে আমি বঞ্চিত হইনি। আটের দশকে কোনো-একটি অনুষ্ঠানে তাঁর সঙ্গে আমার আলাপ হয়। আমি যখন তাঁকে প্রণাম করলাম, উনি বললেন, "আরে, আপনিই জগন্নাথ বসু!" তখন আমার চেহারা তো খুব-একটা দেখতে পাওয়া যেত না, কিন্তু আমাকে উনি নামে চেনেন দেখে আমি সম্মানিত বোধ করেছিলাম। অবশ্য ততদিনে বেতার-নাটকে অভিনয়, আবৃত্তি, ইত্যাদির সুবাদে লোকে আমার নাম একটু-আধটু জানতে শুরু করেছে। তারপর তো বিভিন্ন সময়ে আমরা একসঙ্গে অনেক কাজই করেছি। দূরদর্শন ছাড়াও বিভিন্ন আবৃত্তি ও নাটকের অনুষ্ঠানে (যেমন *শেষের কবিতা*-র রেকর্ডিংয়ে) ওঁর সঙ্গে কাজ করেছি। বিভিন্ন অনুষ্ঠানে যখনই ওঁর সঙ্গে দেখা হয়, অনেক আলোচনা হয়। অনেক মজার-মজার বিষয় নিয়ে গল্প আর আড্ডাও হয়। উনি খুবই রসিক মানুষ—মজা করে অনেক কথা বলতে পারেন। বাইরে যখন অনুষ্ঠান করতে যাই, ওঁর সঙ্গে অনেক serious আলোচনাও হয়। একবার নাগপুরে একটা অনুষ্ঠানে গিয়েছিলাম। ওখানে তো ওঁর সঙ্গে কত কথাই হল। মঞ্চ ও চলচ্চিত্রের দুজন দিক্‌পাল নির্দেশকের সঙ্গে ওঁর কাজ করার অভিজ্ঞতা কেমন তা জানার অনুসন্ধিৎসা আমার অনেকদিন ধরেই ছিল। আমি খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে সমস্ত জানতে চাইলাম। উনি কিন্তু আমার এই অনুসন্ধিৎসার জন্য একটুও বিরক্তি প্রকাশ করেননি, বরং ধৈর্য ধরে খুব সুন্দরভাবে আমার সমস্ত জিজ্ঞাসার উত্তর দিয়ে গেলেন। এই হলেন আমার দেখা সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়।

সৌমিত্রদা সুস্থ থাকুন, ভালো থাকুন। যেভাবে তিনি এতদিন আমাদের আনন্দ দিয়ে এসেছেন সেইভাবেই দিতে থাকুন। আরও অনেক কাজ করুন। তার সঙ্গে আমার অপূর্ণ সাধটুকুও পূরণ করুন—তিনি বেতার-নাটকে অভিনয় করুন; তাঁর অভিনয়ের বৃত্তটা সম্পূর্ণ হোক।

আলাপচারিতা ও রেকর্ডিং: **অনির্বাণ দে**
অনুলিখন: **অনির্বাণ দে ও সুজয় মণ্ডল**

অভিনয়ের অন্তরে

অরুণেন্দ্র মুখোপাধ্যায়

প্রথমেই বলে রাখা ভালো যে, আমি কোনো নাট্যকর্মী নই— কোনোকালে কোনো নাট্যদলের সঙ্গে আমার কোনোরকম সম্পর্ক ছিল না। এমনকি আমি কোনো নাট্যসমালোচকও নই। তবে এ কথা সত্যি যে, আমি প্রায় অর্ধশতাব্দি ধরে অসংখ্য নাটকের দর্শক। আমাদের যৌথ পরিবারে সকলে মিলে সিনেমা-থিয়েটার দেখতে যাবার একটা রীতি ছিল, এবং সেই দলে আমিই ছিলাম কনিষ্ঠতম সদস্য। সকলে যখন যাচ্ছে তখন আমি কার কাছে থাকব—মূলত এই চিন্তা থেকেই আমি আমাদের গোটা পরিবারের সঙ্গে সিনেমা-থিয়েটার দেখতে যাওয়ার সুযোগ পেতাম। সেই সুবাদে বাল্যকালেই বহুরূপী আর লিট্‌ল থিয়েটার গ্রুপ অর্থাৎ এলটিজি-র (যা পরবর্তীকালে পিপল্‌স লিট্‌ল থিয়েটার বা পিএলটি হয়েছে তার) অধিকাংশ নাটকই দেখার সৌভাগ্য আমার হয়েছে। তখন জোছন দস্তিদার, তরুণকুমার, মনু মুখোপাধ্যায়-দেরও একটা দল ছিল। নাম ছিল তার বৈশাখী। এই দলে আমার মেজোমামা সমীর বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন নিয়মিত অভিনেতা। মেজোমামার নাটক দেখব বলে বৈশাখীর বহু নাটকও আমার দেখা হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু তখন আমার যা বয়স তাতে নাটক দেখার আনন্দটাই মুখ্য ছিল। বহুরূপীর নাটক দেখতে গিয়ে কে শম্ভু মিত্র, কে তৃপ্তি মিত্র, কে মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, কে গঙ্গাপদ বসু, কে কুমার রায়, কে অমর গঙ্গোপাধ্যায়, কিংবা এলটিজি-র নাটকে কে উৎপল দত্ত, কে শোভা সেন, কে শেখর চট্টোপাধ্যায়, কে রবি ঘোষ, কে সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়, আর কে-ই বা হারাধন বন্দ্যোপাধ্যায়, তা বোঝার ক্ষমতা ছিল না। আর ঠিক সেই কারণেই রেগুলার বোর্ডের নাটক *তাপসী* দেখতে গিয়ে কে যে তার নায়কের চরিত্রে অভিনয় করছেন সে-কথাও তখন ভেবে দেখিনি। তবে বড়োদের আলোচনা থেকে এটুকু বুঝেছিলাম যে, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় নামের ওই ভদ্রলোক সত্যজিৎ রায়ের *অপুর সংসার*-এর নায়ক অপূর্বকুমার রায়ের চরিত্রে অভিনয় করে সকলকে একেবারে মুগ্ধ করে দিয়েছিলেন। তখন কি আর ভেবেছিলাম যে, ওই ভদ্রলোকের এত কাছে যাবার সৌভাগ্য আমার হবে!

সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়কে সামনাসামনি দেখা সেই আমার প্রথম, তবে সেটাকে যদি 'প্রথম দেখা' বলে ধরা হয়। বড়ো হয়ে ওঁকে আমি প্রথম দেখি মান্না দে-র একটা মিউজিক টেকিংয়ে। সেই থেকে আমার মুগ্ধতার শুরু; আর সেই মুগ্ধতার রেশ ধরে আমি যেদিন

প্রথম ওঁর বাড়িতে গিয়ে হাজির হই, তখন ওঁরা সবে লেক টেম্পল রোডের ফ্ল্যাটে এসেছিলেন। ১৯৭০ সালে সত্যজিৎ রায় ৩ লেক টেম্পল রোডের তিনতলার ফ্ল্যাট ছেড়ে ১/১ বিশপ লেফ্রয় রোডের তিনতলায় বিশাল ফ্ল্যাটে চলে যান, এবং সত্যজিৎ রায়ের ছেড়ে-দেওয়া ফ্ল্যাটে আসেন সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়। চাটুজ্জে পরিবারের সঙ্গে সেই আমার সম্পর্কের শুরু, যা আজও অক্ষুণ্ণ রয়েছে। আর সেই থেকে আমি সংগ্রহ করে চলেছি সৌমিত্র-জীবনের অসংখ্য তথ্য।

সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় প্রথম কবে অভিনেতা হিসেবে দর্শকের সামনে এসেছিলেন তার সঠিক দিন-তারিখ বলা মুশকিল, কারণ কৃষ্ণনাগরিক সৌমিত্র তাঁর শৈশবে তাঁদের কৃষ্ণনগরের বাড়ি 'সুধা নিলয়'-এর উঠোনে তক্তাপোশের স্টেজ বেঁধে, বিছানার চাদর কিংবা মায়ের শাড়ি দিয়ে ব্যাকড্রপ করে, আর দরজা-জানলার পর্দা কার্টেন হিসেবে ঝুলিয়ে রবীন্দ্রনাথের মুকুট আর রূপকথার-গল্প-নিয়ে-লেখা দু-একটা নাটকে অভিনয় করেছিলেন। সেইসব নাটকের মেক-আপ আর্টিস্ট এবং সেট ডিজাইনার ছিলেন সৌমিত্র-জননী আশালতা দেবী। তবে শুধু আশালতাই নন, সৌমিত্র-র গোটা পরিবারই তাঁর এই নাট্যচর্চায় উৎসাহ দিতে দর্শক হিসেবে উপস্থিত থাকতেন।

সৌমিত্র-র মনে অভিনেতা হওয়ার তাগিদ যেসব কারণে সঞ্চারিত হয়েছিল সেগুলির মধ্যে অন্যতম প্রধান হল প্রচণ্ড এক হীনম্মন্যতাবোধ। তাঁদের পরিবারের সকলেই সুপুরুষ ছিলেন। একমাত্র তিনিই নাকি ছিলেন ব্যতিক্রম—রাজহংসের দলে নেহাতই এক কালো রোগা পাতিহাঁস! এমনকি তাঁর ঠাকুরদাদা ললিতকুমার চট্টোপাধ্যায়ও নাকি প্রায়ই বলতেন, "আমাদের বাড়িতে এমন একটা কেলেকুচ্ছিত ছেলে কী-করে হল!" ঠাকুরদাদার এই কথাই সৌমিত্র-র মনে এক জেদের সৃষ্টি করে। তিনি যে রোগা-কালো-কুৎসিত, এমন ধারণাকে নস্যাৎ করার জন্যে, তিনি যে কারও থেকে কোনো অংশে কম নন সে-কথাটা প্রমাণ করার জন্যে সৌমিত্র অভিনেতার জীবন বেছে নেন।

অভিনয় ব্যাপারটা যে সৌমিত্র-র রক্তমজ্জায় মিশে ছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায় তাঁর ছোটোবেলার একটা মজার ঘটনা থেকে। সৌমিত্র তখনও 'সৌমিত্র' হয়ে ওঠেননি, আত্মীয়স্বজন-বন্ধুবান্ধবের কাছে তখনও তিনি 'পুলু' নামেই পরিচিত ছিলেন। যে-সময়ের কথা বলছি, তখন পুলুর বয়স নয় কিংবা দশ—ক্লাস ফোর বা ফাইভে পড়ে। তার ঠাকুরদাদা ছিলেন কৃষ্ণনগরের একজন নামজাদা উকিল। তখন কৃষ্ণনগরে ভালো হোটেল বা অন্য-কোনো থাকার জায়গা প্রায় ছিলই না বলে ললিতকুমারের যেসব মক্কেল দূর থেকে

আসতেন তাঁরা অনেকসময় পুলুদের বাড়িতেই কয়েক রাত কাটাতে বাধ্য হতেন। অত্যন্ত মিশুকে স্বভাবের পুলুর সঙ্গে তাঁদের অধিকাংশেরই বেশ-একটা পরিচয় গড়ে উঠত। একবার এমনই এক ভদ্রলোক তাঁদের বাড়িতে দিনদুয়েক ছিলেন। তাঁর সঙ্গেও পুলুর বেশ আলাপ জমে গিয়েছিল। এই ভদ্রলোকের সঙ্গে খুব সুন্দর একটা চামড়ার সুটকেস ছিল। ললিতবাবুর সঙ্গে আদালতে বেরোনোর আগে সেই ভদ্রলোক পুলুকে ডেকে বললেন, "শোনো বাবা, আমার এই সুটকেসটায় চাবি নেই। এতে বেশকিছু টাকা আছে। এটাকে এ-ঘরে রেখে যাব?" পুলু বলল, "হ্যাঁ হ্যাঁ, আপনি রেখে যেতে পারেন। এ-ঘরে কেউ তেমন আসেটাসে না।" ভদ্রলোক বলেন, "তাহলেও বাবা তুমি একটু লক্ষ রেখো। অনেকগুলো টাকা তো? পাঁচশো টাকা। এই দ্যাখো, টাকাটা সুটকেসের এই ভেতরের পকেটে রইল।" এই বলে ভদ্রলোক টাকাটা কোথায় রেখেছেন পুলুকে দেখিয়েও দিলেন। পুলু তাঁকে আশ্বাস দিয়ে বলল, "আপনি নিশ্চিন্তে যান। আমি লক্ষ রাখব।" তার কথায় খুশি হয়ে ভদ্রলোক আদালতে চলে গেলেন।

ভদ্রলোক বেরিয়ে যাওয়ার পর পুলু পড়ল চিন্তায়। পাঁচশো টাকা তখন সত্যিই অনেক টাকা। বাড়িতে বাইরের কত লোকই তো যাতায়াত করছে! কার কী মতলব কে জানে? একটুক্ষণ চিন্তা করে পুলু সুটকেসটা খুলে পুরো টাকাটাই নিজের পকেটে রাখল। তাহলে অন্তত চুরির ভয় তো আর থাকছে না! কিন্তু তারপরেই তার মাথায় দুর্বুদ্ধির পোকাগুলো নড়েচড়ে উঠল। নির্লিপ্ত মুখে বুক ফুলিয়ে সে সোজা গিয়ে হাজির হল পাশের বাড়িতে—তার বন্ধু নিমাইয়ের কাছে। ওই বাড়িতে তখন বঙ্কুবিহারী পণ্ডিত বলে কৃষ্ণনগর কলেজের এক অধ্যাপক থাকতেন—যাঁর এক মেয়ে অভিনেত্রী কুন্তলা চট্টোপাধ্যায় এবং এক জামাই অভিনেতা মিহির ভট্টাচার্য। সেখানে গিয়ে নিমাইকে টাকাটা দেখিয়ে পুলু পুরো ঘটনাটা ফিসফিসিয়ে বলল। তারপর সে যোগ করল আসল কথাটা। পুলু নিমাইকে বলল যে, ওই পাঁচশো টাকা সম্বল করে সে বাড়ি ছেড়ে পালাচ্ছে—অভিনেতা হবে বলে সে বম্বে চলল। কথাটা শুনে নিমাইয়ের পিলে চমকে উঠল। কিন্তু সে পুলুর কথা অবিশ্বাসও করতে পারল না, কারণ পুলু যে তাকে ওই পাঁচশো টাকা দেখিয়েছে, এমনকি কোত্থেকে সে টাকাটা পেয়েছে তাও বলেছে! অতএব, বিশ্বাস না-করে আর উপায় কী? পুলুকে ঘরে বসিয়ে নিমাই ছুটল এই মারাত্মক খরবটা বড়োদের জানাতে। ছেলের মুখে এ কথা শুনে বাড়িসুদ্ধু প্রায় সকলেই ছুটে এলেন পুলুর কাছে। তারপর শুরু হল তাঁদের উপদেশবর্ষণ: "তোমার মতো হিরের-টুকরো ছেলে বাড়ি ছেড়ে পালাবে কোন্ দুঃখে?" "বাবা-মার কথাটা একবার

ভাব্, পুলু।" "তোর মতো এত ভালো ছেলে পরের টাকা চুরি করবে? ছি!" "এ যে মহাপাপ! তোর এত অধঃপতন হয়েছে? ছিছি!" এমনিসব নানা উপদেশ। পুলু কিন্তু নির্বিকার; মুখ নীচু করে হাসি চেপে বসেই আছে চুপচাপ! বহুক্ষণ এইভাবে চলার পর বড়োদের যখন ধারণা হল পুলুকে তার সংকল্প থেকে টলানো যাবে না, তখন তাঁরা তার বাড়িতে খবরটা দিতে উদ্যত হলেন। আর তো চুপ করে থাকা চলে না! এইবার হেসে ফেলে আসল ঘটনাটা সকলকে জানিয়ে দিল পুলু। "এটা ঠিক বলে বোঝানো যায় না যে আমার অভিনয়টা তখন কতদূর বিশ্বাসযোগ্য হয়ে উঠেছিল। তবে পরিষ্কার মনে আছে, আমার বলার ধরনেই হোক কি কথাতেই হোক, ওঁরা আমাকে বিশ্বাস করে ফেলেছিলেন—দুম করেই! যেমনভাবে ম্যাজিশিয়ান চমকে দেয় দর্শকদের, অনেকটা সেভাবেই অভিনয় করে মিথ্যেকে সত্যি করার প্রবণতা ছিল আমার মধ্যে, তখন থেকেই। পুরোপুরি মিথ্যে নয়, খানিকটা সত্যির আশ্রয় তো ছিলই—পাঁচশো টাকা আমার কাছে ছিল, সেটা তো সত্যি! এতে আমাকে চট করে অনেক দূর পর্যন্ত বোঝা যায়। আমার মধ্যে এমন-একটা অস্থিরতা ছিল, এমন-একটা অনিশ্চয়তা ছিল যার জন্যে আমি তখন নিজেকে দেখানোর তাগিদে ঘটনাটা ঘটিয়েছিলাম। এই যে লোভ, আমার ভেতরের চাওয়া বা খিদেকে তা নিশ্চয়ই তৃপ্ত করত। তা না-হলে কেন আমি ওসব করতাম? তা ছাড়া ছোটোবেলা থেকেই নাটকে যে-অভিনয়টা করতাম, বরাবর আমার আগ্রহটাই ছিল টোটালি হুডউইঙ্ক করব, ধোঁকা দেব। আমার অভিনয় দেখে লোকের এমন বিশ্বাস হবে যে, মনে হবে এটা সত্যি। যে-অভিনয় মানুষের জীবনের বাস্তবকে ব্যক্ত করতে পারে না, সে-অভিনয়ে আমার রুচি নেই।"

সৌমিত্র তাঁর জীবনে দুজন দিক্‌পালকে গুরু হিসেবে পেয়েছিলেন। তাঁদের একজন শিশিরকুমার ভাদুড়ী, অন্যজন সত্যজিৎ রায়। এই দুই ক্ষণজন্মা প্রতিভা সৌমিত্র নামক নিখাদ ইস্পাতের তরবারিকে এমনই উজ্জ্বল ধারালো করে তুলেছিলেন যে, পরবর্তীকালে সেই তরবারি অভিনয়জগতে অপ্রতিরোধ্য হয়ে উঠেছে। সত্যজিৎ রায়ের সঙ্গে সুদীর্ঘ চৌত্রিশ বছর ধরে কাজ করার সুবাদে সৌমিত্র চলচ্চিত্রের ওই মুকুটহীন সম্রাটের অর্ধেকেরও বেশি চলচ্চিত্রের সঙ্গে যুক্ত থাকতে পেরেছেন। কিন্তু সৌমিত্র নাট্যাচার্য শিশিরকুমার ভাদুড়ীর সঙ্গলাভ করেছিলেন মাত্র আড়াই বছরের মতো। তাই তিনি একবারের বেশি আর শিশিরবাবুর সঙ্গে অভিনয় করার সুযোগ পাননি। আর সেই সুযোগ এসেছিল ১৯৫৭ সালের ২৭ মার্চ উত্তর কলকাতার মার্কাস স্কোয়ারে বঙ্গসংস্কৃতি সম্মেলনের মঞ্চে। সেদিন ওই মঞ্চে শিশিরকুমারের পরিচালনায় অভিনীত হয়েছিল গিরিশচন্দ্র-র *প্রফুল্ল*। সেই রাতে যোগেশের

ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন স্বয়ং শিশিরকুমার, রমেশ করেছিলেন শিশিরানুজ মুরারিকুমার ভাদুড়ী। আর সুরেশ? সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়। নামভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন তৎকালীন বিখ্যাত অভিনেত্রী শেফালিকা ('পুতুল')-এর মেয়ে হাসি দেবী। শেফালিকা হয়েছিলেন জগমণি। নিভাননী দেবী করেছিলেন উমাসুন্দরী, রেবা দেবী জ্ঞানদাসুন্দরী, মণি শ্রীমানী মদন পাগলা। শিশিরকুমার ভাদুড়ীর পরিচালনায় এবং তাঁর সঙ্গে একই মঞ্চে দাঁড়িয়ে অভিনয় করার স্বপ্ন ওই একবারই পূর্ণ হয়েছিল সৌমিত্র-র। কিন্তু তখনও তাঁর বিস্মিত হওয়ার কিছু বাকি ছিল; কারণ অভিনয়ের পরের দিন দক্ষিণা হিসেবে শিশিরবাবু কিছু টাকা লোক-মারফত সৌমিত্র-র কাছে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন! অভিনয় করে উপার্জন সেই প্রথম। সেই টাকা দিয়ে কয়েকখানি বই কিনে শিশিরবাবুকে উপহার দিয়েছিলেন সৌমিত্র।

সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় রেগুলার বোর্ডে প্রথম অভিনয় করেন স্টার থিয়েটারের *তাপসী* নাটকে। তারিখটা ছিল ১৯৬৩ সালের ১৪ ফেব্রুয়ারি। নীহাররঞ্জন গুপ্ত-র এই কাহিনিকে নাট্যরূপ দিয়ে পরিচালনা করেছিলেন দেবনারায়ণ গুপ্ত। ওই নাটকে তাঁর নায়িকা ছিলেন বাসবী নন্দী। টানা ৪৬৭ রাত্রি, অর্থাৎ দু-বছরেরও বেশি সময় ধরে, এই নাটক অভিনীত হলেও শতাধিক রাত্রির পর *চারুলতা*-র জন্য *তাপসী*-কে ছাড়তে বাধ্য হন সৌমিত্র।

চলচ্চিত্রের আঙিনা থেকে সাধারণ রঙ্গালয়ে সৌমিত্রকে আনার পিছনে ছবি বিশ্বাসের প্রত্যক্ষ হাত ছিল। ছবি বিশ্বাস মাঝেমাঝেই সৌমিত্রকে বলতেন, "থিয়েটার কর্, থিয়েটার কর্। তোর এখন থিয়েটার করাটা খুব দরকার। যত থিয়েটার করবি, তত তাড়াতাড়ি অভিনয়ের নানা কৌশল আয়ত্ত করতে পারবি।" ছবিবাবুর মৃত্যুর কিছুদিন পরেই সৌমিত্র স্টার থিয়েটারের *তাপসী* নাটকে নায়ক দীপকের ভূমিকায় নিয়মিত অভিনয় করার জন্য চুক্তিবদ্ধ হন। নাটকটির প্রথম অভিনয়-রজনির আগে স্টার থিয়েটারের তৎকালীন স্বত্বাধিকারী সলিল মিত্র নিজে সৌমিত্রকে সঙ্গে করে নিয়ে গিয়ে সৌমিত্র-র জন্যে নির্দিষ্ট মেক-আপ রুমে পৌঁছে দেন। সলিলবাবু এমনভাবে আর-কোনো অভিনেতা বা অভিনেত্রীকে তাঁদের মেক-আপ রুমে বড়ো-একটা পৌঁছে দিতেন না। সেই মেক-আপ রুমটি তালাবন্ধ ছিল। তালা খুলিয়ে সৌমিত্র-র সঙ্গে মেক-আপ রুমে ঢুকে সলিলবাবু বলেছিলেন, "এই ঘরে ছবিদা মেক-আপ করতেন। ওঁর মৃত্যুর পর এই ঘরটা আমরা বন্ধই রেখেছিলাম। আজ আপনার জন্যে খুলে দিলাম। কেন জানেন? তার কারণ শুধু এই নয় যে, আপনি আমাদের থিয়েটারে আসা-তে আমরা খুশি হয়েছি; আরও বড়ো কারণ হল, ছবিদা আমাদের বলেছিলেন আপনাকে আমাদের থিয়েটারে নিয়ে আসতে। আমরা যে এত আগ্রহ করে, এত অনুরোধ

করে আপনাকে আমাদের থিয়েটারে নিয়ে এসেছি, সেটা কিন্তু ছবিদারই জন্যে। উনি প্রায়ই আপনার নাম করে বলতেন, 'ওকে নিয়ে এসো। তোমরা একটা ভালো হিরো পাবে, আর ও-ও কিছু শিখবে।' সেই কারণেই আপনাকে স্টারে নিয়ে আসার জন্যে আমরা সবরকমভাবে চেষ্টা করেছিলাম।''

তাপসী-র পর সৌমিত্র আবার সাধারণ রঙ্গালয়ে ফিরে আসেন ১৯৭৮ সালের ২১ ডিসেম্বর—*নাম জীবন* নাটকে নিয়মিত অভিনয় শুরু করেন কাশী বিশ্বনাথ মঞ্চে। *নাম জীবন* নাটকটা কিন্তু সৌমিত্র-র লেখা নয়, সৌমিত্র-জায়া দীপার লেখা। এরল জনের মূল রচনা *Moon on a Rainbow Shawl*-এর অ্যাডাপ্টেশান। দীপা অবশ্য নাম দিয়েছিলেন *রামধনু রঙের চাদর*। দীপার নাটকের দল প্রতিকৃতিতে অভিনয় করার জন্যে দীপা ওই নাটকটা লিখেছিলেন। কিন্তু ওটা মঞ্চস্থ হয়নি। সৌমিত্র যখন ঠিক করলেন যে, তিনি আবার সাধারণ রঙ্গালয়ে নিয়মিত অভিনয় শুরু করবেন, তখন উনি দীপার কাছ থেকে নাটকটা চেয়ে নেন। সামান্য কয়েকটা জায়গা বদলে *রামধনু রঙের চাদর* মঞ্চস্থ হতে থাকে *নাম জীবন* নামে। 'নাম জীবন' নামে কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের একটা কবিতা আছে। সৌমিত্র তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কাছ থেকে তাঁর ওই কবিতার নামটা ধার নেন।

নাম জীবন দেখে উচ্ছ্বসিত হয়েছিলেন শম্ভু মিত্র। প্রবীণ অভিনেতা নির্মল ঘোষ শম্ভুবাবু সম্বন্ধে এক জায়গায় লিখেছেন, ''হঠাৎ আমায় প্রশ্ন করলেন, 'সৌমিত্র যে 'নাম জীবন' করল, তার ওই অভিনয়ের দিকটা সজ্ঞানে করা, না এমনি করতে করতে একটা মাত্রায় পৌঁছে গেছে?' আমি বললাম, 'না, প্রতিটি কথা প্রতিটি মুহূর্তকে পরিচালক হিসেবে ও ধৈর্য সহকারে ঘষে ঘষে তৈরি করে। যে অভিনেতা বিশ্বাস করে ওর হাতে নিজেকে ছেড়ে দেবে, তার জীবনে অভিনেতা হিসেবে পরম প্রাপ্তি ঘটতে পারে।''

নাম জীবন-এর সেট হয়েছিল অসাধারণ। উৎপল দত্ত তাঁর সম্পাদিত *এপিক থিয়েটার* পত্রিকায় 'সৌমিত্রের নাম জীবন' শীর্ষক দ্ব্যর্থবোধক নামের একটা লেখায় লিখেছিলেন, ''এই সময়ে বাণিজ্যিক নাট্যশালা কাশী বিশ্বনাথ মঞ্চ—যেখানে পর পর নানা বীভৎস অর্থগৃধ্নুতার নজীর আমরা এতকাল দেখেছি—পোলের তলার সেই ক্ষুদ্রাকৃতি মঞ্চে শ্রীসৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় নাটকের সামগ্রিকতার এক অনন্য উদাহরণ স্থাপন করলেন। মঞ্চ জোড়া (এমন কি পর্দার বাইরে ঠেলে-আসা) বিশাল বস্তির সেট। তার সিঁড়ি, যার রেলিং-এর ওপর বসে কথা বলা যায়। তার গবাক্ষপথে দৃষ্টিগোচর নানা হয় স্যাঁৎসেতে কক্ষ। তার জলের কল, যা থেকে জল পড়ে। তার উঠোনে মেলে-দেয়া আর্দ্র বস্ত্র। একটি সাইকেল যা শুধু শোভা নয়,

পুরোপুরি ব্যবহৃত। অসংখ্য ছোট ছোট বস্তু, যার ব্যবহার পুংখানুপুংখ—দাড়ি কামাবার যন্ত্র, সেলাই-এর কল, ক্রিকেট-ব্যাট, টুথপেষ্ট, ট্রানজিস্টার এবং তার ঘোষণাদি। বাস্তববাদী নাট্যশালার যে পাঠ স্তানিস্‌লাভস্কি দিয়ে গেছেন বিশ্বকে, এবং যে-পাঠ বাংলা নাট্যশালায় আলস্য ও স্থূলত্বহেতু প্রায় চিরদিন অবজ্ঞাত, সৌমিত্রবাবু তাকে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করার এক চমকপ্রদ প্রয়াস পেয়েছেন।" একটু পরে লিখছেন, "এ-অবস্থায় "নাম জীবন" এক চ্যালেঞ্জ, আপসহীনতার এক ইশতেহার, আদর্শনিষ্ঠ এক সাধনা। দর্শককে কোনো কল্পনার নন্দনকাননে পলায়ন করতে দেয় না এ নাটক, তাকে নীচের মহলের মুখোমুখি দাঁড় করায়, শ্লেষের চাবুকে উত্যক্ত করে পাতিবুর্জোয়াকে, মুহুর্মুহু বিদ্ধ ঘটায় তার পরিতুষ্ট মানসে। একটি তীব্র কথায় চমকে উঠতে না উঠতে আরেকটি অপ্রিয় সত্য এসে চপেটাঘাত করে পলায়নবাদী দর্শকের গণ্ডদেশে। কিন্তু সত্যিকারের নাট্যামোদী মাত্রেই ক্ষণে ক্ষণে শিহরিত হ'ন সৌমিত্রবাবুদের সাহস ও নিষ্ঠায়। শুধু বন্ধ্যা দেউলিয়া পেশাদার নাট্যশালা নয়, এ নাটক পুরো নাট্য-আন্দোলনের সামনে গোর্কির মতন, বিস্মৃত আদর্শের মতন, বিবেকের মতন বিরাট ছায়া ফেলে এসে দাঁড়িয়েছে।

নাম জীবন মঞ্চস্থ হওয়ার আশপাশের কোনো-এক সময়ে দারুণ এক নাট্যপাঠের আসরেও প্রধান ভূমিকা নিয়েছিলেন সৌমিত্র। রবীন্দ্রনাথের *শেষের কবিতা* পাঠের আয়োজন প্রথম হয়েছিল রবীন্দ্রসদনে। সেই আসরে অমিত রায়ের অংশটি পাঠ করেন সৌমিত্র। অন্যান্য অংশের পাঠে ছিলেন বিকাশ রায়, লিলি চক্রবর্ত্তী, নীলিমা দাস, শ্রাবন্তী মজুমদার আর গৌতম চক্রবর্তী। মঞ্চসজ্জার দায়িত্বে ছিলেন দীপা চট্টোপাধ্যায়। সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন বিকাশ রায়।

একটা মজার ঘটনা ঘটেছিল এই আসরে। এখনও আমার চোখের সামনে ছবির মতো ভাসে সেই ঘটনাটা। অনুষ্ঠানের বিরতির সময়ে আমি অডিয়েন্স রিঅ্যাকশান জানাতে ব্যাক স্টেজে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের কাছে গিয়েছি। স্টেজের দিকে মুখ করে দাঁড়ালে ডানদিকের যে-পথে কয়েকধাপ সিঁড়ি ভেঙে ব্যাক স্টেজে যাওয়া যায় সেই পথটা দিয়েই আমি ভেতরে ঢুকেছিলাম। স্টেজে ঢুকে বাঁয়ে ঘুরে সামনে উইংসের পাশেই দেখি সৌমিত্র দাঁড়িয়ে আছেন। পরনে তাঁর কোঁচানো ধুতি, সোনালি হলুদ রংয়ের সাইড-ওপেন পাঞ্জাবি, গলায় গরদের মাফলার, পায়ে সাদা কটকি চটি। ওঁর পাশে সেদিন দীপাও ছিলেন, আর ছিল ওঁদের মেয়ে পৌলমী। ওঁরা তিনজনেই তখন কোনো-এক ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা বলছিলেন। ভদ্রলোক আমার দিকে পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে ছিলেন বলে তিনি যে কে সেটা

আমি প্রথমে ঠিক ঠাওর করতে পারিনি। পিছন থেকে দেখলাম, ভদ্রলোকের পরনে গোলাপি-ঘেঁষা লাল রংয়ের ডেক্রনের হাফহাতা শার্ট, সাদা টেরিলিনের প্যান্ট, পায়ে সাদা প্ল্যাটফর্ম চটি। ভদ্রলোক দু-হাতে একটা কাপ এমনভাবে ধরে ছিলেন যে, কাপের আংটাটা তার দুটো বুড়ো আঙুলের দিকে ছিল। একটু পরেই বুঝতে পারলাম ভদ্রলোক কেন ওইভাবে কাপটা ধরে ছিলেন; কারণ তিনি আংটার ওপরের কানায় ঠোঁট লাগিয়ে কাপে চুমুক দিলেন! ওঁর ওই চুমুক-দেওয়া দেখে আমারও মনে হল—"বাঃ, সত্যিই তো! ওইখানে তো কেউ ঠোঁট লাগিয়ে কাপে চুমুক দেয় না, আর তাই ওখান থেকে ইনফেকশান হওয়ার ভয়টাও কম!" হঠাৎ ভদ্রলোকের গলাটা আমার কানে গেল—"বুঝলি পুলু, ওনলি ইয়োর পোর্শান ইজ পারফেক্ট।" আরে, এ-গলা তো আমার ভীষণ চেনা! শুধু আমারই বা বলি কেন, সারা পশ্চিমবাংলার মানুষই তো এই গলার আওয়াজে মোহিত হয়ে যায়! উনি যে উত্তমকুমার! সৌমিত্র-র নাট্যপাঠে মুগ্ধ উত্তমকুমার নিজের উচ্ছ্বাস আর চেপে রাখতে পারছিলেন না। আমার সামনে মুখোমুখি-দাঁড়িয়ে-থাকা দুই নক্ষত্র নায়ককে দেখতে দেখতে আমি তখন ভাবছিলাম, উত্তম—সৌমিত্র-র মধ্যে তীব্র রেষারেষির কথাটা তাহলে কত মিথ্যে!

আজ অবধি সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় কত নাটক লিখেছেন বা কত নাটক পরিচালনা করেছেন কিংবা কত নাটকে অভিনয় করেছেন, তার ফিরিস্তি দেওয়ার জন্যে এই লেখা নয়। অভিনয় যে কেন তাঁর অন্তরে বাসা বেঁধেছিল এবং সেই অভিনয়প্রীতির ফলস্বরূপ তাঁর নাটক করতে আসার পিছনে যে অসংখ্য ঘটনা রয়েছে, তারই কিছু পাঠককে জানানোর ইচ্ছে থেকেই এই লেখার জন্ম।

এমন একটা ঘটনা দিয়ে এ-লেখা শেষ করা যাক যা ছিল এক বাস্তব নাটক। সৌমিত্র তখন বিজন থিয়েটারে *চন্দনপুরের চোর* করছেন। কোনো-একটা প্রয়োজনে আমি ওঁর মেক-আপ রুমে গিয়ে ওঁর সঙ্গে কথা বলছিলাম। মেক-আপ রুমটা ছিল লম্বাটে ধরনের—মাঝখানে দরজা, আর দরজার নাকবরাবর একটা করিডর; মানে ইংরেজি T অক্ষরের ছোটো দাঁড়িটা যদি হয় মেক-আপ রুম, তাহলে বড়ো দাঁড়িটা হল করিডর। মেক-আপ রুমের মধ্যে দু-পাশে দুটো মেক-আপ ইউনিট ছিল—যার একটা ব্যবহার করতেন সৌমিত্র, অন্যটা অনুপকুমার। দরজার সামনে যে-সোফাটা পাতা থাকত তাতে বসেই আমি সেদিন ওঁর সঙ্গে কথা বলছিলাম। কথার ফাঁকে হঠাৎ সামনে তাকিয়ে দেখি, সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায় মেক-আপ রুমের দিকেই এগিয়ে আসছেন। সৌমিত্র বোধহয় জুতোর আওয়াজ পেয়েছিলেন; তাই আমায় জিজ্ঞেস করলেন, "কে গো?" আমি বললাম, "সাবিত্রী চ্যাটার্জি।" আমার কথা

শেষ হওয়ার কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায় দরজার সামনে এসে পর্দা সরিয়ে দাঁড়ালেন। সেদিকে একবার আড়চোখে তাকিয়ে নিয়ে খুব গম্ভীর মুখে সৌমিত্র বললেন, "কী চাই?" তক্ষুনি সাবিত্রীর মুখের চেহারাও আমূল বদলে গেল! মুখ কাঁচুমাচু করে সাবিত্রী বললেন, "না, মানে—যদি একটা পার্ট পেতাম—।" সৌমিত্র-র মুখ আরও কঠিন হয়ে উঠল—"কে বলেছে আপনাকে, এখানে পার্ট পাওয়া যায়?" মুখে রংয়ের ব্রাশ বুলোতে বুলোতে অনুপকুমার সৌমিত্রকে জিজ্ঞেস করলেন, "কে রে পুলু?" সৌমিত্র-র উত্তর—"আরে দ্যাখ্-না, কোত্থেকে যতসব ফালতু লোক জোটে! বলে কিনা, পার্ট চাই! পার্ট কি খোলামকুচি, যে চাইলেই পাওয়া যাবে?" মুখটা আরও করুণ করে সাবিত্রী বললেন, "আমাকে যে-কোনো একটা পার্ট দিলেই চলবে—ছোটো-বড়ো যা হোক। কাজটা পেলে দু-মুঠো ভাত জুটত আর-কি—।" সাবিত্রীর কথা শেষ হতে-না-হতে অনুপকুমার রীতিমতো ঝাঁজিয়ে উঠলেন—"কে হে বটে তুমি, যে চাইলেই তোমাকে পার্ট দিতে হবে? আমরা বলে সাবিত্রী চ্যাটার্জির মতো অতবড়ো অভিনেত্রীকেই নিতে পারিনি, আর উনি এসেছেন পার্ট চাইতে? যত্তোসব! এসব ফালতু ঝামেলা হটা তো পুলু।" অনুপকুমারের কথা শেষ-হওয়ামাত্র ঘরের মধ্যে যেন একটা বোমা ফাটল—অট্টহাসির বোমা। সেই প্রাণখোলা হাসিতে মিশে ছিল বাংলা অভিনয়জগতের তিন দিক্‌পালের হাসি। আর আমি আমার স্মৃতির ভাণ্ডারে ভরে নিয়েছিলাম সেই দুর্লভ মুহূর্ত।

আমার দেখা শেষ ধ্রুপদি অভিনেতা

রজতাভ দত্ত

আমি, সত্যিকথা বলতে, সৌমিত্রদার নাটক অনেক বড়ো হয়ে দেখেছি; তার আগে চলচ্চিত্রশিল্পী হিসেবেই আমি ওঁকে চিনতাম। আমার মনে আছে, প্রথম ওঁর কাজ সাদা-কালো টিভি-তে দেখেছিলাম—*অপুর সংসার*—আমার এক বন্ধুর বাড়িতে; তখন তো আমাদের বাড়িতে টিভি ছিল না। ওঁর অন্যান্য কাজ দেখার আগে আমি ওঁকে দেখি *সোনার কেল্লা* ছবিতে। সেটা বোধহয় বসুশ্রী সিনেমায় দেখেছিলাম যখন আমি ক্লাস থ্রিতে পড়ি। পরবর্তীকালে আমি ওঁর সঙ্গে চলচ্চিত্রে কাজ করার সুযোগ পাই; সেটা ওই ১৯৯৪ সালে তপন সিংহ-র *হুইলচেয়ার* ছবিতে। না তারও আগে *হুতোমের নকশা* বলে একটা কাজ করেছিলাম; সেটাও তপন সিংহ-র, তবে টেলিভিশনের কাজ ছিল। আর এরই মাঝে আমি তখন স্বপ্নসন্ধানীতে অভিনয় করি। সেই দলের সভাপতি তখন ছিলেন সৌমিত্রদা। সেই সময়ে দেখি সেই *চন্দনপুরের চোর*, বোধহয় আমার-চোখে-দেখা ওঁর অভিনীত প্রথম নাটক। সেই অর্থে ওঁর বিখ্যাত নাটকগুলো—যেমন *নীলকণ্ঠ*—অনেক পরে দেখেছি। *নাম জীবন* আমি দেখিনি। কাজেই আমার ওঁকে খুব বিশদে দেখা স্বপ্নসন্ধানী-প্রযোজিত *টিকটিকি* নাটক থেকে। *টিকটিকি*-র একশোর ওপর শো হয়েছিল। তখন যেহেতু আমার অন্য-কোনো কাজকর্ম ছিল না, অর্থাৎ তখন আমি পুরোপুরি একজন নাট্যকর্মী, তা ছাড়া সেটা যেহেতু আমারই দলের প্রযোজনা, তাই প্রত্যেকটি শো আমি দেখেছি মন দিয়ে। সেখানে আমার একটা বড়ো সুযোগ ঘটে—কীভাবে একজন নাট্যব্যক্তিত্ব একটা নাটক তৈরি করছেন সেটা প্রত্যক্ষ করার। নাটকটা তৈরি হওয়ার পর দর্শকের চোখ দিয়ে সবাই দেখছেন যে, একজন নির্দেশক বা একজন অভিনেতা কতটা বড়ো। কিন্তু যখন নাটকটা গড়ে ওঠে তখন সেটা দেখার সুযোগ সবার ভাগ্যে হয় না। যখন একটু-একটু করে গড়ে উঠছে নাটকটা, আমি যতদূর জানি, একজন নির্দেশকের পক্ষেও সেটা দারুণ interesting একটা সময়। বিভিন্ন নাট্যনির্দেশক আমায় বলেছেন যে, তাঁদের কাছে সেই সময়টা অনেক বেশি প্রিয়। আর ওই ভাঙাগড়ার মধ্য দিয়ে যখন নাটকটা shape পেতে থাকে তখন সেটা যারা কাছ থেকে দেখতে পায় তাদের কাছেও *টিকটিকি* একটা অন্যরকম দুর্লভ অভিজ্ঞতা হয়ে থাকে। অতএব *টিকটিকি* এবং তার পরবর্তীকালে যেসব নাটক দেখেছি সৌমিত্রদার, তারও আগে ভীষণভাবে

যেটা আমার মনে দাগ কেটেছে সেটা হচ্ছে ওঁর নির্দেশনায় মহলার ওই সময়টুকু; এবং সেটা পরবর্তী জীবনে আমাকে খুব সাহায্য করেছে নাটক ও চলচ্চিত্র দু-জায়গাতেই।

সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে আমি থিয়েটারে অভিনয় করার সুযোগ পাইনি। তবে আমি ওঁর সঙ্গে চলচ্চিত্রে অনেক কাজ করেছি। আমি তো ছোটোবেলা থেকেই তাঁকে সিনেমায় দেখে এসেছি। সেই মানুষটি আজ আমার সামনে অভিনয় করবেন, তাঁর বিপরীতে দাঁড়িয়ে আমাকে অভিনয়টা করতে হবে—এগুলো তখন একটা চাপ, বিস্ময়, ভীতি, ইত্যাদি নিয়েই তৈরি ছিল। কিন্তু যখন আমি তাঁর সহ-অভিনেতা হিসেবে কাজ করতে শুরু করি তখন তাঁর কাছে একটা একদম নতুন ছেলে এসেছে বা তুলনামূলকভাবে একজন অনভিজ্ঞ ছেলে সবে কাজ শুরু করেছে বলে তাকে একদম বুক দিয়ে আগলে রেখে কাজ করতে সাহায্য করেছেন; কখনও কিছুমাত্র অসহিষ্ণু হতে দেখিনি। হয়তো আমি একটা জায়গা বুঝতে দেরি করছি বা ঠিকমতো পারছি না, সেটা properly বুঝিয়ে-দেওয়া থেকে শুরু করে সমস্তটাই উনি করতেন। কোন্ ছবিতে ঠিক মনে পড়ছে না, একবার দরকার ছিল যে, আমার অভিনীত চরিত্রের জামাটা কোঁকড়ানো থাকবে। তখনও আমাদের costumes আমরা carry করতাম, অন্তত আমি করতাম। সেই জামাটার হাতাটা দিয়ে অনেকবার করে ঘাম মুছেছি। কিন্তু যেহেতু আমারটা টেরিকটের জামা ছিল, সেটা খুব চট করে কুঁচকে ভাঁজ করা যাচ্ছিল না, আমাদের ভাষায়, weather করা যাচ্ছিল না। আমার মনে আছে যে, তখন সৌমিত্রদা ওটা নিজের হাতে গিলে করার মতন করে ভাঁজ করে একদম কাঁধ অবধি তুলে দেন এবং তারপর জল স্প্রে করে করে নামিয়ে দিয়ে বলেন, "এটা এভাবে করতে হয়।" এগুলোতে সত্যিসত্যি তার স্নেহ আর ধৈর্য এতটাই দেখেছি এবং আজও দেখতে পাই। শেষ যখন ওঁর সঙ্গে কাজ করলাম তখন ওঁর শরীরটা খারাপ ছিল। *হিং টিং ছট্* বলে অনসূয়া রায় চৌধুরীর একটি ছবি আমরা ফাগু টি এস্টেটে shoot করতে গিয়েছিলাম। তখনও একটু ভালো কিছু করতে পারলেই appreciate করা থেকে শুরু করে guide করা পর্যন্ত সব করেছেন। "এটা কর্, ভালো লাগবে।" বা 'ওটা তো আগে ওরকমভাবে করেছিলি। তাহলে এখন এরকম করলি কেন? দুটোর মধ্যে একটুখানি কোনোভাবে bridging কর্।" এরকম করে সবসময় guide করতেন। এবং আমি আজ অবধি যত ছবি করেছি তাদের মধ্যে শুরুর দিকের প্রায় সবগুলো ছবিতেই আমি সৌমিত্রদাকে পেয়েছি। এটা আমার খুব বড়ো একটা সৌভাগ্য, কারণ আমি serious ছবি দিয়ে কাজ শুরু করেছিলাম (২০০২-এর পর থেকে আমি mainstream করছি)। শুরুর দিকে,

যতদূর মনে পড়ছে, যে-কাজগুলো করেছিলাম তাদের মধ্যে প্রথম আমার বড়ো চরিত্র সে-অর্থে *আজব গাঁয়ের আজব কথা* ছবিতে। সেখানে আমার বিপরীতে ওঁকে পেয়েছি। তারপরে *আবার অরণ্যে*-তে পেয়েছি, *মন্ত্র* বলে একটা ছবিতে পেয়েছি। এবং তারই মধ্যে যেসব মেগাসিরিয়াল আর টেলিফিল্ম করেছি তার অনেকগুলিতেই উনি ছিলেন। সেখানেও অভিভাবকের মতোই guide করে নিয়ে গেছেন এবং তাঁর অভিজ্ঞতালব্ধ tips দিয়ে আমাকে ঋদ্ধ করেছেন। আর ওঁর কাছ থেকে খুব বড়ো আর-একটা শেখার জিনিস আমি পেতাম। আজকালকার দিনে যখন আমরা কাজ করতে যাই তখন আমাদের পরের প্রজন্ম তো বটেই, আমরাও অনেকসময় উষ্মা প্রকাশ করে ফেলি বা অধৈর্য হয়ে পড়ি এই ভেবে যে, সকালবেলায় এসেছি, সন্ধ্যা হয়ে গেল, অথচ এখনও কোনো শট নেওয়া হল না! উনি সবসময়ই হেসে বলতেন, "আমরা অপেক্ষা করার জন্যই সম্মানদক্ষিণা পাই, অভিনয় করার জন্য তো পাই না! যে-পরিচালক বা যে-প্রযোজক আমাকে সারাদিনের জন্য নিয়ে এসেছেন তাঁর যখন দরকার, তিনি ঠিক ডাকবেন। আমাদের বসিয়ে রাখলে তো তাঁরই ক্ষতি! কাজেই ওই সময়টায় ভালো mood-এ থাকাটা এইজন্যই জরুরি যে, এতক্ষণ অপেক্ষা করার পরে আমি যখন কাজ করতে যাচ্ছি তখন যাতে আমার energy level-এ কোনোরূপ ঘাটতি না-হয়। এটাও খুব বড়ো একটা training। আমি অভিনয়ের টুকিটাকি ছাড়াও attutude-এর কথা বলছি। যখন *আজব গাঁয়ের আজব কথা*-র dubbing করতে গেছি তখন naturally আমাদের dubbing-টা rock 'n' roll-এ হয়েছে। সেই সময়ে দেখেছি, আমি হয়তো এক লাইন করে dubbing-এ যাচ্ছি, উনি কিন্তু পুরো passage-টাই একবারে দেখে নেন। সেটা দেখতে দেখতে নিজের হাতে dubbing-এর কতগুলো নিজস্ব mark করে। কোথায় কি রকম সুর করেছিলেন, কোথায় কতটা গ্যাপ তৈরি করেছিলেন। পুরো সিনটা ওরকম করে নিজের মতো করে হাতে লিখে বা স্ক্রিপ্টে সে রকম লিখে, অর্থাৎ একটা ডামি স্ক্রিপ্ট তিনি সাইন দিয়ে দিয়ে, নিজস্ব সাইন ল্যাঙ্গোয়েজে উনি সেটাকে তৈরি নিলেন। তারপর যখন ডাবিংটা করছেন সেটা ম্যাজিকের মতন। একটা গোটা সিন একবারে করে যাচ্ছেন এবং সেটা তখন দেখছেন না। কানে হেডফোনটা নিয়ে শুধু স্মৃতি থেকে ওগুলোকে মোড করে যাচ্ছেন। সেটা সত্যি আরেকটা শেখার মতন। ডাবিং-এর অ্যাকচুয়ালি সেটাই হয়তো পদ্ধতি কিন্তু এখন ডিজিটাল হয়ে গিয়ে এতটাই সুবিধে হয়ে গেছে প্রায় আমরা এখন একটা দুটো করে শব্দ করে ডাব করি। আমি পরবর্তীকালেও কিছু বড়ো মাপের ডাবার দেখেছি।

নাটকে আমি সৌমিত্রদাকে দেখেছি মূলত পরিচালক হিসাবেই। নাট্যপরিচালক হিসাবে উনি বেশ কঠোর। কিন্তু আমি আবার সেটাকে ঠিক কঠোর বলে দেখি না। বরং আমার মনে হয়, তিনি অত্যন্ত সুশৃঙ্খল একজন পরিচালক। তখন নাকি পেশাদারি মঞ্চে এরকম প্রায়শই হত যে, প্রায় ৩০ কি ৪০ রাত্রি অভিনয়ের পর থেকেই অভিনেতারা যে-যার-মতো improvise করা শুরু করতেন। দুজন অভিনেতা হয়তো extempore dialogue বলে যাচ্ছেন; দর্শক সেটা শুনতে বাধ্য হচ্ছে, সেইসঙ্গে নাটকের length-ও বেড়ে যাচ্ছে। সেই যুগেও কিন্তু উনি যখন থিয়েটার করেছেন তখন এবং এখনও উনি পছন্দ করেন যে, যাকিছু improvise করার আছে তার সবটাই অভিনেতা মহলার সময়েই করে ফেলবেন। উনি গোটা নাটকটা উইংসের পাশ থেকে দেখেন। এবং কারও কোনোরকম বিচ্যুতি হলে, কেউ কোনোকিছু ভুল করলে, অথবা কেউ যদি অন্যকিছু করার চেষ্টা করে বা পাকামি করার চেষ্টা করে তাহলে বিরতির সময়ে বা নাটকের শেষে ওঁর একটা ছোট্ট চিরকুট যায় (সেই নিয়ম এখনও চালু আছে বলেই আমি শুনেছি): "এই দৃশ্যে কিন্তু এই ডায়ালগটা এরকমভাবে বলার কথা ছিল; সেটা ওভাবে বললেন কেন?" কিংবা লেখা থাকত, "ওইরকমভাবে করার ফলে আপনার চরিত্রের মান আর আগের মতো বজায় থাকছে না। আপনি কিন্তু deviate করে যাচ্ছেন!" কাজেই এটাকে ঠিক কঠোরতা না-বলে আমি বলব—উনি নিজের নাটকে ঠিক কী চান সেটা এতটাই ভালো জানেন এবং উনি এতটাই শৃঙ্খলা পছন্দ করেন যে, ওগুলোকে উনি খানিকটা বাঁদরামোর চোখেই দেখেন, অর্থাৎ সেই জায়গাটা ওঁর কাছে নেই। অত্যন্ত serious একটা কাজ ওঁর কাছে হয়। কারণ নইলে উনি এই বয়সে এসে ওনার শরীর খারাপ হবার পরেও নাটকটা সেই সমানতালে করে যাওয়া। উনি খুব ভালো কবি কিন্তু কবিতা লেখাটা তাও নিজের ঘরে বসে। একটু কমফোর্টে হয়তো করে ফেলা সম্ভব বা কাজের ফাঁকে অবসর সময়ে। কিন্তু সত্যি সত্যি আমাদের থিয়েটারের হলগুলো বিশেষ করে তখন যে অবস্থা ছিল মানে ফার্নেশ হয়ে থাকতো। আমি একটা দুটোয় করেছি—বেশির ভাগ সময়ে আমরা এ্যাকাডেমি বা রবীন্দ্রসদন-এ এ.সি. পেয়েছি। এগুলো তুলনামূলকভাবে অনেক কমফর্টেবল একটা জায়গায় করেছি। কিন্তু সেই রকম গরমে। মহলাও তখন স্টেজে অনেক বেশি হত। স্টেজের লাইট ফাইট করা নিয়ে এখন সব সময় সেটা হয়তো পাওয়া যায় না। এখন থিয়েটারও তো মানে শ্যামবাজারী থিয়েটার এখন বন্ধ হয়ে গেছে। তাদেরও অভিনয় করতে হয় এই মঞ্চগুলোতে। এবং দিনের পর দিন সেখানে স্টেজ রিহার্সাল করাটা সম্ভব হতো না। তখন একটা হলের থেকে প্রোডাক্শান নামতো।

কাজেই সেই হলটা মহলাও সেখানে হচ্ছে তারপর নাটকও সেখানে হচ্ছে। সেখানে ওই অসহ্য গরমের মধ্যে ওনারা যে পরিশ্রম করতেন। এখনও তুলনামূলকভাবে থিয়েটারে অনেক বেশি পরিশ্রম করতে হয়। উনি যে পরিমাণ পরিশ্রম নিয়ে এখনও থিয়েটার করে চলেছেন—সেটা সত্যি একজন সাধকের মতই। সেই জায়গা থেকে আমি দেখেছি প্রত্যেকটা হলে কোন সিনে কখন পর্দা পড়বে, টিকটিকিতে দেখতাম এটা, বিভিন্ন হলের পর্দা পড়তে বিভিন্ন রকম সময় লাগে। কোনোটা হয়তো দু-পাশ থেকে এগিয়ে আসবে। কোনোটা হয়তো উপর থেকে পড়বে। কত সেকেণ্ড সেটা আগের থেকে ঘড়ি ধরা থাকে। ঠিক নাট্য মুহূর্ত কোনখানে আসার পরে পর্দাপড়া শুরু করবে, আলো কিভাবে ডিম হয়ে আসবে। এই synchronisation থেকে তুলনামূলক ভাবে যদি। কোনও রকম কোন বিচ্যুতি ঘটতো। সেরকম সময় আমরা যেহেতু অনেক সময়ই স্টেজে উইংস-এর পাশে থাকতাম, যার ওপর পর্দা পড়ার দায়িত্ব, আলো নেভানোর দায়িত্ব। মিউজিক হয়তো শুরু হয়ে গেছে, দর্শক আর তার গলা সেরকম ভাবে শুনতে পাবেন না। উনি অনস্টেজ দাঁড়িয়ে গালাগাল করছেন এখনও পর্দা পড়ছে না কেন? সেটাও আমরা দেখেছি। কাজেই সে দিক দিয়ে কড়াও বলা যায়, কিন্তু আমি সেটাকে ওভাবে দেখিনি। তার জন্য প্রযোজনাটা ১০০ রজনি পেরিয়ে যাওয়ার পরও সেরকম টানটান ছিল। প্রথম সাতটা রজনি যেরকম ভাবে অভিনয় হয়েছে, তার থেকে কোনও রকম ভাবে ডিভিয়েট করে যাওয়া বা কোন রকম ভাবে গাছাড়া ভাব হয় দীর্ঘদিন ধরে চলতে চলতে একটু অমেল রকম ভাবে বিচ্যুতি ঘটে থাকে। সেটা কখনই হতো না দর্শক কিন্তু ১০০% পেত।

এই সবকিছুর বাইরে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় একজন মজার মানুষ। বিভিন্ন সময়ে আমাদের সঙ্গে উনি প্রচুর গল্প করেন। অনেকেই হয়তো জানেন না, উনি অনেক ব্যাপারে খোঁজখবর রাখেন। তার মধ্যে আছে রাস্তাঘাট। পশ্চিমবঙ্গের রাস্তাঘাট তো বটেই, কলকাতার অলিগলিও উনি সাংঘাতিকভাবে চেনেন। অন্যান্য বিষয়ের পড়াশোনার মতোই এইসব ব্যাপারেও খুব thorough পড়াশুনা রয়েছে ওঁর। উনি ভয়ংকরভাবে জানেন সারা পশ্চিমবঙ্গের কোথায় কী ভালো খেতে পাওয়া যায়, এবং সেটা উনি প্রায় ম্যাপের মতো বলে বলে যান—"এখানকার অমুক ভালো; ওখানকার তমুক ভালো।" ওঁর মতো আরও অনেকেই অজস্র শো করেছেন। কিন্তু সেটা করলেই ওইরকমভাবে, অত নিখুঁতভাবে খবর রাখাটা কিন্তু চাট্টিখানি কথা নয়! এ ছাড়া আমার নিজের একটা বিরল অভিজ্ঞতা হয়েছিল যেটা আমার জীবনের শেষ দিন অবধি মনে থাকবে। এই গতবারই সৌমিত্রদার সঙ্গে ফাগু

টি এস্টেটের ম্যানেজার্স বাংলোয় আমাদের শুটিং ছিল। ওখানে বসে শটের মাঝখানে কথা বলছি যে—"আমি খুব নার্ভাস অ্যাকটর এবং আমার খুব stage fright, তো এই ভীতি কাটানোর জন্যে। সেই stage fright কাটানোর জন্য আমি অন্যান্য অভিনেতাদের লেখায় পড়েছি। তারাও বিভিন্ন রকম লিখেছেন, stage fright-এর ওপরে এবং stage fright শুরুর দিকে থাকে না। একজন অভিনেতা অভিনয় করতে করতে stage fright বাড়ে এবং এই stage fright-এর বিষয়ে মনে আছে তিনি ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি গল্প বলেছিলেন। যে ভানু বন্দোপাধ্যায় একবার থিয়েটার করছেন। বার বার শোয়ের আগে হাটাহাটি করছেন, আর বলছেন খুব টেনশন হচ্ছে, খুব টেনশন হচ্ছে। তাতে দলের অপেক্ষাকৃত নতুন, দুর্বিনীত এবং বাচ্চা ছেলে বলছে "ভানুদা আপনি এতদিন ধরে থিয়েটার করছেন আপনার এখনও ভয় হচ্ছে? আমার তো কোথায় ভয়টয় লাগে না"। তাতে ভানুবাবু তাকে বলেছিলেন যে—"আমার এক জামাইবাবু ছিল। তখন তো ওখানে টয়লেটটা অনেক দুরে থাকতো। বাঘের ভয় থাকতো, ভুতের ভয় থাকতো, সাপের ভয় থাকতো। কেউ সন্ধ্যাবেলা বড় একটা যেতে চাইত না। কিন্তু তিনি ওই গাড়ু বা জলের মগ নিয়ে পটি করতে অনায়াসে ওই জঙ্গলে চলে যেত"। তখন ছেলেটি বলেছে—"সেকি তার ভয় লাগত না? ভানু বাবু বলছেন—"সেকি তার ভয় লাগবো ক্যান, পাগল আছিল তো"। কাজেই পাগল ছাড়া স্ট্রেচফ্রাইট থাকে। সেটা যে রকম সৌমিত্রদা এই গল্পটার মধ্য দিয়ে বুঝিয়ে ছিলেন। পাশাপাশি আমার জীবনের এক অমূল্য সম্পদ, তার ওপরেই একটি বই আছে—*আজ কাল পরশুর প্রান্তে*—ওই director অনসূয়ারই লেখা। সৌমিত্রদারই একটা দীর্ঘ সাক্ষাৎকারের সংকলন ওটা। তো, সেই বইটা আমি ওঁর কাছে নিয়ে গিয়েছিলাম—যদি উনি কিছু লিখে দেন। তাতে উনি আমাকে খুব motivate করে প্রায় এক পাতার একটা লেখা লিখে দেন। সেটার মূল প্রতিপাদ্য হল অনেকটা এইরকম: "যত অভিনেতা এসেছেন তাঁরা সবাই ভয়ে এসেছেন। সকলেই এই একই ভয় পেয়েছেন। বিভিন্ন সময়ে অভিনেতাদের আত্মবিশ্বাস তলানিতে গিয়ে ঠেকেছে। এবং তাঁরা সেটা overcome-ও করেছেন। অতএব তুমিও পারবে।" আসলে ওটা এর থেকে অনেক সুন্দরভাবে লেখা। উনি তো কবি। তাঁর ভাষা এবং তার মধ্যে আর যা যা লিখেছিলেন। সেটা তুলনামূলকভাবে এতটাই আমাকে বুষ্ট করে লেখা, সেটা বলতে গেলে আত্মবিজ্ঞাপন হয়ে যাবে বলে আমি সেটায় যাচ্ছি না। কিন্তু আমি বলছি যে এটা আমার কাছে সারা জীবনের একটা সম্পদ হয়ে রইল। ওই লেখাটি সমেত তার ওই বইটা প্রায় বাইবেলের মতো হয়ে রইল।

সৌমিত্রদার গোটাপাঁচেকের বেশি নাটক দেখার সৌভাগ্য আমার হয়নি। তবে পরবর্তীকালে একটা অভিজ্ঞতা হয়েছিল আমার—সেটা সম্ভবত ওঁর ষাট বছরের জন্মদিন ছিল। স্বপ্নসন্ধানী থেকে তখন *পদ্মবীজের মালা* বলে ওঁর ওপরে একটা নাট্যকোলাজ করা হয়েছিল। তাতে ওঁর বিভিন্ন নাটকের খানিকটা-খানিকটা টুকরো উনি অভিনয় করেছিলেন। সেটা খুব কাছ থেকে দেখা। কাজেই সেটাতে খানিকটা আভাস পেয়েছিলাম। আরও অনেক নাটক আছে যেগুলোর খুবই অল্প শো হয়েছে; তাদের গল্প শুনেছি বিভিন্ন সিনিয়ার অভিনেতাদের কাছে। কিন্তু আমার নিজের চোখে ওঁর নাটক দেখার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা খুবই কম। কাজেই সেভাবে বলতে গেলে, একশোর বেশি শো দেখেছি বলে বারবার *টিকটিকি*-র কথাই মনে পড়ে।

আমাদের ছোটোবেলার একটা খুব প্রিয় উপন্যাস তথা চলচ্চিত্রের নাম *The Last of the Mohicans*। সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় আমার কাছে সেই last Mohican—মঞ্চে ও চলচ্চিত্রে আমার দেখা শেষ ধ্রুপদি অভিনেতা।

আলাপচারিতা ও রেকর্ডিং: সমর বিশ্বাস ও সুজয় মণ্ডল
অনুলিখন: সুজয় মণ্ডল

পেশাদার থিয়েটারের আঙিনায় সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়

দেবাশিস রায় চৌধুরী

"আমি ছোটবেলা থেকে যাঁদের থিয়েটার দেখব বলে স্থির করেছিলাম বা যাঁদের দেখে শিখেছিলাম বা এই থিয়েটারের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলাম তাঁরা সবাই ছিলেন পেশাদার। অপেশাদার কোনো শিল্পীই আমার কাছে প্রেরণার স্থল ছিলেন না। শিশির ভাদুড়ী, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, এঁদের তো থিয়েটারে দেখেছি। তারপরে আরও অনেকে, যেমন ছবি বিশ্বাস, এঁরা সবাই পেশাদার শিল্পী হিসাবেই আমাকে আকর্ষণ করতেন। এমনকি আমার পেশাদার থিয়েটারে কাজ শুরু করার আগে, তার মধ্যেই যাঁরা ভালো থিয়েটার করতেন তাঁরাও আকৃষ্ট করেছেন। এরকম বহু লোকই পেশাদার থিয়েটারে ভালো কাজ করেছেন। যেমন উৎপল দত্ত। মিনার্ভা থিয়েটারেই তাঁর সবথেকে ভালো কাজগুলো আমরা দেখেছি। শম্ভু মিত্রও তো পেশাদার থিয়েটার থেকে এসেছিলেন, পরে পেশাদার থিয়েটারে তিনি না থেকে বিকল্পধারার থিয়েটারে চলে গিয়েছিলেন। আসলে আমি নিজেকে প্রথম থেকেই আদ্যোপান্ত পেশাদার হিসাবে তৈরির চেষ্টা করেছি এবং সেইজন্যই পেশাদার থিয়েটার বেছে নিয়েছি।"

—এই যে মনেপ্রাণে নিজেকে একজন পেশাদার শিল্পীরূপে চিহ্নিত করা, এর মূলে ছিলেন; কিন্তু শিশিরকুমার ভাদুড়ী। কারণ শিশিরকুমারের কাছে শিক্ষিত হয়ে তাঁর প্রযোজনায় যাঁরা কাজ করেছেন তাঁদের অভিনয়রীতিতে একটা সংগতি ছিল—একটাই নিদর্শনের মধ্যে তাঁদের চলাফেরা ছিল। তাঁরা বড়ো অভিনেতা বলে এক-একজন এক-একরকম অভিনয় করবেন, তা হত না। সৌমিত্র সবসময়ই ভেবেছিলেন, পেশাদার অভিনেতা হিসাবে যা-যা করার, তাই-ই করবেন। তিনি মনে করতেন, পেশাদার হচ্ছে সেই যে—মানে who delivers his goods—তা নইলে... তার কাছে তো মানুষের দাবিটাও থাকবে যে, সর্বোৎকৃষ্ট জিনিসটা তার কাছ থেকে পাবে। না-হলে কীসের পেশাদার? পেশাদার অভিনেতা—যার অভিনয়টাই পেশা—যেমন, একজন কামার, একজন ডাক্তার—সে হচ্ছে পেশাদার। অথচ এই মানুষটি পেশাদার থিয়েটারের ক্রমাবনতির দিকে তাকিয়ে একসময় বলেছিলেন, "আজকের দেশের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক স্রোতপথে স্বাধীনতাপূর্ব সেই লক্ষ্যবস্তুই নেই-ই, পরন্তু হতাশা, অবক্ষয় বিশ্বাসহীনতা আদর্শহীনতা আত্মকেন্দ্রিকতায় পঙ্কিল হয়ে আছে গণমানস। সারা পৃথিবীজুড়ে সমাজতান্ত্রিক তথা বামপন্থী চেতনার ব্যর্থতাও এই আশাহীন লক্ষ্যহীন অবস্থাকে গাঢ়তর করেছে। থিয়েটার তো দেশের বাইরে নয়। তাই থিয়েটারের মধ্যেও কি এই লক্ষ্যহীন দিন চারণের ছায়া পড়েছে? থিয়েটার ক্ষণপ্রমোদের বিপণিমাত্র হয়ে দাঁড়িয়েছে? কলকাতার থিয়েটারের এই আন্তরিক সঙ্কট থেকে মুক্তির পথ কোথায়? কে দেখাবে সেই পথ?"

গত শতাব্দির শেষ দশকটি পেশাদার থিয়েটারের পক্ষে নানা দুর্বিপাকের বিড়ম্বনা। সাধারণ রঙ্গালয়ের শতবর্ষপূর্তির পর দুটি দশক পূরণ করার আগেই পেশাদার মঞ্চের ইতিহাস অবলুপ্ত। যদিও পেশাদার থিয়েটার এর পূর্বেই নানা সময়ে নানারকম দুর্যোগের সম্মুখীন হয়েছে, তবু সকলের আন্তরিক প্রচেষ্টায় পেশাদার থিয়েটার তার দুর্যোগকে কাটিয়ে উঠে সামনের দিকে পা বাড়িয়েছে। ছয়ের দশকে যখন রঙমহল থিয়েটারের মালিকপক্ষ সকলকে না-জানিয়ে গোপনে সেটিকে চলচ্চিত্রগৃহে রূপান্তরের চেষ্টা করেছিলেন তখন অভিনেতা জহর রায় ও সরযূবালা দেবীর নেতৃত্বে সমবায়ভিত্তিক ব্যাবসায় সেদিনের পেশাদার থিয়েটারকে সংকটমুক্ত করা হয়েছিল। বাঙালির সামাজিক জীবনে পেশাদার থিয়েটারের যে উপযোগিতা— গার্হস্থ্য জীবনের গল্প, সামাজিক এবং পারিবারিক জীবনের সম্পর্ক জড়ানো ঘরোয়া গল্প—যার মধ্যে হাসি-কান্না আছে, সবরকমের আবেগের প্রকাশ আছে, সাত-এর দশকে তা থেকে সরে গিয়ে এক ঘেয়ে ক্লান্তিকর দেহ প্রদর্শনের প্রতিযোগিতায় পেশাদার থিয়েটারের অদম্য উৎসাহের মধ্যে দর্শক প্রত্যাখ্যানের সত্যটি নিহিত হয়ে গেল। পেশাদার নাট্যাভিনয়ের অনেক উত্থান পতনের ইতিহাস, যুগান্তকারী অভিনেতৃ সংঘের হাসিকান্নার সংলাপের উঁচু নিচু তরঙ্গ আজ শুধু স্মৃতি। অথচ জীবনের শেষপর্বে যে মানুষটি নিজের কাজ করার জন্য একটা নিজস্ব মঞ্চ পাননি, সেই শিশিরকুমার পেশাদার থিয়েটার ভালো চললেই বলতেন, 'এখন তো টাকাকড়ি ভালোই আসছে। ওসব নাটক না করে এক্সপেরিমেন্ট কর, এক্সপেরিমেন্ট কর।' শিশিরকুমার ভাদুড়ী যে সময়ে থিয়েটারে এসেছিলেন, অভিনেতার জীবন বেছে নিয়েছিলেন, তখন তিনি একটি সমাজশ্রদ্ধেয় বৃত্তি-অধ্যাপনা করতেন - তা ছেড়ে এসেছিলেন। শোনা যায়, তখনকার দিনে পড়িয়ে তিনি তিন-চার হাজার টাকা রোজগার করতেন, কারণ বাবার মৃত্যুর পর একান্নবর্তী পরিবারের দায়িত্ব তাঁকেই সামলাতে হয়েছিল, সেই সমস্ত ছেড়ে আশি হাজার টাকা দেনা করে শিশিরকুমার থিয়েটার শুরু করেছিলেন। থিয়েটারকে ভালোবাসলে এবং সেইসঙ্গে নিজের ক্ষমতার প্রতি কতখানি বিশ্বাস থাকলে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া যায়।

সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের পেশাদার অভিনেতা হওয়ার বাসনার পিছনে শিশিরকুমার ভাদুড়ীর এই সাহসিকতা দৃষ্টান্তস্বরূপ ছিল। তাই তিনি বলেছিলেন, "প্রফেশনাল অভিনেতা হব—থিয়েটারে না হয়, সিনেমায় হল—থিয়েটারটা আরও শক্ত ছিল, অত stable ছিল না।" শিশিরকুমারের কাছে সবথেকে বড়ো শিক্ষা হল, তিনি অভিনেতাকে নিজের মতো করে ভাবতে শেখাতে পারতেন; কোন্ পথে গেলে একজন অভিনেতা নিজের মতো করে অভিনয় করতে পারবে তাও বলে দিতেন। বলতেন, কথাটা অভিনয়ের ক্র্যাফ্‌ট, তাই নাটক বা অন্যান্য বই পড়ার সময়ে গোয়েন্দার মতো পড়া দরকার; কারণ লিখিত নাটকটার

বাইরে একটা বড়ো নাটক আছে, সেই নাটকটাকে খুঁজে বের করতে হবে। ১৯৫৭ সালেই শিশিরকুমারের কাছে সৌমিত্র-র থিয়েটারে হাতেখড়ি। গিরিশচন্দ্র ঘোষের *প্রফুল্ল* নাটকে সুরেশের পার্ট। তাঁর অভিজ্ঞতার কথায়, "একটাই ঘটনা বিশেষ করে মনে আছে, যেখানে যোগেশ মদ্যপান করছে আর সুরেশ তাকে বারণ করতে যায়, উনি 'এ্যাই'—বলে একটা ধমক দেন। সেই সিন-টাই ওঁর সঙ্গে সামনাসামনি সরাসরি অভিনয়। বলাই বাহুল্য আমি তো তো একেবারে awe-struck হয়ে রয়েছি। প্রচন্ডভাবে ভীত। উনি যখন ধমকটা দিয়েছেন—আমার তো হাত-পা ছেড়ে দেবার উপায়—মনে হচ্ছে যেন আমাকেই ধমকটা দিলেন, চরিত্রকে নয় এবং আমি ভাবছি যে কতক্ষণে সিনটা শেষ হবে। শেষ হবার পর আমার যেখানে exit—বেরিয়ে যাচ্ছি—তো নিভাননী দেবী—প্রফুল্লতে যোগেশের মা উমাশশীর পার্টটা করতেন, উনি উইংসের পাশে বসেছিলেন—ওঁর তখন entry নেই। উনি আমায় বললেন, 'বাবা, শুনুন।' আমি গিয়ে বললাম—বলুন। বললেন—'আপনাকে দেখে মনে হচ্ছিল এই সিনটায়—আপনি কতক্ষণে মঞ্চ থেকে পালিয়ে আসবেন...।' ...আমি বললাম—হ্যাঁ, বুঝতেই তো পারছেন—এই প্রথম শিশিরবাবুর সঙ্গে ..... উনি বললেন, 'সেইটে বোঝা যাচ্ছে। তা কেন হবে বাবা? আমরা সবাই বড়বাবুর ইস্কুলের ছাত্রছাত্রী, আমাদের তো এরকম ভুল হওয়া উচিৎ নয়!'" নিভাননী দেবীর কথাটা খুব ভালো লেগেছিল সৌমিত্র-র; তাঁর ওই উপদেশ থেকে এই অস্বস্তির ব্যাপারটা উনি মঞ্চে জয় করতে পেরেছিলেন। শিশিরকুমারের সময় থেকেই থিয়েটারে সব দিক থেকে একটা যাথার্থ্য এল। সৌমিত্র-র ভাষায়, "আগে একটা হিরণ্যকশিপুর রাজসভা আঁকলেও হয়তো মোগল আমলের খিলান দেওয়া একটা দৃশ্য পিছনে এঁকে দেওয়া হত, একটা পৌরাণিক বিষয়ের সঙ্গে যেটা যেতেই পারে না।" তাই শিশিরকুমার সবসময়ই থিয়েটারের দিক থেকে ভাবতেন; সেটা পুরোপুরি realism নয়। তিনি *সীতা* নাটকটি প্রযোজনা করার সময়ে পুরোনো painting থেকে হিন্দুযুগের স্থাপত্য, পোশাক, ইত্যাদি বিষয়ে নানা তথ্য নিয়ে তার একটা reflection আনার চেষ্টা করেছিলেন।

ছেলেবেলায় স্কুলে অভিনয় শুরু হলেও কলকাতায় কলেজে পড়তে এসে সৌমিত্র-র থিয়েটার দেখা শুরু। সিটি কলেজের সহপাঠী সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের কথায়, "সবদিক দিয়েই সৌমিত্র ছিল চোখে পড়ার মতো যুবক। অত্যন্ত রূপবান তো বটেই, সেরকমই গুণবান ও হৃদয়বান। পৃথিবীর নানা বিষয়ে তার আগ্রহ ও পড়াশোনা। সে কবিতা লিখত, কিন্তু সে ব্যাপারে ছিল খুবই লাজুক।" সিটিতে পড়ার সময়ে একবার অভিনীত এক নাটকে সৌমিত্র ছিলেন নায়ক এবং সুনীল হয়েছিলেন ভিলেন। যদিও নাটকটি একদমই জমেনি, কিন্তু সকলে মিলে মজা করেছিলেন খুব। এই কলেজে পড়ার সময় থেকে সৌমিত্র-র

শিশিরকুমারের থিয়েটার ও বিশ্বথিয়েটার সম্বন্ধে আগ্রহ বাড়তে থাকে এবং থিয়েটার-সম্বন্ধীয় বইপত্তর নিয়ে মনোযোগ-সহকারে পড়াশোনা শুরু হয়। জানতে পারেন, উনিশ শতকের শুরুতেই বিদেশের থিয়েটারে জরুরি প্রয়োজনে 'director' কথাটি এসে গেছে—আমাদের দেশে যার শুরু শিশিরকুমারের সময় থেকে। রবীন্দ্রনাথই তো তাঁকে প্রথম প্রয়োগকর্তারূপে সম্মান জানালেন। সৌমিত্র-র মনে একটা তাড়না ছিল; তা হল, অনেক বেশি অভিনয় করতে হবে। আর এই সুযোগটা পাওয়া যাবে যদি ডিরেক্টর হওয়া যায়; কারণ শুধু নিজের চরিত্র নয়, অন্যান্য অভিনেতাদের ভিন্ন-ভিন্ন চরিত্রে অভিনয় দেখাতে গিয়ে সেইসমস্ত চরিত্রে অভিনয়ের চর্চা হবে। সমস্ত চরিত্রের নানা তথ্য সংগ্রহ করে এক চরিত্রের সঙ্গে অপর চরিত্রের একটা সম্পৃক্ততা তৈরি হবে। সমস্ত অভিনয়ে একটা সমন্বয় তৈরি হবে। আর শিশিরকুমারের প্রযোজনা দেখার পর থেকেই দল গঠন করে ভালো প্রযোজনার তাগিদে তিনি নির্দেশক হতে চাইলেন। কিন্তু তখন তা হল না—তিনি চলচ্চিত্রের পেশাদার অভিনেতা হলেন। বেশকিছু বছর চলচ্চিত্রে অভিনয় করার পর মনে হল, থিয়েটারের একটা টান অনুভূত হচ্ছে, অথচ অত্যধিক ব্যস্ততার জন্য কিছু করা সম্ভবই হচ্ছে না। সেই সময়টাতে চলচ্চিত্রের কলাকুশলীদের সংগঠন অভিনেতৃ সংঘ তাঁরই তত্ত্বাবধানে নাটকের অভিনয় শুরু করল। বিশিষ্ট নির্দেশকরা—যেমন উৎপল দত্ত, অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়—আমন্ত্রিত হয়ে দায়িত্ব পালন করলেন, এমনকি সৌমিত্রও দায়িত্ব নিয়েছিলেন; অর্থাৎ মঞ্চাভিনয়ের একটা সচলতাও থাকল।

শুরুতে অভিনেতৃ সংঘের দুস্থ, প্রবীণ ও কর্মহীন শিল্পীদের সাহায্যের জন্য তহবিল গড়ার সিদ্ধান্ত হয়। তখন থিয়েটার করে অর্থ সংগ্রহ করতে হবে বলে নাটক করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। সেই সময়ে অনুপকুমারের নির্দেশনায় রবীন্দ্রনাথের *শেষরক্ষা* নাটক অভিনীত হয়। তারপর অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশনায় ধর্মবীর ভারতীর *অন্ধযুগ* নাটকটিও মঞ্চস্থ হয়। তার কারণ তখন সৌমিত্র অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, নির্মল ঘোষ, প্রমুখ বিশিষ্টজনের কাছে আলাপচারিতায় প্রস্তাব দিয়েছিলেন নতুন ধরনের পরীক্ষামূলক নাট্যপ্রযোজনার জন্য। সেই সময় বোম্বাই থেকে অভিনেতৃ সংঘের কাছে দুটি নাটক অভিনয় করার আমন্ত্রণ আসে। প্রথমটি *অন্ধযুগ*। দ্বিতীয়টি অজিতেশের অনুরোধে সৌমিত্র পরিচালনা করেন হেনরিক ইবসেনের *গোস্ট্স* অবলম্বনে নাটক *বিদেহী*। যখন নতুন নাটক খোঁজা হচ্ছে তখন অজিতেশই বলেন যে, ইবসেনের *গোস্ট্স*-এর একটা অ্যাডাপ্টেশন আছে নান্দীকারে, তবে সেটা খুব ভালো নয়। সৌমিত্র সেটি দেখেন, কিন্তু তাঁরও পছন্দ হয়নি। তিনি নিজেই *গোস্ট্স*-এর অনুবাদ করেন। সম্ভবত বোম্বাইতেই নাটকটির প্রথম অভিনয় হয়। অভিনেতৃ সংঘ ১৯৭৩-এর ৪, ৫, ৭ ও ১০ ডিসেম্বর চার-দিন-ব্যাপী নাট্যোৎসবের

অয়োজন করেছিল কলকাতায়। সেই উৎসবে *রাজকুমার* (ক্লিফোর্ড ওডেট্‌সের *'দি বিগ নাইফ'* অবলম্বনে, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের নির্দেশনায়), *হঠাৎ নবাব* (জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের রচনায়, নির্দেশনা অনুপকুমারের নির্দেশনায়), *বিদেহী* (ইবসেনের *গোস্ট্‌স* অবলম্বনে, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের নির্দেশনায়), *ক্রুশবিদ্ধ কুবা* (উৎপল দত্ত-র রচনা ও নির্দেশনায়) অভিনীত হয়। উৎসবে প্রকাশিত স্মরণিকায় অভিনেতৃ সংঘের সাধারণ সম্পাদক সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় জানিয়েছিলেন—অভিনেতৃ সংঘ হল পেশাদার অভিনেতাদের সংগঠন। ট্রেড-ইউনিয়ন আইনে সংগঠিত যদিও নয়, তবু সংঘবদ্ধভাবে অভিনেতৃসমাজের কিছু হিত সাধন করার লক্ষ্য নিয়েই প্রথমত এর পরিকল্পনা করা হয়েছিল। তারপর সংগঠন করতে এসে স্বভাবতই দেখা গিয়েছিল যে, অভিনেতাদের কল্যাণমূলক কাজের মধ্যে অভিনয়শিল্প ও নাট্যচর্চাও নিশ্চয়ই পড়ে। কিন্তু সমস্ত অভিনেতাদের সংঘবদ্ধ করা, তারপর তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করা, জনহিতকর কাজ, বিশেষ করে দুস্থ, প্রবীণ ও কর্মহীন শিল্পীদের সাহায্য করা—এইসব কাজেই সংঘের বেশিটা শক্তি ব্যয় হয়ে এসেছে বহুকাল। তাই বাংলা দেশের শ্রেষ্ঠ শিল্পীদের অধিকাংশ এই সংগঠনে থাকলেও নাটক করার সময়ে নতুন পরীক্ষামূলক নাটক বা আধুনিক প্রয়োগনৈপুণ্যের ছাপ অনেক দিন পর্যন্তই আমাদের নাটকে দেখা যেত না। অভিনয় যদিও এই একুশ বছরে অসংখ্য হয়েছে, কিন্তু তার লক্ষ্যটা থাকতো অর্থসংগ্রহ - দুঃস্থ শিল্পী অথবা বন্যা, খরা এবং দুর্বিপাক পীড়িতের সাহায্যের জন্যে। জনসাধারণ অকুণ্ঠ সহযোগিতা করেছেন, এই অর্থ সংগ্রহ করার প্রচেষ্টায়। কিন্তু তাঁরা বারবারই প্রশ্ন করেছেন, যে-সংগঠন দেশের শ্রেষ্ঠ অভিনেতাদের নিজস্ব সংগঠন, তাঁরা যখন নাটক করেন তখন তার মান উচ্চতর হয় না কেন? সুখের কথা আমরাও এই ভাবনা ভাবতে পেরেছি এবং গত কয়েক বছরে কালোপযোগী কয়েকটি প্রযোজনাও করতে পেরেছি। সুধী দর্শক সাধুবাদ জানিয়েছেন, সহযোগিতা করেছেন। এই নাট্যোৎসবের পরিকল্পনা গ্রহণ করার পেছনেও এই দুটি চিন্তাই আমাদের ছিল: দুস্থ শিল্পীদের জন্য অর্থসংগ্রহ করা এবং উৎকৃষ্ট নাট্যপ্রযোজনার মাধ্যমে নাট্যরসিকদের আনন্দ দেওয়া।

সাধারণ সম্পাদকের মন্তব্য থেকে এটি স্পষ্ট যে, অভিনেতৃ সংঘের কর্মকাণ্ড পাঁচের দশকে শুরু হলেও তেমন উন্নতমানের প্রযোজনা তাঁরা করতে পারেননি। শুধু তাই নয়, গত একুশ বছরে তাঁরা অসংখ্য প্রযোজনা করেছেন, তবে জনসাধারণের সমালোচনায় এবার তাঁরা উন্নতমানের প্রযোজনার কথা ভাবলেন। আসলে শুরুর দিকে সৌমিত্র-র চলচ্চিত্রে ব্যস্ততার কারণে অন্যান্য বিশিষ্ট অভিনেতারাই পরিচালনার দায়িত্ব নিয়েছিলেন। কিন্তু সৌমিত্র-র শিশিরকুমারের সান্নিধ্য ও থিয়েটারের অন্যান্য বিশিষ্টজনের সখ্য এবং থিয়েটারের প্রতি তাঁর আনুগত্য ও তার নিরলস চর্চা তাঁকে অনুপ্রাণিত করেছিল পরীক্ষামূলক নাট্যচর্চার

প্রতি। পেশাদার থিয়েটারের পাশাপাশি বহুরূপী নাট্যগোষ্ঠীর নাটক দেখতে শুরু করেন। তখন বয়স অল্প; সবকিছু দেখে বেড়াবার প্রবল উৎসাহ ছিল। নাটকের প্রযোজনা নান্দনিক দিক থেকে কত সুন্দর হতে পারে তা তিনি শম্ভু মিত্র-র প্রযোজনায় প্রথম দেখলেন। অন্যদিকে উৎপল দত্ত-র প্রযোজনাগুলো তাঁকে দারুণভাবে নাড়া দিত একটাই কারণে; তা হল তাঁর vitality। তার প্রবল জীবনীশক্তি নিয়ে এমনভাবে দর্শকদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ত যে, তাতে মুগ্ধ না-হয়ে উপায় থাকত না। যদিও দর্শকের আসনে, তবুও তিনি মনে-মনে ভাবতেন যদি কোনোদিন নাটক করেন তাহলে উৎপল দত্ত-র মতো মঞ্চতৈরি ও তার ব্যবহারের দিকে নজর দেবেন। তিনি মনে করেন, মঞ্চসজ্জা ও তার ব্যবহারের শিক্ষা তিনি পেয়েছেন শম্ভু মিত্র ও উৎপল দত্ত-র নাটকের কাছেই। আর-এক বিশিষ্টজনের প্রতি তাঁর গভীর শ্রদ্ধা; তিনি হলেন অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি স্বীকার করেছেন, একালের ছেলেমেয়েদের নিয়ে অল্প সময়ে নাটক করতে গেলে কীভাবে execute করতে হয় তা অজিতেশের নির্দেশনায় *অন্ধযুগ* নাটকের প্রযোজনার সময়ে তিনি শিখেছেন। অজিতেশের কাছে অজস্র প্রেরণা পাওয়ার কথা স্মরণে রেখে বলেছেন যে নাটকের প্রতি তাঁর ভালোবাসা অন্তহীন, কিন্তু অজিতেশের মতো একটা passionate personality সত্যিই দুর্লভ। বলেছেন, যে-কোনো মানুষের মনেই অজিতেশ আলো জ্বেলে দিতে পারতেন। অভিনেতৃ সংঘের নাটক করার সময়ে বহু বিশিষ্টজনের সঙ্গ তাঁকে সমৃদ্ধ করেছে। অনুপকুমার প্রসঙ্গে বলেছেন যে, এত বড়ো backstage worker তিনি আজও দেখতে পাননি। গোটা প্রযোজনার back stage অনুপকুমার একাই সামলাতেন; সেটাও সৌমিত্র-র কাছে শেখার ব্যাপার ছিল। অভিনেতৃ সংঘে নীলিমা দাস, অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রমুখ অভিনেতৃবর্গের কাছে তিনি অভিনয়ের অনেক খুঁটিনাটি জিনিস শিখেছেন।

শিশিরকুমারের সঙ্গ পাওয়ার শুরুতে দাদাস্থানীয় বন্ধু গৌরমোহন মুখোপাধ্যায়ের কাছে শিশিরকুমার সম্পর্কে এত কথা শুনেছিলেন যে, তিনি একজন অসামান্য অভিনেতা, অসাধারণ পণ্ডিত ব্যক্তি, তাঁর মননশীলতা যে খুবই উচ্চপর্যায়ের, তা মগজে ঢুকে গিয়েছিল। এবং গিরিশ ঘোষের জীবন সম্পর্কে পড়তে গিয়ে তাঁর মনে হয়েছিল, তিনিও একজন অত্যন্ত বিগদ্ধ ব্যক্তি। সৌমিত্র বুঝতে পেরেছিলেন, থিয়েটারে পড়াশোনা থাকাটা অত্যন্ত জরুরি ব্যাপার। সেই সময়েই মনে মনে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, তিনি নিজে যখন থিয়েটার করবেন তখন যেন সেখানে এই পড়াশোনার ব্যাপারটার পরিচয় থাকে। যদিও সাধ্যের একটা সীমা আছে, পরিবেশ-পরিস্থিতির চাপ আছে, কিন্তু তার মধ্যেই যেন একটা মননশীলতার ছাপ থাকে। তাই প্রতিটি ক্ষেত্রেই তিনি চেয়েছেন যত্নবান হতে। বিষয়নির্বাচন, নাটক নির্বাচন, অভিনয়ের স্টাইল, প্রযোজনার সৌকুমার্যের কথা ভেবেছেন, যাতে তাঁর

নাট্যপ্রযোজনায় শিক্ষা, রুচি ও মননশীলতার একটা পরিচয় থাকে। তাই ১৯৬৩ সালে সর্বপ্রথম দেবনারায়ণ গুপ্ত যখন তাঁকে স্টার থিয়েটারের নাট্যপ্রযোজনায় অভিনয়ের আমন্ত্রণ জানান তখন তাঁকে বেশ পরিশ্রম করতে হয়েছিল। তিনি স্বীকার করেছেন, ''তাঁকে নিয়ে আসার জন্য বেশ কয়েকদিন আমাকে হাঁটাহাঁটি করতে হয়েছে—কারণ আমি জানতাম সৌমিত্র নাটক সম্পর্কে যে প্রগতিশীল ভাব ও ভাবনায় উদ্‌বুদ্ধ, *তাপসী* সে ধরনের নাটক নয়। তবুও সে আমার কথায় স্টার থিয়েটারে যোগদান করেছিল, *তাপসী* নাটকে নায়কের ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। তাঁর প্রাণবন্ত অভিনয় প্রতিটি দর্শককে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করত।''

সাধারণ রঙ্গমঞ্চ ও গ্রুপ থিয়েটারের নাট্যপ্রযোজনায় সৌমিত্র এখনও পর্যন্ত আনুমানিক সতেরোটি নাটকে অভিনয় করেছেন। সাধারণ রঙ্গমঞ্চ যেমন স্টার, রঙমহল, কাশী বিশ্বনাথ মঞ্চ, তপন থিয়েটার ইত্যাদি আবার অন্যদিকে গ্রুপ থিয়েটার যেমন স্বপ্নসন্ধানী, মুখোমুখি, আয়ন্দা, প্রাচ্য ইত্যাদি তাঁর নাট্যাভিনয়ের প্রযোজক সংস্থা। তাঁর অভিনীত নাটকের তালিকায় *তাপসী* (১৯৬৩), *নাম জীবন* (১৯৭৮), *রাজকুমার* (১৯৮৩), *ফেরা* (১৯৮৭), *নীলকণ্ঠ* (১৯৮৮), *ঘটক বিদায়* (১৯৯০), *দর্পণে শরৎশশী* (১৯৯২), *চন্দনপুরের চোর* (১৯৯৪), *টিকটিকি* (১৯৫৫), *প্রাণতপস্যা* (১৯৯৮), *আরোহণ* (২০০৪), *হোমাপাখি* (২০০৬), *আত্মকথা* (২০০৮), *তৃতীয় অঙ্ক, অতএব* (২০১০), ইত্যাদি এবং এর মাঝে দুটি ছোটো নাটক *আর একটি দিন* (২০০২) ও *কুরবানি* (২০০৩)। ১৯৭৮-এ সৌমিত্র যখন চলচ্চিত্রে অভিনয়ের পাশাপাশি পাকাপাকিভাবে থিয়েটারে অভিনয় করার পরিকল্পনা নিলেন তখন তাঁর স্ত্রী দীপার করা *মুন অন আ রেইনবো শল* (অরিজিনাল ওয়েস্ট ইণ্ডিয়ান প্লে) নাটকের অনুবাদ *রামধনু রঙের চাদর* নির্বাচন করলেন। তিনি যখন কাশী বিশ্বনাথ মঞ্চে নাটকটির নিয়মিত অভিনয়ের কথা ভাবলেন, তখন নাটকটি একটু অদলবদল করে ও শেষ অংশটি পালটিয়ে নাম দিলেন *নাম জীবন*। এ নাটকে সংগীতের দায়িত্বে ছিলন ভাস্কর মিত্র, মঞ্চসজ্জা সুরেশ দত্ত এবং আলো তাপস সেন। তাপস সেনের কথায়, ''উৎপল দত্তর পর আমি এই প্রথম একজন আধুনিক শিক্ষিত ও প্রগতিশীল নাট্যবিদকে পেলাম—যার সঙ্গে সাধারণ রঙ্গালয়ের পরিচিতি ছিল একজন আগ্রহী দর্শক হিসাবে, তার চেয়ে বড় কথা শিশিরকুমারের খাঁটি অনুগামী শিষ্য হিসাবে। 'নামজীবন'-এ এসে দেখলাম প্রথম স্ক্রিপ্ট রিডিং থেকেই ও একদম জমিয়ে দিল। এরপর ধাপে ধাপে পরিকল্পনার কথা এল, আমি সুরেশ দত্তকে নিয়ে গেলাম। সুরেশকে সৌমিত্র তার চিন্তা ভাবনা সবিস্তারে বুঝিয়ে তো দিলই, আর এও জানালো যে একটি মাত্র দৃশ্য নাটকে শুরুর থেকে শেষ। সুরেশও সৌমিত্রর পরিকল্পনার বাস্তব রূপায়ণে কাজ করেছিল যাতে সৌমিত্রর স্টেজ-এ অভিনয়ের কম্পোজিশন আবহাওয়া সবটাই অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত ছিল। আমিও সৌমিত্রর এ নাটকে আলোর প্রয়োগ পরিকল্পনা করে বলতে

গেলে সাধারণ রঙ্গালয়ে একটা ব্যতিক্রমী কাজ করার জন্য আনন্দ পেয়েছি। আধুনিক থিয়েটারের সকল বিভাগের সার্থক সমাবেশে একটা নতুন নজীর স্থাপন করা গেল সৌমিত্র চ্যাটার্জীর প্রযোজনায় এবং তার জন্য আমি বিশেষ মনে করি কাশী বিশ্বনাথের মতো মঞ্চে এই দুঃসাহসী প্রয়োগ সম্ভব করে তোলার জন্য প্রযোজক হরিদাস স্যান্যালের কথা। 'নামজীবন' নাটকের খুবই নাম হয়েছিল সেদিন—অনেক আলোচনা তুলেছে অভিনন্দনও অনেক পেয়েছে, সৌমিত্র ও আমাদের সকলের সম্মিলিত প্রয়োগে এই নাট্যসৃষ্টি—তথাকথিত কোনও জাঁকজমক ছাড়া রূঢ় বাস্তবতার পরিবেশে বিষন্ন একটি প্রায় বস্তির বাসিন্দারা জীবন্ত হয়ে কলকাতার একটা চেহারা হাজির করতে সক্ষম হয়েছিল সৌমিত্রর পাবলিক থিয়েটারে আত্মপ্রকাশে - আরো অনেক অভিনন্দনের মধ্যে আমার মনে আছে আমার দীর্ঘকালের সহযোগী বন্ধু উৎপল দত্ত একটি উচ্ছসিত দীর্ঘ সমালোচনা লিখেছিল 'নামজীবন' প্রসঙ্গে ওদের 'এপিক থিয়েটার' পত্রিকায়।" তাপস সেনের কথায় আমরা যে প্রযোজক হরিদাস স্যান্যালের কথা শুনলাম, তাঁর প্রসঙ্গে কয়েকটি কথা বলে নেওয়া ভালো। পেশাদার থিয়েটারে সে সময়ে বহু প্রযোজকের মধ্যে বেশ কিছু প্রযোজক বিশিষ্ট হয়ে উঠেছিলেন, তাঁদের মধ্যে হরিদাস স্যান্যাল অন্যতম। তিনি ছিলেন সত্যিকারের এক নাট্যপ্রেমী মানুষ। থিয়েটারের ব্যবসায় নিয়োজিত হয়ে সবসময়ই তাঁর আর্টিস্ট এবং টেকনিসিয়ানদের সুখ স্বাচ্ছন্দের প্রতি সজাগ দৃষ্টি ছিল। প্রযোজক হিসাবে এমন মানুষকে পেয়েছিলেন বলেই কাশী বিশ্বনাথ মঞ্চে সৌমিত্র *নাম জীবন* নাটক অভিনয় করতে পেরেছিলেন। সুরেশের মঞ্চ ও তাপসের আলোয় নাটকের এক-একটি দৃশ্য যেমন, সৌমিত্র ওই বস্তিবাড়ীর ছোট্ট মেয়ে রুনির সঙ্গে গল্প করছে নিজেদের ছোট জগতের সুখ দুঃখ সমস্যা নিয়ে; এমন সময় বৃষ্টির আভাস দিয়ে 'মেঘগর্জন-বৃষ্টির' সূচনাও ছিল। আবার মাঝেমাঝে একটু ওপরের দিকে সৌমিত্রর ছোট শোওয়ার ঘরটি দৃশ্যমান হত খুব ধীরে-ধীরে কাউন্টার ওয়েটগুলির সাহায্যে সামনে দেওয়ালটা উঠে যেত—একটু আলো আর সংগীতের সুপ্রেয়োগে ঐ দৃশ্য উপস্থাপনার শুরুটা কত ব্যঞ্জনাময় হয়ে উঠত। *নাম জীবন* নাটকে সৌমিত্রর শিল্পবোধ পরিমিতি ও নিষ্ঠা তাপস সেনকে আবার নতুন করে উৎসাহিত করেছিল পেশাদার থিয়েটারে পেশাদার (professional) কথাটার মর্যাদার বিষয়ে। তাপসের মনে হয়েছিল, আলো পরিকল্পনা ও প্রয়োগে সৌমিত্রর সঙ্গে তাঁর বোঝাপড়াটা ঠিক শম্ভু মিত্র ও উৎপল দত্ত-র সঙ্গে অতীত শিল্পসৃষ্টির ক্ষেত্রে ভাববিনিময়ের জায়গাতে পৌঁছেছিল। এমন শিল্পসৃষ্টির মূলে সৌমিত্র যেমন ছিলেন, তেমন ছিলেন প্রযোজক হরিদাস স্যান্যাল। একথা সৌমিত্রও স্বীকার করেছিলেন, থিয়েটার করাটা তো প্র্যাকটিক্যাল কাজ, যে কোনও দেশে যে কোনও সময় যে কোনওভাবেই করা হোক না কেন, সেই প্র্যাকটিক্যাল চিন্তা থেকেই অনেক সময় টুকটাক

পরিবর্তন করতে হয়। যেমন এমন একটা কাজ নির্দেশক করতে চাইছেন যেটা অত্যন্ত খরচ সাপেক্ষ। অনেকসময় প্রযোজকের পক্ষে সেটা afford করা সম্ভব হয় না। কিন্তু সৌমিত্র *নাম জীবন* নাটক অসামান্য সেটের জন্যই বিখ্যাত হয়ে আছে। এই নাটকের মঞ্চসজ্জাতেই ব্যয়বহুল হয়েছিল, তবু হরিদাস স্যান্যাল কোনও বাধা দেননি বরং সৌমিত্রকে অবাধে কাজটা করতে দিয়েছিলেন।

যেমন ১৯৬৩-তে যখন সৌমিত্র স্টার থিয়েটারে অভিনয় শুরু করেছিলেন তখন স্টারে দক্ষ ম্যানেজমেন্ট ছিল। আর অনেক দিন থেকেই স্টারের একটা standard ছিল, অর্থাৎ অভিনেতা-অভিনেত্রীদের মধ্যে ভালো professional competence ছিল এবং একটা রুচিরও প্রশ্ন ছিল। সাধারণত স্টারে খুব উঁচুদরের নাটক সবসময় হত না বটে, কিন্তু আবার ভয়ংকর নিম্নরুচির নাটকও সেখানে কোনোদিন হয়নি। একটা মোটামুটি সুরুচিসম্পন্ন উপন্যাস থেকে নাট্যকৃত কোনো বিষয়বস্তুই সেখানে ছিল উপজীব্য—প্রযোজক ছিলেন সলিল মিত্র। পেশাদার থিয়েটারে এমনসব প্রযোজকের সমাবেশ হওয়া সত্ত্বেও আজ পেশাদার থিয়েটার একেবারেই নিশ্চিহ্ন। এ কথা ঠিক, গুটিকতক ভালো প্রযোজনা অথবা একজন বা দুজন পরিচালকের পক্ষে টিকিয়ে রাখার কাজটা যথেষ্ট নয়। পরের দিকে পেশাদার থিয়েটার যখন একে-একে বন্ধ হয়ে আসছিল তখন প্রযোজকরা অনিশ্চয়তায় ভুগতে শুরু করেছিলেন। তাঁর পরের নাটক *রাজকুমার*। অভিনেতৃ সংঘে এ-নাটকের অভিনয় শুরু হলেও সৌমিত্র আবার পেশাদার থিয়েটারে কিছু অদলবদল করে নাটকটির অভিনয়ের আয়োজন করেছিলেন। তাঁর সঙ্গে অভিনয় করেছিলেন সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়। এই *রাজকুমার* নাটকেই তিনি cinema projection-এর ব্যবহার করেছিলেন। নাটকটিতে ছিল এক চলচ্চিত্রের নায়ক রাজকুমারের জীবন ও সংকটের কথা। 'রাজরাজিত্বি দুধের বাটি' সে পেয়েছে। কিন্তু এই সফলতাকে পেতে গিয়ে নিজের প্রতিষ্ঠা ও উন্নতির আকাঙ্ক্ষাকে পদে-পদে আপস করতে হয়েছে তার নীতির সঙ্গে, বিবেকের সঙ্গে। আমাদের সমাজের সব জায়গাতেই যেমন সফলতার সঙ্গেসঙ্গে আসে নৈতিক ও মানবিক অবক্ষয়, রাজকুমারের জীবনেও তার ব্যতিক্রম হয়নি ইত্যাদি। এই প্রযোজনাটির প্রথম একশোটি অভিনয় হাউস ফুল হলেও বাণিজ্যিক সফলতা পেল না। সৌমিত্র-র মতে, আসলে *রাজকুমার*-এর যে-অসুবিধা হয়েছিল তা হল এর protagonist-কে লোকে সর্বাংশে নিতে পারেনি বা তার সঙ্গে identify করতে পারেনি। একে ফিল্মস্টারকে লোকে দূরের থেকে দেখে—সে একটা স্বপ্নের object; তাই তার সাথে identification-এ বাধা হয়েছিল। ফলে এ-নাটকের টিকিটবিক্রি ক্রমশ পড়তে পড়তে দুশো রাত্তিরেই বন্ধ হয়ে গেল। *রাজকুমার* যেমন বিদেশি নাটকের রূপান্তর, তেমনি বিশ্বরূপায় অভিনীত তাঁর পরের নাটক *ফেরা*-ও একটি জার্মান নাটক *দ্য ভিজিট*-এর রূপান্তর।

এই প্রযোজনায় প্রথম তিনি রূপান্তর ও নির্দেশনার পাশাপাশি সংগীতপ্রয়োগের দায়িত্বও নিয়েছিলেন। এ-নাটকে প্রেমাংশু বসু, নির্মল ঘোষ, মাধবী চক্রবর্তী, প্রমুখ বিশিষ্ট অভিনেতৃবর্গ অভিনয় করেছিলেন। তবে নাটকের রূপান্তরে তাঁর প্রথম হাতেখড়ি *ঘটক বিদায়* নাটকে। এই নাটকটি আমেরিকান নাটককার থর্নটন ওয়াইল্ডারের *ম্যাচমেকার*-এর রূপান্তর। ওয়াইল্ডার আবার *মার্চেন্ট অব ইয়ংকার্স* থেকে এটির রূপান্তর করেছিলেন। এই কাহিনিটি আবার একটি অস্ট্রিয়ান নাটক থেকে নেওয়া হয়েছিল। ওই অস্ট্রিয়ান নাটকটি আজ থেকে প্রায় একশো বছর আগে রচিত মূল ব্রিটিশ নাটকের রূপান্তর। সৌমিত্র মূল নাটকটি পড়ার সুযোগ পাননি বলে *ঘটক বিদায়* নাটক মূল থেকে কতটা সরে এসেছিল তা তাঁর জানা ছিল না। তুর্গেনেভের *আ পুয়োর জেন্টলম্যান* অবলম্বনে তিনি *নীলকণ্ঠ* নাটক রচনা করেছিলেন, যদিও এই নাটকটিও আগাগোড়াই বদলে গিয়েছিল এবং সৌমিত্রও নাটকটির প্রয়োগেও নানা নতুন ধরনের ভাবনা আরোপ করেছিলেন। নাটকের সূত্রধার চরিত্রটি সরাসরি দর্শকের সঙ্গে কথা বলতেন। সেইসঙ্গে ছিল অসাধারণ টিমওয়ার্ক। *নীলকণ্ঠ* নাটকের নামভূমিকায় সৌমিত্র। এই নামভূমিকা বিরাট ভূমিকা, অত্যন্ত ভারী ভূমিকা—যাকে থিয়েটারে বলা হয় হেভি—অনেকটা শেক্সপিয়ারের নাটকে যেরকম। শুরু থেকে শেষ সেই নীলকণ্ঠ মঞ্চে থাকছে—তারই যতরকম কর্মকাণ্ড—সেইটে এত বেশি কর্তৃত্ব করত যে-দর্শক টিমওয়ার্কের চেয়ে ওই নীলকণ্ঠ-র প্রতি বেশি মনোযোগ দিত। তাপস সেন বলেছেন, 'নীলকণ্ঠ নাটকে মঞ্চ পরিকল্পনা অভিনয় সবকিছুর অভিনবত্বের মধ্যে সৌমিত্রের মৌলিক কল্পনার পরিচয় পেয়েছি আর সে কারণেই ঐ নাটকে আমিও অন্যরকম করে আলোর বিন্যাস করতে মজা পেয়েছি—দৃশ্যান্তর স্টেজ ঘুরিয়ে ব্যবহার তো ছিলই। তাছাড়া নাটকের মাঝখানে সাঙ্গোপাঙ্গোদের মদ্যপানে বাধ্য হওয়া ও উত্তরোত্তর মদ খেতে বাধ্য হয়ে যে অসহায় বেহেস্ত মাতলামীতে রূপান্তর হবার সংযত অথচ হৃদয়স্পর্শী ভাবান্তর—মঞ্চে তা আমি খুব কমই দেখেছি। অল্প স্তিমিত নীচু কোণ থেকে আসা আলোয় সেই অতি বিধ্বস্ত মানসিকতার যে অভিব্যক্তি ওই নাটকে সৌমিত্র প্রকাশ করতে পেরেছিল আজও আমার মনে সে স্মৃতি উজ্জ্বল হয়ে আছে।'' তাপস সেন এই প্রযোজনায় অংশ নিয়েছিলেন, প্রযোজনাটি তৈরির প্রতিমুহূর্তে তিনি যুক্ত ছিলেন তাঁর এই অনুভূতি স্বাভাবিক। কিন্তু সেদিন দর্শকের আসনে মনোজ মিত্রের অভিব্যক্তি, এক কথায় অসাধারণ। তিনি বলেছেন, 'শিশিরকুমার ছিলেন মঞ্চের কবি। চেনা মঞ্চটিকে মুহূর্তে অচেনা করে তুলতে তাঁর জুড়ি ছিল না সেদিন বাংলা থিয়েটারে। ষোড়শীর জীবানন্দ। চেনা শব্দ চেনা স্পর্শে ঘরোয়া জীবনের ছবি আঁকতে আঁকতে কখন যে ধরাছোঁয়ার বাইরে উড়ে যেতেন ভাদুড়িমশাই, উড়িয়ে নিয়ে যেতেন তাঁর দর্শককে, টের পাওয়া যেত না। একালের দর্শক শিশিরকুমারের মঞ্চাভিনয় দেখেননি। কিন্তু

যারা সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের 'নীলকণ্ঠ' দেখেছেন, বিরতির আগের মুহূর্তে সেই অনাস্বাদিত অভিজ্ঞতার একটা ঝলক পেয়েছেন নিশ্চয়। মদের আসরে টুকরো টাকরা সাধারণ কথাবার্তা আর খুচরো কাজকর্মের ফাঁক-ফোকর দিয়ে ছিটকে বেরিয়ে গিয়ে বিড়ম্বিত নীলকণ্ঠ কখন যে দশাসই হ'য়ে ওঠে, কখন যে তার সারাজীবনের অন্তর্দাহ দুরন্ত দাবানলের মতো চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে, বোঝাই যায় না কিছুক্ষণ। স্তম্ভিত হয়ে দেখতে হয় মঞ্চটা তখন তুচ্ছ হয়ে গেছে, শববাহী খাটের মতো পরিত্যক্ত পড়ে আছে, নাটক কখন আমাদের লৌকিক জগৎটা অতিক্রম করে গেছে।"

অভিনয়ের ব্যাপারে চার্লি চ্যাপলিনের একটি বিখ্যাত উক্তি আছে, তা হল একজন অভিনেতার মধ্যে একই সঙ্গে মস্তিষ্কের ক্রিয়া এবং তার আবেগের উত্তমরূপ—দুটো এক জায়গায় যদি না মেলে তাহলে ভালো অভিনয় পাওয়া যায় না। একজন অভিনেতার কোনো প্রথাগত শিক্ষা না থাকতে পারে কিন্তু অভিনয়ের সময় স্বাভাবিক বুদ্ধিটা তো প্রয়োজন। না হলে সে পারবেই না। আবার এটাও ঠিক, মননশীলতাকে সমৃদ্ধ করতে হলে সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে তাঁর চেতনার বিস্তার হওয়া প্রয়োজন। যেমন কোনো ঐতিহাসিক নাটকের অভিনেতা তাঁর ইতিহাস চেতনা ও তাঁর বোধ অভিনীত চরিত্রটিকে সম্পূর্ণ হতে সাহায্য করে। *নীলকণ্ঠ* নাটকের মাঝে সাঙ্গোপাঙ্গদের মদ্যপানে বাধ্য হওয়া ও উত্তরোত্তর মদ খেতে বাধ্য হয়ে যে অসহায় বেহেড মাতলামিতে রূপান্তর হবার অভিনয়ে সৌমিত্রর সংযত অথচ হৃদয়পর্শী ভাবান্তরের প্রস্তুতি প্রসঙ্গে তিনি নিজেই বলেছেন, "যেখানে চরিত্রটাকে আমি ভাবি বা মনে মনে তাকে সৃজন করি—মানসিকভাবে যেখানে আমি তাকে গঠন করি সেখানটায় সচেতনভাবেই করি—আমার অভিজ্ঞতা দিয়ে আমার বিচার বুদ্ধি দিয়ে, analysis দিয়ে চরিত্রটাকে তৈরি করি। কিন্তু যখন actually সেটাকে execute করি— প্রত্যক্ষ যখন অভিনয় কর্মটা করতে থাকি—তখন সেইভাবে সচেতনভাবে করতে গেলে আর করা যায় না। সেখানে আত্মবিলোপের একটা প্রশ্ন আছে। সেখানে আমার দেহগঠন, আমার কণ্ঠস্বর, আমার বাচিক যে range সেসব কিছুর মধ্যে সেই concept টা যেটা আমি এতদিন ধরে ভেবেছি বা তৈরি করেছি—সচেতন ভাবে যেটা তৈরি করা, সেটাকে স্থাপনা করতে হয়, করে একটা spontaneous expression-এর মধ্যে যেতে হয়, spontaneous প্রকাশের মধ্যে—সেখানেই আত্মলোপের প্রশ্নটা আসছে। সেখানে যদি আত্মসচেতন হয়ে থাকা যায় তাহলে অভিনয়টা কখনোই বিশ্বাসযোগ্য হয়ে ওঠে না। বিশেষ করে যে চরিত্র কোনো ভাবেই আমার মত নয়, অন্তত apparently নয় - কিন্তু তার ভিতর কতকগুলো fundamental human emotion কাজ করছে যা আমারও ভিতর হয়তো আছে। তখন আমার নিজের emotion,নিজের ভিতরকার feeling-গুলোকে প্রাধান্য দিতে হয়

rather than বিচার এবং analysis - সেখানেই হচ্ছে আত্মলোপ।' আর তখনই মনে হয় নীলকণ্ঠ কখন যে বিশাল আকৃতির হয়ে উঠেছে, কখন যে তার সমস্ত জীবনটার অন্তর্দাহ চতুর্দিকে দুরন্ত দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়েছে, কিছুক্ষণ যেন বোঝাই যায় না। সমস্ত অভিনয়টাই তখন অন্য মাত্রায় পৌঁছে হৃদয়গ্রাহী হয়ে ওঠে।

সৌমিত্র *নাম জীবন* নাট্যপ্রযোজনার কাল থেকে পেশাদার থিয়েটারে একটা নতুন হাওয়ার অনুপ্রবেশ ঘটিয়েছিলেন। নির্ভা আর্ট্স প্রযোজিত তপন থিয়েটারে তাঁরই নির্দেশনায় *দর্পণে শরৎশশী* নাটকটিতেও সেই নতুন হাওয়ার সুবাস পাওয়া গিয়েছিল। পেশাদার থিয়েটারে এই প্রথম তিনি আদ্যন্ত একটি বাংলা নাটকের প্রযোজনা করলেন। গ্রামবাংলার এক মহকুমা শহরের প্রাচীন জমিদারবাড়ির পরিবেশে রচিত মনোজ মিত্রর এই নাটক। থাম, টানাপাখা, ঝাড়লণ্ঠন, আরামকেদারা, রেলিং, আলবোলার নল সব নিয়ে ঊনবিংশ শতাব্দীর গ্রামীণ বিত্তবানের গৃহ - বাস্তবপ্রতিম। এই প্রথম খালেদ চৌধুরী পেশাদার থিয়েটারে মঞ্চসজ্জা করলেন। তাঁরই পরিকল্পনার অন্তর্গত মঞ্চের স্পেস নাটকের প্রয়োজনে ব্যবহৃত হল। আলোকপরিকল্পনায় ছিলেন তাপস সেন।

পেশাদার থিয়েটার বাঁচিয়ে রাখার তাগিদে, থিয়েটারে পেশাদার মানসিকতা গড়ার প্রয়োজনে উত্তর থেকে দক্ষিণে শহরের নানা মঞ্চে ভিন্ন-ভিন্ন ধরনের নাট্যপ্রযোজনা তিনি করেছিলেন। এত নাট্যপ্রযোজনার মাঝে দুটি কমেডি নাটক *ঘটক বিদায়* ও *চন্দনপুরের চোর* প্রশংসিত হয়েছিল। *চন্দনপুরের চোর* নাটকটি ছিল ভাসাভাসা, কোনো সারবত্তা ছিল না। কিন্তু *ঘটক বিদায়* নাটকটিতে জীবনবোধের পরিচয় ছিল এবং নাটকটিও ছিল এক মানুষের জীবন সংগ্রামের কাহিনি। নাটকটি অসাধারণ কিন্তু প্রযোজনাগত ত্রুটি থাকায়, অর্থাৎ মঞ্চসজ্জা ও আলো ভালো না-হওয়ায়, *ঘটক বিদায়* নাটকটির সুনামে ঘাটতি ছিল। স্টারে এই নাটকটি যখন অভিনীত হচ্ছিল, তখন স্টার থিয়েটার পুড়ে যায়। কিছুদিন নাটকটি বিজন থিয়েটারে অভিনীত হয়। অথচ ফরাসি নাটক *থিভ্স কার্নিভাল*-এর রূপান্তর *চন্দনপুরের চোর*। পেশাদারি-সাফল্য পেয়েছিল, যাকে বলা যায় commercial hit। কমেডির প্রতি সৌমিত্র-র অসম্ভব আগ্রহ, তিনি সবসময়ই মনে করেন, sense of humour না-থাকলে একটা মানুষ সম্পূর্ণ হয় না। জীবনে বাঁচতে গেলে যা ভীষণভাবে প্রয়োজন। এই ভাবনা থেকেই অন্যান্য প্রযোজনার মাঝে কমেডি নাটকের নির্বাচন। পেশাদার থিয়েটারে অভিনয়ের মাঝে স্বপ্নসন্ধানী নাট্যদলের হয়ে তিনি *টিকটিকি* নাটকটির প্রযোজনা করেছিলেন। এটি নাট্যদলের প্রযোজনা হলেও তিনি বিশ্বাস করতেন এ নাটকটি পেশাদার থিয়েটার-এর নাটক, কারণ চিত্তবিনোদনের দিক থেকে নাটকটি উচ্চমার্গে বাঁধা ছিল। এই প্রযোজনা দেখে সব রকমের দর্শকই আনন্দ পেয়েছেন। যিনি বুদ্ধি দিয়ে দেখেছেন তিনিও, আবার যিনি কাহিনির

মজা পেতে এসেছেন তিনিও। পেশাদার থিয়েটারে এ নাটকটির ব্যাপারে তাঁর নানারকম পরিকল্পনা ভেস্তে যাওয়ায় তিনি স্বপ্নসন্ধানীর হয়ে নাটকটির প্রযোজনা করেন। নাটকটির দুটি চরিত্র, ইচ্ছে ছিল উৎপল দত্তের সঙ্গে অভিনয় করবেন। তিনিই মূল নাটক *স্ল্যুথ*-এর রূপান্তর করতে বলেন। উৎপল দত্ত যখন সময় দিতে পারলেন না, তখন উত্তমকুমারকে অনুরোধ করেন। উত্তমকুমারও পারলেন না অবশেষে কৌশিক সেন।

পেশাদার থিয়েটারে সৌমিত্র-র নাট্যপ্রযোজনা *ন্যায়মূর্তি* অভিনয়ের সময় থেকেই থিয়েটার কেমন যেন বিশৃঙ্খল চেহারা নিতে শুরু করল। পেশাদার থিয়েটারের এই বিপন্নতা কোনো আকস্মিক ঘটনা নয়, থিয়েটারের কর্তৃপক্ষের অনভিজ্ঞতা, অর্থলোলুপতা এবং নিছকই আত্মবিলাসের ফলে ক্রমান্বয়ে অধঃপতনের পথে ভবিষ্যৎ ধীরে-ধীরে এগিয়ে নিয়ে গেছে। এই থিয়েটার থেকে সাধারণ দর্শক মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে সত্যি, কিন্তু তাঁরা অনেক সহিষ্ণুতার পরিচয় দিয়েছে বছরের পর বছর। অথচ একসময় সাধারণ রঙ্গালয় তথা পেশাদার থিয়েটারের উপযোগিতা বাঙালির সাধারণ জীবনে কেমন প্রভাব ফেলেছিল সে-সম্পর্কে শচীন সেনগুপ্ত বলেছিলেন, "বিশেষ ব্যক্তিকে খুশি করলেই আজকের থিয়েটার প্রতিষ্ঠালাভ করতে পারে না। তাকে সকল শ্রেণীর লোককে খুশি করতে হয়, গোষ্ঠী সমর্থনের দিকে দৃষ্টি রাখতে হয়। নইলে তার অস্তিত্ব থাকে না।" এ কথা ঠিক, পেশাদার থিয়েটারে প্রকৃত বিদগ্ধজনের সমাগমের মাঝে সাধারণমানের দর্শকও হাজির হতেন নানারকম মনোভাব নিয়ে; কেউ চান হাসি, কেউ আবার নৃত্যগীত, কেউ-বা উৎকৃষ্ট আবেগময় অভিনয়, আবার কেউ চান অতিস্বাভাবিক অভিনয়, ইত্যাদি। সহজ কথায়, দর্শকরা হলেন মাছবিক্রেতা থেকে শুরু করে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিদগ্ধ মানুষ। সেখানে সকল শ্রেণির মানুষ মনে কিছু-না-কিছু ধরে রাখবার মতো বস্তু যদি না-পান তাহলেই পেশাদার থিয়েটারের বিপদ ঘনিয়ে আসে। এই পেশাদার থিয়েটারের বিলুপ্তির হরেকরকম কারণ, যার কোনো শেষ নেই। সৌমিত্র বলেছেন যে, যদি মনে করা হয় ওই থিয়েটারটা শুধুমাত্র খারাপ থিয়েটার করার জায়গা, এবং যাঁরা ভালো থিয়েটার করতে পারেন তাঁদের ভিতরে যদি জাতপাতের মতো একটা পইতেধারণের অভিমান থাকে যে, তাঁরা পেশাদার থিয়েটারের বাইরের থিয়েটার করে নাম করবেন, তাহলে তাঁদের কাছ থেকেও তো এই থিয়েটার অবহেলিত হয়েছে এটা যেমন একটা কারণ আবার সেখানে ভালো প্রতিভার প্রবেশ ঘটছে না, অর্থনৈতিক প্রতিকূলতায় থিয়েটারগুলোর সংস্কার হচ্ছিল না, সে-কারণে থিয়েটারগুলো জীর্ণদশাপ্রাপ্ত হচ্ছিল। এরপর থিয়েটারের নতুন মালিকরা কিন্তু থিয়েটার করেন না, থিয়েটারকরিয়েদের হাতে যদি থিয়েটারের মালিকানা না-থাকে তাহলে যে-দশা হয়, এই থিয়েটারগুলোর সেই দশা ঘটতে লাগল।

ম্যানেজমেন্টের দিক থেকে অনেক গাফিলতি দেখা দিল। থিয়েটারের সম্বন্ধে যাদের

এতটুকু ধারণা নেই, তাঁরা যেন এখানে ফাটকা খেলতে এলেন যে দেখাই যাক না কতটা ব্যবসা হয়। কর্মচারী সমস্যা, নিয়োগ সমস্যা, এমনকি শিল্পীদের ও এই অ্যাড-হক-বেসিসে-সিনেমার নামকরা শিল্পীকে এমন টাকা দিয়ে আনলেন, যে টাকা দিলে মাসে সব শো হাউসফুল করেও টাকা ওঠে না, এগুলো হল ভুল ম্যানেজমেন্ট।

পেশাদার থিয়েটার আজ আর নেই, কিন্তু সৌমিত্র আজও আছেন থিয়েটারে তাঁর পেশাদার মনোভাব নিয়ে, বিভিন্ন নাট্যগোষ্ঠীর হয়ে আজও নাটক করে চলেছেন তিনি। থিয়েটারের নিত্যনতুন পরীক্ষা নিরীক্ষায় আজও তিনি মজে আছেন। ছোট মফস্বল শহরের ছোট বাঙালি পরিবারের স্মৃতি, তার অনুষঙ্গ ও তার অভিজ্ঞতা, অন্যদিকে বিশিষ্ট গুণীজনের সান্নিধ্যে প্রতিনিয়ত নানা সৃজনমূলক কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত, মনেপ্রাণে এক পেশাদার সৃজক সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়।

তথ্যসূত্র:

১। 'বাংলা পেশাদারি থিয়েটারের নির্মাণ ও বিলুপ্তি', *নাট্যচিন্তা* (সংখ্যা ৭–১২)
২। অনসূয়া রায় চৌধুরী (সাক্ষাৎকার-গ্রহণ), *আজ কাল পরশুর প্রান্তে* (কলকাতা: ক্রান্তিক প্রকাশনী, ২০০০)
৩। জীবেন্দু রায় (সম্পা.), 'সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়', *আলোক আসর* (১৫ জুন ১৯৯২)
৪। 'স্মৃতি-বিস্মৃতি: বাংলা পেশাদারি থিয়েটার', *ঋত* (নবম বর্ষ, জুন ২০০২)
৫। *লৌকিক উদ্যান* (পঞ্চম বর্ষ প্রথম সংখ্যা, জানুয়ারি–মার্চ ১৯৯৬)
৬। 'মুখোমুখি: সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় এবং বিভাস চক্রবর্তী', *আজকাল* (?)
৭। কুমার রায়, 'শরৎশশীর দর্পণে', *দেশ* (২৪ এপ্রিল ১৯৯৩)

আমার সৌমিত্র-দর্শন

সিদ্ধার্থ চক্রবর্ত্তী

আমার প্রথম সৌমিত্র-দর্শন সিনেমার পর্দায় *সোনার কেল্লা* দেখার সময়ে; বাবা-মায়ের সঙ্গে স্থানীয় সিনেমা হল নেত্র-র ব্যালকনিতে বসে 'officially' তাঁকে প্রথম দেখি। Officially এই কারণে বলছি যে, আমার ছেলেবেলার সেই প্রথম হলে গিয়ে সিনেমা দেখার স্মৃতিতে মুকুলের রাত জেগে ছবি আঁকা ও ছবির শেষে ময়ূর ছাড়া আর কিছুই আমার মনে নেই, কারণ বাকি সময়টা আমি বাবা-মায়ের কোলে আপনমনে খেলে ও ঘুমিয়ে কাটিয়েছি। তারপর বয়স বাড়ার সঙ্গেসঙ্গে অন্য বাড়ির টেলিভিশনের পর্দায় বিভিন্ন রবিবারের সন্ধেবেলাগুলো উত্তম—সৌমিত্র-র নানান ছবি দেখতে দেখতে বড়ো হয়েছি। তবে এই সময়ে মা-মাসি ও বন্ধুদের আড্ডায় যে-শিবির ছিল উত্তমকুমার ও সৌমিত্র-র, তাতে আমি সবসময়ই ছিলাম উত্তমকুমারের দলে (যদিও আমার উত্তম-দর্শন সঠিকভাবে শুরু হয়েছিল ১৯৮০-র ২৪ জুলাই তারিখে তাঁর মৃত্যুর পর থেকে)। সেই বয়সের আমি প্রেমিক হিসেবে নিজেকে কল্পনা করলে সেই প্রেমিকের আচার-আচরণ কেমন হওয়া উচিত এই বিষয়ে খুব স্বাভাবিকভাবেই 'গুরু' হিসেবে উত্তমকুমারকেই বেছে নিয়েছিলাম।

যদিও এরই মধ্যে টেলিভিশনের পর্দায় (কেন-না আমাদের ছেলেবেলায় ঠাকুরদেবতার বা নেহাতই বাচ্চাদের সিনেমা ছাড়া হলে গিয়ে সিনেমা দেখার সুযোগ সেভাবে মিলত না, আর এই 'ছেলেবেলা'-টা প্রায় উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা দেওয়া অবধি চালু ছিল) দেখে ফেলেছি *অপুর সংসার* (১৯৫৯)[২২], *দেবী* (১৯৬০), *ঝিন্দের বন্দী* (১৯৬১), *অভিযান* (১৯৬২), *সাত পাকে বাঁধা* (১৯৬৩), *চারুলতা* (১৯৬৪), *বাক্স বদল* (১৯৬৫), *আকাশ কুসুম* (১৯৬৫), *তিন ভুবনের পারে* (১৯৬৯), *অরণ্যের দিনরাত্রি* (১৯৬৯), *প্রথম কদম ফুল* (১৯৭০), *স্ত্রী* (১৯৭২), *বসন্ত বিলাপ* (১৯৭৩), *অশনি সংকেত* (১৯৭৩), *গণদেবতা* (১৯৭৯), প্রভৃতি সিনেমা। আর *সোনার কেল্লা* (১৯৭৪) ও *জয় বাবা ফেলুনাথ* (১৯৭৮) তো আছেই। আর রয়েছে *হীরক রাজার দেশে* (১৯৮০); এই ছবিটা আমি সেই সময়েই বাবা-মায়ের সঙ্গে সিনেমা হলে গিয়ে দেখেছিলাম। ফলে মনে-মনে এই মানুষটার প্রতিও তৈরি হয়েছে এক শ্রদ্ধামিশ্রিত ভালোবাসা। আর স্কুলের উঁচু ক্লাসে ওঠার সুযোগ নিয়ে "বন্ধুর বাড়ি পড়তে যাচ্ছি।" বলে মায়ের শাসন এড়িয়ে শুরু হয়েছে পালিয়ে সিনেমা ও থিয়েটার দেখা। এইভাবেই সিনেমা হাউসে গিয়ে দেখেছিলাম *অমরগীতি* (১৯৮৪), *ঘরে-বাইরে* (১৯৮৪), *কোনি* (১৯৮৬) ও *আতঙ্ক* (১৯৮৬)। আর আমার মুগ্ধতার মাত্রাও ক্রমশ বাড়তে শুরু করল এই অসাধারণ-প্রতিভাশালী অভিনেতার প্রতি।

এই সময়েই একদিন পাড়ার এক জেঠুর (সম্প্রতি তিনি প্রয়াত) হাত ধরে বিশ্বরূপা থিয়েটারে গিয়ে দেখলাম *ফেরা* (১৯৮৭) নাটকটি। চোখের সামনে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় ও মাধবী মুখার্জীর অনবদ্য অভিনয় প্রত্যক্ষ করা—সে এক অসাধারণ অভিজ্ঞতা। এর আগেও কিছু পেশাদার থিয়েটার দেখার অভিজ্ঞতা আমার ছিল, কিন্তু সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের রূপান্তরে ও নির্দেশনায় *ফেরা* নাটকটি হয়ে উঠেছিল সেই সময়ের বাংলা থিয়েটারের এক উল্লেখযোগ্য মাইলস্টোন। এই নাটকটি তিনি লিখেছিলেন সুইস নাটককার ফ্রিডরিশ ড্যুরেনমাট (Friedrich Dürrenmatt, 1921–1990)-এর ১৯৫৬ সালে জার্মান ভাষায় লেখা *Der Besuch der alten Dame*-এর ইংরেজি অনুবাদ *The Visit* অবলম্বনে। সেই প্রথম বার আমি সামনে থেকে তাঁকে দেখলাম। পরে বহুবার তাঁকে কাছ থেকে দেখলেও প্রথম বারের সেই স্মৃতি আজও উজ্জ্বল হয়ে আছে আমার মনে।

সম্ভবত এর পরের বছরেই (১৯৮৮ সালে) রঙমহলে দেখলাম সৌমিত্র-র জীবনের শ্রেষ্ঠ কীর্তি *নীলকণ্ঠ* নাটকটি। পরে আরও বারকয়েক এ-নাটকটি আমি দেখেছি শুধুমাত্র অভিনেতা সৌমিত্রকে খুব কাছ থেকে খুঁটিয়ে দেখব বলে। রুশ নাটককার ও ঔপন্যাসিক ইভান তুর্গেনেভ (Ivan Sergeevich Turgenev, 1818–1883)-এর একটি একাঙ্ক নাটক *A Poor Gentleman* অবলম্বনে এই *নীলকণ্ঠ* নাটকটি নির্মাণ করেছিলেন সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়। প্রত্যেক নাট্যশিক্ষার্থীর অবশ্যই করে এ-নাটকে সৌমিত্রকৃত নীলকণ্ঠ চরিত্রটির অভিনয় লক্ষ করে দেখা উচিত। বিশেষ করে যেখানে নীলকণ্ঠ চরিত্রটি মদের প্রভাবে ক্রমশ মাতাল হয়ে কীভাবে নিজের জীবনের গূঢ় ঘটনার কথাও প্রকাশ করে ফেলতে বাধ্য হয় অপমানের জ্বালায়, সে-দৃশ্যটি তো অভূতপূর্ব! অভিনয়ের কোন্ চরম উচ্চতায় যে এই দৃশ্যটি পৌঁছোয়, সে কেবলমাত্র রসিক দর্শকেরাই জানেন।

তারপর স্টার থিয়েটারে ১৯৯০–৯১ সাল নাগাদ দেখলাম *ঘটক বিদায়* নাটকটি। মঞ্চে সৌমিত্র, রবি ঘোষ, তরুণকুমার, মাধবী মুখার্জী, শ্রীলা মজুমদার; সে এক অনবদ্য কমেডি নাটক। মার্কিন নাটককার থর্নটন ওয়াইল্ডার (Thornton Niven Wilder, 1897–1975)-এর ১৯৫৪ সালে লেখা *The Matchmaker* নাটকের রূপান্তর ছিল এই নাটকটি, যদিও থর্নটনের নাটকটিও ছিল অন্য-একটি নাটকের রূপান্তর।

সময়ের সঙ্গেসঙ্গে এরই মধ্যে তাঁর অনেকগুলি চলচ্চিত্রাভিনয়ও আমি দেখে ফেলেছি। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্যগুলি হল—*গণশত্রু* (১৯৮৯), *একটি জীবন* (১৯৯০), *শাখা-প্রশাখা* (১৯৯০), *মহাপৃথিবী* (১৯৯১), *অন্তর্ধান* (১৯৯২), *উত্তরণ* (১৯৯৪), *হুইলচেয়ার* (১৯৯৪), *আত্মীয়স্বজন* (১৯৯৯), *অসুখ* (১৯৯৯), *পারমিতার একদিন* (২০০০), প্রভৃতি। পেশাদার অভিনেতা হিসেবে বহু ছবিতে অভিনয় করতে তিনি বাধ্য হন; তা সত্ত্বেও যেখানেই

একটু বাস্তবসম্মত অভিনয়ের উপযোগী চরিত্র তাঁর হাতে আসে, সেসব ছবিতে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের অভিনয় একেবারে অমোঘ বাণের মতন দর্শকদের বুকে এসে লাগে। তাই আজ তাঁর অভিনয়জীবনের পাঁচটি দশক অতিক্রম করেও তিনি এখনও বাঙালির মনের মণিকোঠায় উজ্জ্বল হয়ে রয়েছেন।

আবার ফিরে আসি আমার কথায়, মানে একজন অতিসাধারণ দর্শকের কথায় যার জীবনটাই রেড়ে উঠেছে শরীরে-মনে-বোধে সৌমিত্র-র বিভিন্ন চলচ্চিত্রাভিনয় ও মঞ্চাভিনয় দেখতে দেখতে। সাল-তারিখের হিসেব আর মনে নেই, তবে সম্ভবত ১৯৯৫ সাল নাগাদ রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে নাটক নিয়ে এম.এ. পাস করবার পর একদিন অত্যুৎসাহী এক বন্ধুর আগ্রহে ও উপরোধে তারই সঙ্গে বিনা appointment-এ পৌঁছে গিয়েছিলাম তাঁর বাড়িতে, তাঁর নির্দেশনায় কোনো নাটকে অভিনয় করবার বাসনা নিয়ে। আর কী আশ্চর্য! তিনি একটুও বিরক্ত না-হয়ে বাড়ির বাইরে এসে যথেষ্ট ধৈর্যের সঙ্গে আমাদের ইচ্ছের কথা শুনে আমাদের যথেষ্ট বিনয়ের সঙ্গে জানালেন, যে-নাটকটি করবার জন্য অনেকগুলি অভিনেতা-অভিনেত্রীর প্রয়োজন ছিল সেটি আপাতত তাঁর পক্ষে করা সম্ভব হচ্ছে না। তবে তিনি আমাদের এও জানালেন যে, ওই নাটকটি করবার জন্য সত্যিই অনেকগুলি ছেলেমেয়ের প্রয়োজন, তাই তিনি যখন ওই প্রযোজনাটি করবেন, আমরা যেন তখন ওঁর সঙ্গে যোগাযোগ করি। সেজন্য ওঁর সঙ্গে যোগাযোগ রাখতেও উনি জানালেন; কিন্তু বিভিন্ন কারণে এবং নিজেদের আলস্যে সে-যোগাযোগ আর আমাদের পক্ষেই রাখা সম্ভব হয়নি। আসলে বিভিন্ন মাধ্যমে তাঁর শিল্পনৈপুণ্য ও অভিনয়পারংগমতা দেখবার পর নিজেদের অভিনয়কে তাঁর পাশে এত হাস্যকর ও অকিঞ্চিৎকর বলে মনে হয়েছে যে, তাঁর সামনে গিয়ে দাঁড়াবার যোগ্যতা-অর্জনের চেষ্টাতেই সময়টা বয়ে গেছে।

১৯৯৭ সালের জুন মাসে দেখি গিরিশচন্দ্র-র *বিল্বমঙ্গল ঠাকুর* নাটকটি। নির্দেশনায় ও নামভূমিকায় ছিলেন সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়। সঙ্গে ছিলেন লাবনী সরকার, চিত্রা সেন, দ্বিজেন বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রমুখ শিল্পী। রঙ্গনা থিয়েটারে বাংলা থিয়েটারের দুশো বছর-পূর্তির অনুষ্ঠানে দেখেছিলাম এই প্রযোজনাটি। ওঁর *বিল্বমঙ্গল ঠাকুর* নাটকের পাঠ এর আগে ও পরে একাধিকবার শুনলেও এই প্রযোজনাটি মনে দাগ কেটে গিয়েছিল প্রত্যেক শিল্পীর অসাধারণ অভিনয়নৈপুণ্যের জন্য।

টিকটিকি নাটকটি তিনি রূপান্তর করেছিলেন বিখ্যাত ইংরেজ নাটককার স্যার পিটার শ্যাফার (Sir Peter Levin Shaffer, b.1926)-এর যমজ ভাই অ্যান্টনি শ্যাফার (Anthony Joshua Shaffer, 1926–2001)-এর ১৯৭০ সালে প্রকাশিত বিখ্যাত নাটক *Sleuth* থেকে। উৎপল দত্ত-র আগ্রহে ও অনুরোধেই সৌমিত্র প্রথম এই নাটকটি

পড়েন এবং adaptation-এর কাজ শুরু করেন। কথা ছিল, উৎপল দত্ত-র নির্দেশনায় উৎপল ও সৌমিত্র এই রূপান্তরিত নাটকটির দুটো চরিত্রে অভিনয় করবেন। তার কারণ এর আগে অভিনেতৃ সংঘের সম্পাদক সৌমিত্র অতিথিপরিচালক হিসেবে উৎপল দত্তকে নিয়ে এসে উৎপল দত্ত-র *এপিক থিয়েটার* পত্রিকায় ১৯৬৭–৬৮ সালে প্রকাশিত এবং ১৯৫৮ সালে কিউবার কমিউনিস্টদের রক্তক্ষয়ী লড়াইয়ের কাহিনি নিয়ে রচিত *ক্রুশবিদ্ধ কুবা* নাটকটি অভিনেতৃ সংঘ ১৯৭৩-এর ১০ ডিসেম্বর রবীন্দ্রসদনে প্রথম মঞ্চস্থ করে। এই নাটকে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, অপর্ণা সেন, দিলীপ রায়, কালী বন্দ্যোপাধ্যায়, শৈলেন মুখোপাধ্যায়, অলকা গাঙ্গুলী, প্রমুখ অভিনেতা-অভিনেত্রী অংশ নিয়েছিলেন। কিন্তু এতজন ব্যস্ত ও বিখ্যাত শিল্পীকে নিয়ে নিয়মিত মহলা দেওয়া অসুবিধাজনক হওয়ায় সৌমিত্র কম চরিত্রের নাটক অভিনয় করবার জন্য খুঁজছিলেন, যাতে নিয়মিত মহলা দেওয়ায় কোনো অসুবিধে না-হয়। সেই সময়েই কথা প্রসঙ্গে উৎপল দত্ত অ্যান্টনি শ্যাফারের এই নাটকটির কথা উল্লেখ করেন। সৌমিত্র খুবই যত্নে ও পরিশ্রমে এটিকে *টিকটিকি* নামে রূপান্তরিত করেন। তারপর নানা অসুবিধের জন্য উৎপল দত্ত বা উত্তমকুমার কারও পক্ষেই এই নাটকটি সৌমিত্র-র সঙ্গে মঞ্চে করা না-হয়ে ওঠায় দীর্ঘদিন এটি সৌমিত্র-র কাছে অব্যবহৃত অবস্থায় পড়ে ছিল। শেষপর্যন্ত স্বপ্নসন্ধানী নাট্যগোষ্ঠীর প্রযোজনায় সৌমিত্র তাঁর এই বহু-আকাঙ্খিত নাটকটি মঞ্চস্থ করেন ১৯৯৫-এর ২৯ মে, অ্যাকাডেমি প্রেক্ষাগৃহে। নির্দেশনায় এবং নাটকটির বয়স্ক চরিত্র সত্যসিন্ধু-র ভূমিকায় সৌমিত্র-র অভিনয় দর্শকদের মন্ত্রমুগ্ধ করে রেখেছিল। কৌশিক সেনও অল্পবয়সি বিমল চরিত্রটি সৌমিত্র-র নেতৃত্বে ও অনুপ্রেরণায় যথেষ্ট যোগ্যতার সঙ্গেই মঞ্চে উপস্থিত করেছিলেন।

এই নাটকটি মঞ্চে এবং পরে টেলিভিশনে (সম্ভবত টেলিফিল্ম হিসেবে) বেশ কয়েকবার দেখবার সৌভাগ্য আমার হয়েছে। মনে আছে, প্রথম বার যখন এই প্রযোজনাটি দেখি তখন টানটান এক উত্তেজনায় এবং প্রায় থ্রিলার দেখার উন্মাদনায় নাটকটি দেখেছিলাম। আমাদের অর্থনৈতিকভাবে দীন বাংলা থিয়েটারে যে সেই সময়ে এরকম একটা প্রযোজনা করা সম্ভব, সেটা ভেবে আশ্চর্য বোধ করেছিলাম। যেমন অসাধারণ এর মঞ্চভাবনা, তেমনি অতুলনীয় এর সমগ্র প্রযোজনা। Music, light, acting—সব মিলিয়ে অপূর্ব। দেখে মনে হয়েছিল, সত্যিই যদি মঞ্চে এটিকে আমরা উৎপল–সৌমিত্র যুগলবন্দি হিসেবে পেতাম কিংবা চলচ্চিত্রে উত্তমকুমার ও সৌমিত্র যদি এটি করতে পারতেন, যেমন করেছিলেন *Sleuth*-এর ১৯৭৩-এ নির্মিত চিত্ররূপে বিখ্যাত ব্রিটিশ অভিনেতা লরেন্স অলিভিয়ের (Laurence Olivier) ও মাইকেল কেইন (Michael Caine)! তারপর মনে হয়েছিল, এই বাংলায় যেখানে প্রযোজকেরা নেহাতই "কোনো মেয়ে নেই!" বলে এর চিত্ররূপে টাকা

ঢালার কোনো প্রয়োজন বোধ করেন না সেই সময়ে উত্তম ও সৌমিত্র-র মতন দু-দুজন বিখ্যাত 'স্টার' আগ্রহী থাকলেও, সেই পোড়া দেশে তবু তো এরকম একটা প্রযোজনা আমরা দেখতে পেলাম সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের অদম্য পরিশ্রমী মানসিকতায়! তাই একজন বাঙালি দর্শক হিসেবে তাঁকে আমাদের কৃতজ্ঞতা জানাই।

এরপর দেখি *প্রাণতপস্যা* নাটকটি। সম্ভবত এটি প্রথম দেখি ১৯৯৯ সালে; পরে অবশ্য আরও কয়েকবার এই নাটকটি দেখেছিলাম। ব্রিটিশ নাটককার সাইমন গ্রে (Simon James Holliday Gray, 1936–2008)-এর ১৯৯৭ সালে প্রকাশিত *Life Support* নাটকটি সৌমিত্র রূপান্তর করেন *প্রাণতপস্যা* নামে। বিদেশি নাটকের সফল রূপান্তরে অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরই যদি কারও নাম করতে হয়, তিনি সৌমিত্র। কী অসাধারণ নৈপুণ্যে যে তিনি এই বঙ্গীকরণের কাজ করেন তা বোঝা যায় কেবল মূল নাটকটির সঙ্গে রূপান্তরিত পাঠটি মিলিয়ে পড়লে। এ-নাটকের মঞ্চভাবনাটিও ছিল অভিনব: যেন মঞ্চের উপর একটা নার্সিং হোমের আস্ত ঘরই উঠে এসেছিল! এই নাটকে এক ডাক্তারের চরিত্রে দ্বিজেন বন্দ্যোপাধ্যায়ের অসাধারণ অভিনয় বহুকাল দর্শকদের মনে গেঁথে থাকবে। আর লেখক অলকেন্দু-র ভূমিকায় সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় ছিলেন সত্যিই অনবদ্য। অভিনয় না-করে কীভাবে অভিনয় করা যায় এ-ব্যাপারে তিনি হলেন একজন master। এত সহজে, এত স্বাভাবিকতায়, এত সাবলীলতায় কীভাবে তিনি কী মঞ্চে, কী চলচ্চিত্রে এক-একটি চরিত্রে নিজেকে মেলে ধরেন তা বর্ণনা করার সাধ্য আমার নেই, শুধু মুগ্ধতাটুকুই সবার সঙ্গে share করে নিতে পারি!

২০০৫—০৬ সাল নাগাদ দেখলাম *আরোহণ* নাটকটি। মার্কিন নাটককার লিলিয়ান হেলম্যান (Lillian Hellman, 1905–1984)-এর ১৯৩৯ সালে লেখা *The Little Foxes* অবলম্বনে এটি রচনা করেন সৌমিত্র। *আরোহণ* নাটকটি ১৯৯৪ সালেই আজকাল থেকে প্রকাশিত হয়। মুখোমুখি-প্রযোজিত এই নাটকে সৌমিত্র ছাড়াও ছিলেন দ্বিজেন বন্দ্যোপাধ্যায়, বিশ্বজিৎ চক্রবর্তী, খেয়ালী দস্তিদার, পৌলমী বোস, প্রমুখ। এ-নাটকেও অভিনেতা সৌমিত্র দর্শকদের মুগ্ধ করেন তাঁর মাপা আত্মস্থ অভিনয় দিয়ে। শোনা যায়, শরৎ চন্দ্র-র *ষোড়শী* নাটকে জীবানন্দ-র ভূমিকায় শিশিরকুমার ভাদুড়ী এই চরিত্রের অত্যধিক মদ্যপানহেতু পেটের 'কলিক পেন'-কে এমনভাবে ধীরে-ধীরে বিশ্বাসযোগ্য করে ফুটিয়ে তুলতেন যে, যখন বিষয়টি চূড়ান্ত জায়গায় পৌঁছোতো তখন দর্শকেরা প্রায়শই ভাবতে বাধ্য হতেন যে, অভিনেতার নিশ্চয়ই সত্যিসত্যিই এ-বেদনা অনুভূত হচ্ছে! ঠিক এইরকমই একটি ঘটনা এই *আরোহণ* নাটকটিতে ঘটিয়েছিলেন সৌমিত্রবাবু। তিনি অনায়াসদক্ষতায় চরিত্রের বুকের যন্ত্রণাকে এমনভাবে মঞ্চে রূপায়িত করেন যে, দর্শকেরা রীতিমতো অস্বস্তি

বোধ করতে বাধ্য হন সৌমিত্রবাবুর শরীরের কথা ভেবে। এতটাই বিশ্বাসযোগ্য করে তুলতেন তিনি এই দৃশ্যটিকে!

২০০৭-এ দেখলাম সিনেটেল-প্রযোজিত *হোমাপাখি*। ডা. অমিতরঞ্জন বিশ্বাসের অসাধারণ অনুভবী নাটক মঞ্চস্থ হল সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের দুরন্ত নির্দেশনায়। অভিনয়ে সৌমিত্র ছাড়াও ছিলেন পৌলমী বোস, অলকনন্দা রায়, প্রমুখ। এ-নাটকে অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক নিরঞ্জনের ভুমিকায় সৌমিত্র ও একইসঙ্গে ওঁর ছাত্রী সাইকিয়াট্রিস্ট শ্রাবণীর ভূমিকায় পৌলমী বোস—দুজনেই অনবদ্য। এ-নাটকে মঞ্চে সৌমিত্রকে দেখা এক অন্য অভিজ্ঞতা। পরে এটাও টেলিফিল্‌মে দেখেছি; কিন্তু সেটা ততটা ভালো লাগেনি, কারণ এটা ছিল সম্পূর্ণ মঞ্চের নাটক। আর অধ্যাপকের স্ত্রী অদিতি-র ভূমিকায় অলকনন্দা রায়ও ছিলেন অপূর্ব। এই নাটক দেখে জীবনদর্শনটা যেন একটু বদলে গেল; যে-কোনো অনুভবী মানুষই এ-নাটক দেখবার পর তার আগের mental state-এ আর থাকতে পারবে না, তার মানসিকতা অল্পবিস্তর বদলে যেতে বাধ্য। এতটাই শক্তিশালী ছিল এ-নাটকের প্রযোজনা!

২০০৭ সালেই দেখলাম একাঙ্ক নাটক *কুরবানি*। রবীন্দ্রসদনে তাঁরই কোনো সংবর্ধনা-অনুষ্ঠানের পর মঞ্চস্থ হয় এই নাটকটি। মাইকেল ডাইন্‌স (Michael Dines)-এর *Report from Contreros* অবলম্বনে রচিত এই নাটকটি। সৎ ও বুদ্ধিমান পুলিশ অফিসার সুবিনয় মুস্তাফির চরিত্রে সৌমিত্র এবং ডেপুটি কালেক্টর কাস্টম্‌স প্রমোদ সান্যালের ভূমিকায় দ্বিজেন বন্দ্যোপাধ্যায়—অসাধারণ যুগলবন্দি দুই অভিনেতার। সত্যিই খুবই উপভোগ করেছিলাম সে-প্রযোজনাটি।

২০০৮-এ তপন থিয়েটারে দেখলাম *আত্মকথা*। এটি বিখ্যাত মারাঠি নাটককার মহেশ এলকুঞ্চবার (Mahesh Elkunchwar, b.1939)-এর মূল মারাঠি নাটক *আত্মকথা*-র ইংরেজি রূপ *Autobioghaphy*-র সৌমিত্রকৃত বঙ্গীকরণ। অভিনয়ে ছিলেন সৌমিত্র, লিলি চক্রবর্ত্তী, পৌলমী বোস, দামিনী মুখোপাধ্যায় (এখন অবশ্য এই চরিত্রে অভিনয় করছেন আমার অত্যধিক পছন্দের শিল্পী সেঁজুতি মুখোপাধ্যায়)। এ-নাটকে ৭৮-বছর-বয়সি একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠিত সাহিত্যিক শুভঙ্করের ভূমিকায় সৌমিত্র-র অভিনয় যেন এক আবিষ্কার। স্বাভাবিক অভিনয় কীভাবে করা উচিত তার উজ্জ্বল উদাহরণ সৌমিত্র-র এই অসামান্য অভিনয়ের মধ্যে ছড়িয়ে আছে। সৌমিত্র-র অভিনয় মন দিয়ে দেখা মানে অভিনয়সংক্রান্ত দশটা অত্যধিক মূল্যবান বই পড়ে-ফেলা।

আর এই বছরেই, অর্থাৎ ২০১০-এ, দেখলাম *তৃতীয় অঙ্ক*, অতএব। এ-নাটকের নাট্যভাবনাটি সাইমন গ্রে-র আত্মজীবনীমূলক নাটক *The Last Cigarette* থেকে নেওয়া হলেও মঞ্চে আমরা দেখি, সৌমিত্র তাঁর নিজের জীবনকেই অকপটভাবে মেলে ধরেছেন

দর্শকদের কাছে এ-নাটকের মধ্যে দিয়ে। মঞ্চে তিনজন—সৌমিত্র, দ্বিজেন ও পৌলমী। তিনজনই বিভিন্ন সময়ে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় হয়ে অভিনয় করেন। তবে সবচেয়ে বড়ো কথা হল এ-নাটকের বিষয়। এত জীবন্ত, এত মর্মস্পর্শী এই নাটকের বিষয় যে, অন্য সবকিছু কখন যে হারিয়ে যায়, খেয়ালই থাকে না। এ-নাটক শেষ হওয়ার পর বেশ কিছুক্ষণ আমি কোনো কথা বলার মতন অবস্থায় ছিলাম না। এক গভীর বিষাদ ও বেদনাবোধে আচ্ছন্ন হয়ে ছিলাম অনেকক্ষণ। অনেক পরে ব্যক্তিগত আলাপচারিতায় দ্বিজেন বন্দ্যোপাধ্যায়কে জানিয়েছিলাম আমার অনুভবের কথাগুলি।

শিশিরকুমার ভাদুড়ীর কথা বইয়ে পড়েছি। বড়ো-বড়ো দিক্পাল আরও অনেক অভিনেতার কাজই দেরিতে জন্মানোয় আমার দেখা হয়নি। তবু আমার সৌভাগ্য, শিশিরবাবুর সার্থক উত্তরসূরি সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের চলচ্চিত্র ও মঞ্চের অনেক অভিনয়ই আমি দেখেছি। তাঁর সেইসব অভিনয়ের স্মৃতি সমস্ত শিল্পরসিক বাঙালির মতন আমারও মনের মণিকোঠায় স্থায়ী সম্পদ হিসেবে রয়ে যাবে আজীবন।

রাজকুমারের গল্প

অতনু বর্মন

প্রথম আলোর ঝলকানি

সেদিনের দৃশ্যটি আজও হুবহু দেখতে পাই। স্টার থিয়েটারে একটি কর্পোরেট সংস্থার বার্ষিক অনুষ্ঠান। আমন্ত্রিত শিল্পী তিনজন—আমি, শ্রাবণী সেন ও সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়। গ্রিন রুমে বসে আছি। কর্মকর্তাদের একজন এসে সৌমিত্রবাবুকে বললেন, "একটি ছেলে আপনার সঙ্গে ছবি তুলতে চায়। তাকে কি ডাকব?" উনি বললেন, "ডাকো।" ছেলেটি এল; সঙ্গে ফোটোগ্রাফার। ছবি তোলার সময়ে ছেলেটি ওঁর কাঁধে হাত রাখল! উনি ছেলেটির হাত কাঁধ থেকে নামিয়ে দিলেন। ছবি তোলা হয়ে গেল। সৌমিত্রবাবু মঞ্চে উঠলেন। শ্রাবণী বললেন, "বলুন অতনুদা, কী সাহস!" আমি বললাম, "সাহস নয়, বলুন দুঃসাহস।"

আজ এই যে লেখাটি লিখতে বসেছি সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের থিয়েটার সম্পর্কে, খালি মনে হচ্ছে কেউ একজন বলছে, "কী সাহস!" আর অন্য-কেউ বলছে, "সাহস নয়, বলুন দুঃসাহস।"

এবং রবীন্দ্রনাথ

সৌমিত্রবাবুর হাতের লেখাটি 'তৎসম', অর্থাৎ তাঁর মতো। তিনি অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথ। *চারুলতা*-র অমল দীর্ঘদিন মকশো করে সেটি রপ্ত করেছিলেন—এ কথা সকলেরই জানা; কিন্তু আমি শুরু করতে চাই দুই-পুরুষ-পূর্ববর্তী মকশো করার কাল থেকে। পূর্ববঙ্গের শিলাইদহ-র নিকটেই কয়া গ্রাম। জমিদার দেবেন্দ্রনাথের এস্টেটের উকিলবাবু ললিতকুমার চট্টোপাধ্যায় ছিলেন সৌমিত্রবাবুর পিতামহ। পিতা মোহিতকুমার ছিলেন অসহযোগ-আন্দোলনে-জেল-খাটা বিপ্লবী। কয়া থেকে মোহিতকুমার এলেন কৃষ্ণনগরে। সৌমিত্রবাবু সেই সূত্রেই কৃষ্ণনাগরিক। বালক সৌমিত্র কৃষ্ণনগরের পারিবারিক নাট্যকৃতিতে অংশ নিল। নাটক: রবীন্দ্রনাথের মুকুট।

দুয়ার খোলার ধ্বনি

মুকুটে পালকের সেই শুরু। এরপর স্কুলের থিয়েটার। বাংলা থেকে ইংরেজি— *The Sleeping Princess*। ঘুমন্ত রাজকুমারীকে সোনার কাঠির ছোঁয়ায় জাগিয়ে তুলবেন যে—রাজার কুমার, তিনি তখন সবে ক্লাস ফাইভের বালক। মোহিতকুমারের বদলির চাকরির সূত্রেই কৃষ্ণনগর থেকে হাওড়ায়। মহানগরের উপকণ্ঠে! হাওড়া জেলা স্কুল। নবম শ্রেণির ছাত্র সেই রাজকুমার এবার *মহারাজ নন্দকুমার* নাটকের ক্লেভারিং চরিত্রে। ভবিষ্যতে যাঁকে *রাজকুমার* নাটকের

স্রষ্টা হিসাবে পাবে বাংলা থিয়েটার, সেই সৌমিত্র-র পথচলা তখনও অনেক বাকি।

উড়িয়ে ধ্বজা অভ্রভেদী রথে

যে সন্ধ্যায় দান প্রতিদানগুলো
মিলিয়ে দেখার সময় আসে
লোকটা দেখতে পায়
কতবার প্রান্তর পাহাড় ঝরনা এসে
তার অঞ্জলি ভ'রে দিয়েছে

—সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়

('দান প্রতিদান' কবিতার অংশবিশেষ)

আমাদের রাজকুমারের জীবনের টার্নিং পয়েন্ট শিশির ভাদুড়ীর অভিনয় দেখে অভিনয়কেই একমাত্র কাজ হিসাবে গ্রহণ করার সিদ্ধান্তগ্রহণ। খ্যাতনামা অভিনেত্রী শেফালিকা বা 'পুতুল'-এর সৌজন্যে শ্রীরঙ্গমে এসে দাঁড়ালেন সৌমিত্র। শ্রীরঙ্গমে শিশিরকুমারের সেটাই ছিল শেষ বছর। সেই বিরাট মানুষের সান্নিধ্য সৌমিত্র-র জীবনে—বলা ভালো, অভিনয়জীবনে—একটি যুগান্তকারী ঘটনা। শ্রীরঙ্গমের সঙ্গে সম্পর্ক ঘুচিয়ে শিশিরকুমার তখন ভ্রাম্যমাণ। মার্কাস স্কোয়ারে বঙ্গসংস্কৃতি সম্মেলনে শিশিরকুমারের *প্রফুল্ল* নাটক। সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় সুরেশের ভূমিকায়। বাংলা থিয়েটারে গিরিশ–রবীন্দ্রনাথ–শিশিরকুমার—এই ত্রিবেণি সংগমের কেন্দ্রবিন্দুতে দাঁড়িয়ে এখন আমাদের রাজকুমার। পেশাদার রঙ্গমঞ্চে আত্মপ্রকাশের ঠিক পূর্ববর্তী সময়ে দাঁড়িয়ে আমাদের কাহিনিও। বস্তুত সৌমিত্র-র বহুমুখী কর্মকাণ্ডের উৎস যে থিয়েটার এবং সেখানে মূল চালিকাশক্তির নাম যে শিশির ভাদুড়ী মশাই স্বয়ং, তা অনস্বীকার্য। গুরুর মূল্যায়ন করতে গিয়ে পরবর্তীকালে সৌমিত্র স্বয়ং বলবেন, "ভাবতে শেখানো—এইটেই শিশিরকুমারের শিক্ষার সবচেয়ে বড়ো জিনিস। অভিনেতাকে ভাবতে প্ররোচনা দিতেন—ভাবাতেন—দুটো লাইন হয়তো বলতে গিয়ে তার সঙ্গে এত সুন্দর একটা subtext তৈরি করতেন—emotional graph-টা চোখের সামনে এনে দিতেন যে, আমাদের কল্পনা উজ্জীবিত হয়ে গেল—মানে যে শিখছে তার। সেও তখন ভাবতে আরম্ভ করল ওঁর মতো করে। এইটেই ওঁর সবচেয়ে বড়ো শিক্ষা।"

বুকের মাঝে বিশ্বলোকের

প্রফুল্ল নাটকের প্রযোজনাই ছিল শিশিরকুমারের শ্রীরঙ্গম-পর্বের সমাপ্তিকাল। *প্রফুল্ল*-র শেষ অভিনয় ২৪ জানুয়ারি ১৯৫৬। শিশিরকুমার, বাংলা রঙ্গমঞ্চে নবযুগের প্রবর্তক—উৎপল দত্ত যাঁর সম্পর্কে পরে লিখবেন 'শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ ভারতীয় অভিনেতা', তিনি—ঋণগ্রস্ত! দেনার দায়ে শ্রীরঙ্গম থেকে উৎখাত হওয়া নাট্যাচার্য-র অভিমানাহত শেষজীবন বড়ো

বেদনার অথচ আপসহীন দৃপ্ত দৃষ্টান্তের অধ্যায়। একের-পর-এক প্রত্যাখ্যান করে চলেছেন প্রাতিষ্ঠানিক আনুকূল্য। পশ্চিমবঙ্গের তৎকালীন সংগীত নাটক আকাদেমির নাট্যবিভাগের দায়িত্ব দিতে চাইলেন ডা. বিধান রায়; *মহানগর* ছবিতে অভিনয়ের প্রস্তাব দিলেন সত্যজিৎ রায়। কিন্তু সেই স্বক্ষেত্রে স্বরাট মঞ্চাভিনেতা গ্রহণ করলেন না কিছুই! ভারত সরকার–প্রদত্ত পদ্মভূষণও প্রত্যাখ্যান করে স্বয়ং সমাপ্তি ঘটালেন একটি যুগের—যার নাম 'শিশির যুগ'। আমাদের সৌমিত্র সেই যুগসন্ধির বৈতালিক।

শিশির যুগের ঐতিহ্য ও নবযুগের চেতনার মধ্যে সেতুবাঁধার কারিগর হিসাবে সৌমিত্রবাবুকে যদি চিহ্নিত করি তবে তা নিঃসংশয়ে মেনে নিতে বাধ্য বাংলা থিয়েটার। তাঁর অবদানের কেন্দ্রবিন্দু এই জায়গাটিই, যেখানে তিনি একদিকে বাংলা পেশাদার মঞ্চের ধারাটি বজায় রেখেই ধীরে কিন্তু অনিবার্যভাবে এগিয়ে যাবেন গ্রুপ থিয়েটারের নবযুগের মোহানায়। আসুন, এই পরম্পরাটিকে বোঝার চেষ্টা করি এবার।

নব আনন্দে জাগো

বাংলা পেশাদার রঙ্গমঞ্চের যে-ঐতিহ্য, সৌমিত্রবাবুর থিয়েটারজীবনের সূচনা সেই ঐতিহ্যেরই উত্তরাধিকার। ১৯৬৩ নাগাদ স্টার থিয়েটারে *তাপসী* নাটকটির মাধ্যমেই তাঁর নতুন পথের যাত্রাশুরু। টানা ৪৬৭ রজনি অভিনয় হয়েছিল নাটকটির। আমাদের রাজকুমার এই *তাপসী* দিয়েই শুরু করলেন নতুন পথের সন্ধান। মনে রাখতে হবে, তিনি কিন্তু ইতিমধ্যেই বাংলা চলচ্চিত্রের একজন ব্যস্ততম নায়ক। জনপ্রিয়তা, স্টারডমের বাধা—এসব সত্ত্বেও মানুষটি বাংলা পেশাদার মঞ্চে নতুন একটা জোয়ার আনার চেষ্টা করে চলেছেন। সৌমিত্র এই পর্যায়ে স্বয়ং নাটক লিখছেন, নির্দেশনা দিচ্ছেন, এবং অভিনয় করছেন। এই পর্বে বাংলা পেশাদার থিয়েটার পাচ্ছে *নাম জীবন*, *রাজকুমার*, *নীলকণ্ঠ*, *ফেরা*, *চন্দনপুরের চোর*, *ঘটক বিদায়*, *ন্যায়মূর্তি*, *প্রাণতপস্যা*-র মতো নাটক। *ঘটক বিদায়* নাটকটি হত স্টার থিয়েটারে। সৌমিত্রবাবুর এই নাটকে অভিনয় করত শ্যামল সেন ও চিত্রা সেনের পুত্র কৌশিক। *ঘটক বিদায়*-এর জনপ্রিয়তায় কৌশিক চাকরি ছেড়ে অভিনয়কেই পেশা হিসাবে গ্রহণ করবে, এবং সৌমিত্রবাবুর জীবনেও—বলা ভালো, থিয়েটারজীবনেও—ঘটে যাবে পালাবদল। আসুন, আমরা সেই পর্বে এগিয়ে যাই।

স্বপ্নমদির নেশায় মেশা

অগ্রজ সৌমিত্রকে সভাপতি করে অনুজ কৌশিক ১৯৯২ সালে তৈরি করল স্বপ্নসন্ধানী। সৌমিত্র ও কৌশিক—মাত্র দুটি চরিত্রের নাটক *টিকটিকি*। আমাদের রাজকুমারেরও অভিষেক ঘটল বাংলার গ্রুপ থিয়েটারে। উল্লেখ্য যে, কৌশিকের উদ্যোগে সৌমিত্রবাবুর থিয়েটারের

একটি রেট্রোস্পেকটিভ আয়োজিত হয়েছিল, যা বাংলা গ্রুপ থিয়েটারে প্রথম কোনোএকজন অভিনেতার অভিনীত নানা নাটকের গাঁথামালা। সম্প্রতি দেবশঙ্কর হালদারের অনন্য নাট্যপ্রতিভার নয়-দিন-ব্যাপী নাট্যোৎসবের কথা মনে রেখেই বলছি, বাংলা থিয়েটারে প্রথম রেট্রোস্পেকটিভের নায়ক সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় ওরফে আমাদের কাহিনির রাজকুমার।

শেষ নাহি যে

মনে রাখতে হবে যে, স্বপ্নসন্ধানীর যে *টিকটিকি* নাটকটির মাধ্যমে সৌমিত্র পেশাদার থিয়েটার থেকে গ্রুপ থিয়েটারে এলেন সেটিও তাঁরই কলমনিঃসৃত। অ্যান্টনি শ্যাফারের *Sleuth* নাটকের ছায়ায় *টিকটিকি*-র নাট্যকার তথা নির্দেশক ছিলেন সৌমিত্রই। বাংলা গ্রুপ থিয়েটারে সংযোগের পর আর তাঁকে পায়নি বাংলা পেশাদার মঞ্চ। অন্যদিকে গ্রুপ থিয়েটারে তাঁর পদার্পণ সৃষ্টি করেছে নতুন এক অধ্যায়ের। মুখোমুখি-প্রযোজিত *আত্মকথা* ও *হোমাপাখি*-র সাফল্য অতিক্রম করে প্রাচ্য-প্রযোজিত *তৃতীয় অঙ্ক*, *অতএব*-এ আমরা আমাদের রাজকুমারকে আবিষ্কার করেছি বারবার। বাংলা থিয়েটার অধীর আগ্রহে তাকিয়ে আছে তাঁর পরবর্তী অভিনয়ের দিকে—যেখানে King Lear-এর ভূমিকায় দেখা দেবেন আমাদের রাজকুমার। সুমন মুখোপাধ্যায়ের নির্দেশনায় *রাজা লিয়ার* এখন প্রস্তুতির পথে। রাজকুমার থেকে স্বয়ং রাজার দীর্ঘ এই পথযাত্রার ধারাবিবরণী যতটা সম্ভব দেবার চেষ্টা করলাম। জানি, এখনও সেই অদৃশ্য মানুষ বলছেন—"সাহস নয়, বলুন দুঃসাহস।"

পদ্মবীজের মালা: একটি সংযোজন

আমরা আগেই বলেছি, বাংলা থিয়েটারের প্রথম রেট্রোস্পেকটিভের নায়ক সৌমিত্র। এখানে একটু প্রসঙ্গটি দীর্ঘায়িত করতে চাই। দিনটি ছিল ৩১ মে ১৯৯৫। উত্তম মঞ্চে স্বপ্নসন্ধানীর সেই স্বপ্নময় আয়োজনের নাম ছিল *পদ্মবীজের মালা*। সৌমিত্র-র নাটকগুলির প্রথম অভিনয়ের অভিনেত্রীদের সঙ্গে পুনরায় অভিনয়ের সে এক বিরল ঘটনা ঘটেছিল সেদিন উত্তম মঞ্চে। সতেরো বছর পর লিলি চক্রবর্ত্তী *নাম জীবন*-এর, বারো বছর পর সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায় *রাজকুমার*-এর অভিনয় করলেন আবার। *ফেরা* নাটকের অংশে মাধবী মুখার্জীর বদলে অভিনয় করেছিলেন দেবিকা মিত্র।

এই লেখা আসলে বাংলা চলচ্চিত্রের কিংবদন্তি-নায়ক সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের জীবনের অন্যদিকটিকে অবলোকনের প্রয়াস, যেখানে তিনি মঞ্চের অভিনেতা। এই লেখা মূলত সেই দীর্ঘ কার্যপ্রণালীর যথাসম্ভব সংকলন। এর বাইরে রয়ে গেল অসংখ্য তথ্য, যা ভবিষ্যতের গবেষক ও নাট্যকর্মীদের জন্য রইল উন্মুক্ত। আমরা অভিনেতা সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের সৃজনশীল দীর্ঘজীবন কামনা করি। প্রার্থনা করি, আমাদের রাজকুমার সম্পর্কে যেন এই

কথা বলতে পারি যে—

কবি, তুমি গদ্যের সভায় যেতে চাও?
যাও, পা যেন না টলে
কেউ যেন না বলে—
আসার কথা ছিল না, কিন্তু রাজা এসেছেন।

তথ্যসূত্র:

১। বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়, *সংসদ বাংলা নাট্য অভিধান*
২। সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে দূরভাষে কথোপকথন
৩। প্রদীপ মিত্র, *আননায়ুধ*
৪। সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, 'দান প্রতিদান', *আমার সময়* (কলকাতা: বেনেট কোলম্যান অ্যান্ড কোম্পানি লিমিটেড), বর্ষ ১ সংখ্যা ৬ (ডিসেম্বর ২০০৯), পৃ. ২৮
৫। নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

বাংলা পেশাদার মঞ্চের এক অভিমন্যু

দানী কর্মকার

মঞ্চে যে হেঁটে যায়
শত বজ্রে বিদীর্ণ হলেও
সে প্রাণের প্রতিষ্ঠা করতে যায়
নাট্যের সব কুশীলব জীবন্ত হয়ে ওঠে
মৃত্যুর অশনি সংকেত বুকে নিয়ে জীবন হেঁটে যায়।

— সৌমিত্র চট্টোপাধ্যা

১৯৫৭ সাল। মার্কাস স্কোয়ারে বঙ্গসংস্কৃতি সম্মেলনে গিরিশচন্দ্র-র *প্রফুল্ল* অভিনীত হবে পরিচালকের কাছে ২২ বছরের এক যুবক ইচ্ছা প্রকাশ করলেন সেই নাটকে অভিনয় করার। পরিচালক বললেন, "ভালো হবে—তোমাকে দিয়ে সুরেশ ভালো হবে।" ১৯৫৭ সালের ২৭ মার্চ নাটকটি মার্কাস স্কোয়ারে অভিনীত হয়। এখানে পরিচালক হলেন শিশিরকুমার। শিশিরকুমারের সান্নিধ্যে এই প্রথম অভিনয় করলেও যুবকটির অভিনয় করা শুরু সেই ছোটোবেলা থেকেই। ছোটোবেলা থেকেই থিয়েটারের প্রতি তাঁর গভীর টান ছিল। কৃষ্ণনগরে সিএমএস স্কুলে পড়ার সময়ে একটা ইংরেজি নাটকে এক রাজপুত্রের ভূমিকায় অভিনয় করেন। পরে হাওড়া জেলা স্কুলে পড়ার সময়ে শৌখিন নাট্যদল তৈরি করেছিলেন। তাতে স্কুলের ও পাড়ার বন্ধুরা মিলে নাটক করতেন। সেখানে *মহারাজ নন্দকুমার* নাটকে ক্লেভারিং নামের এক বিদেশি চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন। সিটি কলেজে পড়ার সময়ে শিশির ভাদুড়ীর সঙ্গে যোগাযোগ হয়। এর পেছনে ছিল কলেজের উঁচু ক্লাসের বন্ধু গৌরমোহন মুখোপাধ্যায়ের হাত। মূলত তাঁরই প্রচেষ্টায় কলকাতার থিয়েটারের সঙ্গে যুবকটির পরিচয় হয়। নিয়মিত শ্রীরঙ্গমে বন্ধুরা দলবেঁধে শিশিরকুমারের অভিনয় দেখতে যেতেন। এরই মাঝে কলেজে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের লেখা *রামমোহন* নাটকে রামমোহন চরিত্রে অভিনয়ের সুযোগ হয়। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ছিলেন বাংলার অধ্যাপক। তিনি বলেছিলেন, "তুমি একদিন খুব বড়ো অভিনেতা হবে। তখন আমি তোমার জীবনী লিখব।" এই যুবকই একদিন হাজির হন শিশিরকুমারের কাছে—১৯৫৬ সালের ২৪ জানুয়ারি, যেদিন শ্রীরঙ্গমে শিশিরকুমারের শেষ অভিনয় ছিল। নাটকটি ছিল গিরিশচন্দ্র-র *প্রফুল্ল*। শোয়ের পরে গ্রিন রুমে গেলেন যুবকটি। শিশিরকুমার যুবকটিকে জিজ্ঞাসা করলেন, "কী নাম তোমার?"

যুবকটি বললেন, "সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়।"

শিশিরকুমারকে সৌমিত্র পেয়েছিলেন একেবারে প্রথম যৌবনে। শিশিরকুমারের থিয়েটার তখন অস্তাচলগামী। তাঁর বয়স তখন প্রায় সত্তর। তাঁর কাছে প্রত্যক্ষভাবে অভিনয় শেখার সুযোগ হল সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের। তিনি বলেছিলেন, "তুমি বড়ো দেরিতে এলে আমার কাছে! তোমাকে কোথায় শেখাই বলো তো? ১৯৫৫-তে বি.এ. পাশ করেন বাংলা অনার্স নিয়ে। গ্র্যাজুয়েশনের পড়া শেষ করার আগেই ঠিক করে নিয়েছিলেন, অভিনয়টাকে পেশা করবেন। এর আগে শিশিরকুমারের অভিনয় চুটিয়ে দেখেছেন। এর প্রভাব সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের ওপর কতটা পড়েছিল তার প্রমাণ পাই অশোক পালিতের কথায়—"কলেজে পড়ার সময়ে ওকে শিশির ভাদুড়ীতে পেয়েছিল। বিশেষ একটা ধরন ছিল তাঁর উচ্চারণের, সংলাপ বলার। কখনও কোনো বাক্যের শেষাংশটা একটু প্রলম্বিত উচ্চারণ করতেন, বিশেষ করে আবৃত্তি করার সময়ে। পুলু পারলেই তা অনুকরণ করত। এমনকি কোনো বাংলা নাটক হাতে এলে তার কোনো-একটা চরিত্রের সংলাপ এই কায়দায় বলে যেত। আচ্ছা, এটা কি পুলুর অভিনয়ের অনুকরণ-পর্ব? না কি প্রচ্ছন্ন অনুশীলন-পর্ব?"

পঞ্চাশের দশকে কলকাতার অনেকের কাছে যখন ব্রেখ্‌ট অজানা ছিল তখন শিশিরকুমারই তাঁকে *The Exception and the Rule* নাটকটির বঙ্গানুবাদ করতে দেন (১৯৫৭)। এই প্রথম ব্রেখ্‌টের পরিচয় পেল বাংলা থিয়েটার, তাঁর *বিধি ও ব্যতিক্রম* অনুবাদের মাধ্যমে।

১৯৫৬—৫৭ সালে দিল্লিতে সর্বভারতীয় আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় যুব-উৎসবে *মুখোশ* নামে একটি একাঙ্ক নাটক অভিনীত হয়। জেকবের *The Monkey's Paw* গল্পের ছায়ায় নাটকটি লেখেন ইংরেজি বিভাগের অধ্যাপক প্রবোধচন্দ্র ঘোষ। নাটকটির পরিচালনেও ছিলেন তিনি। দিল্লিতে শ্রেষ্ঠত্বের শিরোপা পায় নাটকটি। ভ্রষ্ট এক ভবঘুরের ভূমিকায় অভিনয়ের জন্য সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় শ্রেষ্ঠ অভিনেতার সম্মান পান। কলকাতায় ফেরার পর ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট প্রেক্ষাগৃহে নাটকটি মঞ্চস্থ হয়। তখন আলোর দায়িত্বে ছিলেন তাপস সেন। সে-সময়ে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় কলেজে এম.এ. পড়ছিলেন। এর কিছুদিন পরেই সুযোগ এল চলচ্চিত্রে অভিনয় করার। সত্যজিৎ রায়ের হাত ধরে চলচ্চিত্রে এলেন। ১৯৫৮ সালে *অপুর সংসার*-এর শুটিং শুরু হল। ১৯৫৯ সালে মুক্তি পেল *অপুর সংসার*। এরপর একে

একে ১৯৬০-এ *দেবী*, ১৯৬১-তে *তিনকন্যা* আর *ঝিন্দের বন্দী*, ১৯৬২-তে *অভিযান*, ১৯৬৪-তে *চারুলতা*, ১৯৬৫-তে *কাপুরুষ ও মহাপুরুষ* আর *আকাশ কুসুম*, ইত্যাদি সিনেমায় ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। সে-সময়ে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় অন্যান্য চিত্রতারকাদের তুলনায় অধিকতর জনপ্রিয়। সেই জনপ্রিয়তাকে কাজে লাগিয়ে ব্যাবসা করতে চাইল স্টার থিয়েটার। ১৯৬৩ সালে স্টারের প্রযোজকরা (অর্থাৎ নীহার গুপ্ত-রা) তাঁকে স্টারে নিয়ে এলেন। ১৯৬৩ সালের ১৪ ফেব্রুয়ারি মঞ্চস্থ হল সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় ও মঞ্জু দে—অভিনীত *তাপসী* নাটক। পরিচালক ছিলেন দেবনারায়ণ গুপ্ত। প্রায় ৪৬৭টি প্রদর্শনী হয়। যদিও ১২৫—৩০ রাত অভিনয় করার পর সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় ছেড়ে দেন। পেশাদার মঞ্চে এটাই ছিল তাঁর প্রথম অভিনয়। এরপর আবার দীর্ঘ বিরতি। আবার চলচ্চিত্রে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন, যদিও পেশাদার মঞ্চে আবার ফিরে এলেন তাঁর *নাম জীবন* নাটক নিয়ে। ১৯৭৮ সালের ২১ ডিসেম্বরে মানিকতলা থানা-সংলগ্ন কাশী বিশ্বনাথ মঞ্চে প্রথম মঞ্চস্থ হয় *নাম জীবন*। পেশাদার মঞ্চে এটা তাঁর প্রথম পরিচালনা। এর অভিনয়ের মধ্য দিয়েই পেশাদার মঞ্চে অভিনয়ের ধারা পালটে দিলেন তিনি। বিপ্লব ঘটালেন বাংলা পেশাদার মঞ্চের। সুনীল দত্ত তাঁর *জীবনধর্মী নাট্যপ্রযোজনার রূপ ও রেখা* গ্রন্থে লিখছেন, "আর একটি নাটক কাশী বিশ্বনাথ মঞ্চে এই প্রথম পেশাদার অভিনয়ের ধারা পাল্টে দিল। নাটক দেখতে দেখতে গোর্কির নীচের মহলের কথা মনে পড়ে যায়। এই নাটকে দেখি মানুষের অনেক সংঘাত, ব্যথা-বেদনা, নীচতা, উদারতা এইসব নিয়েই মানুষ। সেই মানুষ কতো স্বপ্ন দেখে, এই সব নিয়েই নামজীবন। সেই নামজীবন নিয়েই চলচ্চিত্র অভিনেতা সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়—এই নাটকের নাট্যকার ও পরিচালক।" পুলিন দাস তাঁর *বঙ্গ রঙ্গমঞ্চ ও বাংলা নাটক* গ্রন্থে লিখেছেন, "নামজীবন নাটকে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়কে নাট্যপরিচালনার দায়িত্বে দেখা গেছে। জীবনের বাস্তব সমস্যার রূপায়ণে ও শিল্পসম্মত প্রযোজনার গুণে নামজীবন ব্যতিক্রমধর্মী মঞ্চপ্রয়াস। সবসময়ে ব্যবসায়ী মঞ্চের বিকারের জ্বরে কাশী বিশ্বনাথ মঞ্চ যে আক্রান্ত হয়নি তার প্রমাণ নামজীবন-এর মতো নাটকের মঞ্চায়ন। পেশাদার মঞ্চের পক্ষে সুলক্ষণ সন্দেহ নেই।"

এরপর পরিচালনা করলেন তার দ্বিতীয় নাটক। লিখলেন *রাজকুমার*। সিনেমা-শিল্পের নায়কের জীবনসংকট নিয়ে লেখা নাটক। সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের পাশে নায়িকার ভূমিকায়

অভিনয় করলে সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়। একটি বিশেষ দৃশ্যে *অপুর সংসার*-এর ফিল্‌ম ক্লিপিং ব্যবহার করলেন প্রজেকশনের মাধ্যমে। কিন্তু নাটকটি ব্যাবসায়িক সাফল্য পায়নি। প্রথম ষাট-সত্তর রজনি হাউস ফুল, তারপর কোনোরকমে দুশো রাত্রি অভিনয় হয়। পেশাদার মঞ্চে সর্বাধিক ব্যাবসায়িক সাফল্য লাভ করে তাঁর *ঘটক বিদায়* নাটক। ১৯৯০ সালের ৯ সেপ্টেম্বর স্টার থিয়েটারে নাটকটি প্রথম অভিনীত হয়। সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের পাশে অভিনয় করেন মাধবী মুখার্জী, তরুণকুমার, শ্রীলা মজুমদার, রবি ঘোষ, কৌশিক সেন, প্রমুখ। এই নাটকের জন্য ওই বছর পেলেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগের শ্রেষ্ঠ নাট্যপরিচালকের সম্মান। উল্লেখ্য, ১৯৯১ সালের ১২ অক্টোবর দুর্গাপূজার পঞ্চমীর রাতে স্টার থিয়েটার আগুনে পুড়ে ছাই হয়। পুড়ে যাবার আগের রাতেও *ঘটক বিদায়* নাটকটি অভিনীত হয়েছিল। পরে রাত এগারোটা পর্যন্ত চলেছিল রিহার্সাল। ভোর-রাতে আগুন লাগার খবর পেয়ে ছুটে এসেছিলেন সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়।

পেশাদার মঞ্চে তাঁর আর-একটি উল্লেখযোগ্য নাটক হল *নীলকণ্ঠ*। জমিদারবাড়িতে সকলকে নিয়ে যখন বিনোদনের উচ্ছ্বাস চলছে তখন পুরোনো এক ইতিবৃত্ত মেঘভাঙা বিদ্যুতের মতো নাটকটিকে ঘনীভূত করে তোলে। এরপর শুধুই সংকট, বেদনা। বিচিত্র মানবসম্পর্কের দ্বন্দ্ব ঘনিয়ে ওঠে। রঙমহলের রিভলভিং স্টেজকে ব্যবহার করে নাটকটির মঞ্চায়ন হয়। মঞ্চপরিকল্পনায় অভিনবত্বের পরিচয় দেন তিনি। এক দৃশ্যে সাঙ্গোপাঙ্গদের প্ররোচনায় মদ্যপানে বাধ্য হওয়া এবং উত্তরোত্তর মদ খেতে খেতে সংযত ও হৃদয়স্পর্শী বেহেড মাতলামিতে রূপান্তর বাংলা থিয়েটারে অবিস্মরণীয় হয়ে থাকবে। এই নাটকে আলোর দায়িত্বে ছিলেন তাপস সেন।

এই নাটকগুলি ছাড়াও তাঁর *দর্পণে শরৎশশী, ফেরা, চন্দনপুরের চোর, ন্যায়মূর্তি*, প্রভৃতি নাটকগুলি পেশাদার মঞ্চের শ্রেষ্ঠ দৃষ্টান্ত হিসেবে বাংলা থিয়েটারে চিরদিন উজ্জ্বল হয়ে থাকবে। সাধারণ মঞ্চের দুর্দিনে সে-সময়ে একদিকে যখন চলছিল সস্তা নাটকের বাজার, ইংরেজি সিনেমার বিজ্ঞাপনের অনুকরণে প্রাপ্তবয়স্কদের নাটক (যেমন 'ব্লো-হট নাটক' *বারবধূ*), A-মার্কা নাটক, প্রভৃতি লিখে দর্শকদের ইন্দ্রিয়তৃপ্তির বাসনা জাগিয়ে ব্যাবসা চলছিল, মঞ্চে উঠে এসেছিল ক্যাবারে নাচ (যেমন *চৌরঙ্গী* নাটকে মিস শেফালির ক্যাবারে নৃত্য), তখন

অন্যদিকে তাঁর নাটকগুলো অন্য-এক মাত্রা সংযোজন করেছিল। এই প্রসঙ্গে উৎপল দত্ত-র একটা মন্তব্য উল্লেখ করা যেতে পারে। তিনি লিখেছেন, "এই সময়ে বাণিজ্যিক নাট্যশালা কাশী বিশ্বনাথ মঞ্চ—যেখানে পর পর নানা বীভৎস অর্থগৃধ্নুতার নজীর আমরা এতকাল দেখেছি—পোলের তলার সেই ক্ষুদ্রাকৃতি মঞ্চে শ্রীসৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় নাটকের সামগ্রিকতার এক অনন্য উদাহরণ স্থাপন করলেন।" একই প্রসঙ্গে লিখেছেন, "আজকে বাংলা পেশাদার মঞ্চ রাসবিহারী-অসীমদের সীমাহীন ব্যভিচারে বিধ্বস্ত। একটি প্রাচীন ঐতিহ্যকে তাঁরা লুপ্ত ক'রে দিয়েছেন, বিসর্জন দিয়েছেন নগ্ন নারীর পদপ্রান্তে। সে শ্মশানে এখন প্রগল্‌ভ এবং সস্তা হাসির নাটক অভিনয় ক'রে কেউ-কেউ সহজ আপসের পথ ধরেছেন।"

সবশেষে এটাই বলার যে, পেশাদার মঞ্চকে বাঁচিয়ে রাখতে একা অভিমন্যুর মতো লড়াই করে গেছেন সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়। কিন্তু পারেননি। পেশাদার মঞ্চের ভেতরে যে ঘুণ ধরে গিয়েছিল তার ফলেই অচিরে পঞ্চত্বপ্রাপ্তি ঘটেছিল পেশাদার থিয়েটারের।

মানুষ সৌমিত্রঃ
ঘরের চোখে

সেইসব দিন

সম্বিৎকুমার চট্টোপাধ্যায়

কৃষ্ণনগরে আমাদের বাড়িটা ছিল হাই স্ট্রিটের উপরে। সেখানে আমরা চার ভাইবোন ঠাকুরদার তত্ত্বাবধানে মানুষ হয়েছি। আমার ঠাকুরদা ললিতকুমার চট্টোপাধ্যায় ছিলেন একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ আইনজীবী। মহাবিপ্লবী জ্যোতিন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ('বাঘাযতীন' নামে পরিচিত হলেও নিজের নামের বানান এভাবেই লিখতেন তিনি) ছিলেন তাঁর নিজের ভাগ্নে। আমাদের কৃষ্ণনগরের বাড়িতে তিনি বহুবার এসেছেন, এমনকি ইংরেজের চোখে ধুলো দিয়ে বেশ কিছুদিন মামার কাছেই আত্মগোপন করে ছিলেন। মামার কাছেই দেশপ্রেমের প্রথম পাঠ জ্যোতিন্দ্রনাথের। ঠাকুরদা খুবই strict principle-এর লোক ছিলেন। আমার ঠাকুরমা সুধাময়ী দেবী অল্প বয়সেই মারা যান। তাই সমস্ত সংসারটা দেখাশোনার ভার এসে পড়ে ঠাকুরদার উপর। তাঁর কঠোর অনুশাসনের মধ্য দিয়েই আমরা বড়ো হয়েছি। তাই আমাদের সব ভাইবোনের উপরেই দাদুর প্রভাব খুব বেশি। আমার ভাই 'পুলু'-র (মানে আপনাদের সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের) এই যে disciplined approach to life—সে নাটকেই হোক, কিংবা স্কুলে অথবা বাড়িতে—তার জন্য দাদুর শাসন অনেকখানিই দায়ী। বাপি তখন কর্মসূত্রে কলকাতায় থাকতেন; সারাসপ্তাহের শেষে বাড়ি আসতেন। তাই আমাদের ভাইবোনদের যাবতীয় ভালোমন্দ দেখার দায়িত্ব ছিল দাদুরই। তিনি বরাবরই আমাকে একটু বেশি পছন্দ করতেন। কিন্তু পুলু ছোটোবেলায় খুবই দুষ্টু ছিল; এজন্য শাস্তিও কম পায়নি দাদুর কাছে। আমার মনে আছে, একবার কোনো-একটা খারাপ কথা বলার জন্য দাদু একটা উঁচু রিংয়ের সাথে পা বেঁধে ঝুলিয়ে রেখেছিলেন পুলুকে।

আমাদের শৈশবের আরও-একটা স্মৃতি খুব উজ্জ্বল। প্রতিবছর পুজোর সময়ে দাদু নিমন্ত্রণ পেতেন কলকাতায়, আমাদের বড়োপিসেমশাই রমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় (স্যার আশুতোষের জ্যেষ্ঠ পুত্র)-এর ভবানীপুরের বাড়িতে। আমরাও দাদুর সঙ্গে সেখানে যেতাম। সেখানে ওঁদের বিশাল লাইব্রেরিতে আমি আর পুলু প্রচুর বই পড়তাম। জামাইয়ের সঙ্গে শ্বশুরমশাইয়ের খুবই ভাব ছিল। দার্জিলিং, মধুপুর, শিমুলতলা, প্রভৃতি নানা জায়গায় রমাপ্রসাদবাবুরা সপরিবারে বেড়াতে যেতেন, আর সব জায়গাতেই দাদু হতেন তাঁদের সঙ্গী।

আমার বাবা মোহিতকুমার চট্টোপাধ্যায় আইন পাস করার পর কলকাতায় থেকে

ওকালতি করতেন। তিনি স্বদেশি করতেন, জেলও খেটেছেন। ওকালতি ছেড়ে দিয়ে একটু বেশি বয়সেই বাপি সরকারি চাকরি পান। District Controller of Civil Supplies পদে নিযুক্ত হয়ে বাপির প্রথম কর্মস্থল হল বারাসত। সেটা ১৯৪৫-এর কথা। আমরা বারাসতের হাতিপুকুরের কাছে একটা ভাড়াবাড়িতে থাকতাম। সেখানে থাকবার সময়ে এক-একদিন বিকেলে আমি আর পুলু যেতাম adventure-এ। হাঁটতে হাঁটতে চলে যেতাম দমদম ক্যান্টনমেন্ট স্টেশনে। ততক্ষণে বিকেল গড়িয়ে সন্ধে। এবার বাড়ি ফিরতে হবে তো? কলকাতার ট্রেনে চড়ে আমি আর পুলু বাড়ি ফিরতাম। আবার কোনো-কোনো weekend-এ আমরা পরিকল্পনা করতাম পায়ে হেঁটে হাতিপুকুর যাওয়ার। বাপি-মা খুব ভয় পেতেন—যদি আমরা গাড়িচাপা পড়ি বা গোরা সৈন্যরা ধরে নিয়ে যায়!

পরের বছর বারাসত থেকে বাপি বদলি হয়ে আসেন হাওড়ায়। সেখানে ২০৪ পঞ্চাননতলা রোডের বাড়িতে আমরা ভাড়া থাকতাম। সেখানে আমরা বছরদুই থাকি। স্বাধীনতার পর ১৯৪৮ সালে বাপি বদলি হয়ে যান দার্জিলিংয়ে। দার্জিলিং গভর্নমেন্ট স্কুল থেকে ১৯৪৯ সালে ম্যাট্রিকুলেশন পাস করি আমি; সিট পড়েছিল কৃষ্ণনগরে। দার্জিলিং থেকে আমরা আবার ফিরে আসি হাওড়ায়; তবে এবার শালকিয়ার সল্ট গোলায়। সেখানে আমাদের বাড়িটা ছিল একেবারে গঙ্গার ধারে। সেখানকার প্রাকৃতিক শোভা ছিল অতুলনীয়। তখন নদীর পাড়ে চুপচাপ বসে আমরা বহু বিকেল কাটিয়েছি।

ছোটোবেলা থেকেই পুলুর অভিনয়ের দিকে ঝোঁক। ও নাটক করে, নাটক দেখে এসে বাড়িতে নাটকের সংলাপ আওড়ায়—এসব নিয়ে বাড়িতে আমরা সবাই হাসাহাসি করতাম। ও কিন্তু কোনোদিনই সেইসব হাসিঠাট্টাকে আমল দেয়নি। আমার মনে আছে, শালকিয়ায় যখন আমরা থাকি তখন বিকেলবেলায় পুলু নাটকের rehearsal দেবার জন্য নির্জন জায়গা খুঁজে বেড়াত। আমাদের বাড়ি থেকে কিছুটা দূরে ছিল একটা পরিত্যক্ত লবণগোলা। সেখানে কেউ কোনোদিন যেত না। নীচে নুন বোঝাই করা থাকত, আর তার উপর ছিল একটা খালি ঘর। পুলু ওর নাটকের দলবল নিয়ে সেখানে চলে যেত। লোহার ঘোরানো সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে সেখানে ওরা নাটকের rehearsal দিত। শালকিয়া থেকে পরে আমরা চলে আমি মির্জাপুর স্ট্রিটে, মায়ের মামাবাড়িতে। পুলু শুধু অভিনয়টাই ভালো করত না, ও খেলাধুলোতেও খুবই ভালো ছিল। স্কুলে আর কলেজে ও ছিল খুবই জনপ্রিয়।

১৯৪৭ সালে দেশ যখন স্বাধীন হল তখন স্বাধীনতার দিনটিতে হাওড়া ব্রিজ সুন্দর

করে সাজানো হল। আমরা বাপির সঙ্গে তা দেখতে গেলাম। পরে ১৯৫৪ সালে দিল্লিতে ভারতের প্রথম আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় যুব-উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। সেই অনুষ্ঠানে যোগ দিতে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে আমরা কলেজের বন্ধুরা দিল্লি যাই। সেখানে *Lady Police* নাটকে নামভূমিকায় (প্রধান নারী চরিত্রে) আমিই অভিনয় করি। এরপর যুব-উৎসব হয় ১৯৫৫–৫৬ সালে। তাতে কলেজ থেকে পুলু অভিনয় করেছিল। ও অন্য-একজনের সঙ্গে যুগ্মভাবে সারা ভারতের ছাত্রদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ অভিনেতা নির্বাচিত হয়েছিল।

নাটকের প্রতি উৎসাহ এবং শেখার ইচ্ছা পুলুর ছোটো থেকেই। কর্মসূত্রে বাপি কিছুদিন দক্ষিণ ভারতের মাদ্রাজে ছিলেন। আমরা প্রথম সেখানে ট্রেন থেকে নেমেই মেরিনা বিচে স্নান করতে নেমেছিলাম। সেখানে থাকবার সময়ে পাহাড়ে বেড়াতে গিয়ে পুলু উপর থেকে চেঁচিয়ে আমাদের জিজ্ঞাসা করত যে, আমরা ওকে 'reach' করতে পারছি কি না। পুলুর এই নিষ্ঠাই ওকে আজকের জগৎজোড়া খ্যাতি এনে দিয়েছে।

এমন একজন অভিনেতার দাদা হওয়ার জন্য আমি গর্বিত।

আলাপচারিতা ও রেকর্ডিং: **অনির্বাণ দে**
অনুলিখন: **সুশান্ত চট্টোপাধ্যায়**

সত্যিসত্যিই আজ আমি 'খুবই খুশি'

অনুরাধা সিনহা

পুল্‌দাকে নিয়ে কিছু লিখতে গেলেই অনেক-পেছনে-ফেলে-আসা দিনগুলোতে ফিরে যেতে হবে আমাদের। সেসব আমাদের অতিপ্রিয় ছোটোবেলার দিন—যে-ছোটোবেলা আজ আমাদের ফেলে অনেক দূরে চলে গেছে।

দাদা (সম্বিৎকুমার), পুল্‌দা (সৌমিত্র), আমি, খোকন (অভিজিৎ)—আমরা চার ভাইবোনই খুব সহজভাবে বড়ো হয়েছি। মা-বাপি কখনও আমাদের মধ্যে কোনো তফাত করতেন না ছেলে বা মেয়ে বলে। হয়তো দাদার পরীক্ষা থাকলে আমাকে চেঁচামেচি করতে বারণ করতেন, কিংবা পুল্‌দাকে গলা ছেড়ে আবৃত্তি বা গান করতে নিষেধ করতেন। তখন বাপি বলতেন, "আস্তে! দাদা পড়ছে।" না-হলে কোনো ব্যাপারেই ওঁরা অকারণে আমাদের বকাবকি করতেন না; বরং সব ব্যাপারেই খুব উদার ছিলেন, সেই আমলের মানুষ হওয়া সত্ত্বেও! ওঁরা দুজনেই খুব ভালো আবৃত্তি করতে পারতেন। বাপি তো আইন পড়ার সময়ে কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজি কবিতা আবৃত্তি করে পুরস্কারও পেয়েছিলেন। আর পুল্‌দা যে আবৃত্তি করে এত নাম করেছে, সেটা তো আমাদের মায়ের কাছ থেকেই ওর শেখা। মা তো নজরুল-রবীন্দ্রনাথের কবিতা খুব ভালো আবৃত্তি করতেন। এখনও এই পঁচানব্বই বছর বয়সেও নিজের মনে বিড়বিড় করে আবৃত্তি করতে দেখেছি মাকে। রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে পুল্‌দার এত আগ্রহের মূলভিত্তিটা তো মা-ই গড়ে দিয়েছিলেন। অবশ্য শুধু পুল্‌দাকে নয়, আমাদের চার ভাইবোনকেই কবিতার চর্চা করিয়েছেন মা। কিন্তু পুল্‌দা ছিল সবার চেয়ে এক্কেবারে আলাদা। সব ব্যাপারেই ওর উৎসাহ ছিল সবচেয়ে বেশি। যে-কোনো কিছু চটপট শিখে-ফেলার ব্যাপারে ওর আগ্রহ আর চেষ্টার কোনো খামতি কখনও দেখিনি।

আমি কখনও কিছু শিখতে গেলেই পুল্‌দা আগেভাগে সব শিখে ফেলত। আমি ছোটোবেলায় মাস্টারমশাইয়ের কাছে গান শিখতে বসলেই ও হারমোনিয়াম কেড়ে নিয়ে আমার আগেই গানটা তুলে নিয়ে গেয়ে ফেলত। আমি পারতাম না বলে মা বকত আমায়। আমার আর ভালো করে গান শেখাটাই হল না। কোথাও বেড়াতে গেলে অথবা বাড়িতে আত্মীয়স্বজন এলে আমাদের সান্ধ্য আসর বসত। সবাই গান করত, কবিতা বলত। পুল্‌দা

নিজেরটা তো করতই, খুব ভালো করে আমার আর খোকনেরটাও বলে দিত। বিখ্যাত রবীন্দ্রসংগীতশিল্পী সুচিত্রা মিত্র আমাদের মাসি হওয়ার সুবাদে পুল্‌দা পঙ্কজ মল্লিক, হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, প্রমুখ শিল্পীদের মজলিশে শ্রোতা হিসেবে যাওয়ার সুযোগও পেয়েছে।

শুধু গান, আবৃত্তি আর নাটকই নয়, ছোটোখাটো অনেক ব্যাপারেই পুল্‌দার শেখার আগ্রহ ছিল অপরিসীম। অবশ্য আমাদের দাদাও অভিনয়টা ভালোই করত। কিন্তু পুল্‌দা তো নাচ থেকে শুরু করে উলবোনাও শিখে ফেলেছিল! আমরা যখন বারাসতে থাকতাম তখন আমাদের এক মামার জিপের ড্রাইভারকে বশ করে আমাদের সবাইকে সেই গাড়িতে তুলে গাড়ি স্টার্ট দিয়ে সে কী বিপত্তি বাধিয়েছিল পুল্‌দা! কোনোরকমে সে-যাত্রা আমরা রক্ষা পেয়েছিলাম। তখন ওর বয়স কতই বা হবে? বারো-তেরো। গাড়ি চালানো শুধু নয়, ঘোড়ায় চড়ার শখও ছিল ওর। যখন আমরা দার্জিলিংয়ে থাকতাম তখন তো আমাদের চেনা এক সহিসকে পটিয়ে তার ঘোড়ায় চড়ে মলের আশেপাশে একা-একাই ঘুরতে বেরিয়ে পড়েছিল। দুর্ভাগ্যক্রমে সেই ঘোড়াটা ছিল পাগলা। প্রায় খাদে পড়তে পড়তে বেঁচে ফিরে এসেছিল পুল্‌দা। মজার ব্যাপার, পরবর্তীকালে আরও একবার পাগলা ঘোড়ার পাল্লায় পড়েছিল পুল্‌দা। নাম মনে নেই (বোধহয় *ক্ষুধিত পাষাণ* অথবা *ঝিন্দের বন্দী*), তবে তপন সিংহ-র কোনো-একটা ছবির শুটিংয়েও একবার পুল্‌দা একটা পাগলা ঘোড়ায় সওয়ার হয়েছিল। আবার, এই পুল্‌দাই পরবর্তীকালে সত্যজিৎ রায়ের *অপুর সংসার* ছবির জন্য বাঁশি বাজাতেও শিখে নিয়েছিল!

খুব ছোটোবেলায় আমরা কৃষ্ণনগরে থাকতাম। তখনকার কথা আমার খুব কমই মনে পড়ে। যতদূর মনে আছে, আমাকে ছোটোপিসিমা দিল্লি থেকে খুব বড়ো একটা সেলুলয়েডের পুতুল এনে দিয়েছিল। তখন তো সবই বিলিতি পুতুল হত। তো সেটা দেখেই বাড়ির ছোটোরা সবাই মিলে উঠোনে ছোড়াছুড়ি করে খেলতে লাগল। একসময় তার মাথাটা ধড় থেকে আলাদা হয়ে গেল। তারপর পুতুলের সেই মাথা নিয়ে সে কী ফুটবল খেলা দাদাদের! দাদা অবশ্য চিরকালই একটু চুপচাপ। কিন্তু পুল্‌দা এক শটে সেই 'ফুটবল' ফেলে দিল কুয়োর জলে। তারপর "ধড়টাও আর কী হবে?" বলে হাত-পা আলাদা-আলাদা করে সেগুলোও জলে ফেলে দিল। খুব দুঃখ হয়েছিল আমার, নতুন পুতুলটার ওই পরিণতি দেখে।

আমিও অবশ্য দুষ্টুমিতে কিছু কম যেতাম না। বিশেষ করে পুল্‌দার সঙ্গে আমার

একটু বেশিই মারপিট হত, হয়তো আমরা পিঠোপিঠি ভাইবোন বলেই। আমি তো একবার রেগে গিয়ে ওর বুকের কাছে এমন খামচে দিয়েছিলাম যে, রক্ত বেরিয়ে মাংস উঁচু হয়ে আঁচিলের মতো হয়ে গেছিল। ছোটোবেলার মারামারির সেই চিহ্ন নিয়েই অনেক বড়ো বয়স পর্যন্ত ও পর্দায় আর মঞ্চে অভিনয় করে গেছে। পরবর্তীকালে ডাক্তারের পরামর্শে অপারেশন করে ওই আঁচিলটা বাদ দিতে হয়েছিল।

যাই হোক, কৃষ্ণনগরের আর-একটা ঘটনার কথা এই মুহূর্তে মনে পড়ে গেল। আগেই বলেছি, যেখানে যা দেখত তাই শিখে নিত পুল্‌দা। আমাদের পাশের বাড়ির ভোঁদুদার কাছ থেকে একবার ও শিখে এল যে, খাওয়ার আগে পিঁড়িতে ফুঁ দিয়ে বসতে হয়। বাড়িতে এসে সেই শিক্ষার প্রয়োগ চলতে লাগল। দাদু আর মা খুব বকল।

এসব তো গেল ছোটোবেলার দুষ্টুমির কথা। পুল্‌দা কিন্তু ভেতরে-ভেতরে খুবই সিরিয়াস ছিল ছোটোবেলা থেকেই। যখন কিছু লিখতে বসত তখন কেউ কোনো কথা বললে খুব রেগে যেত। শুধু লেখালেখি বা শেখার ব্যাপারেই নয়, দায়িত্ব নেওয়ার ব্যাপারেও ও থাকত সবার আগে। আমাদের পরিবারের যখন যার যেরকমই বিপদ হোক, পুল্‌দা সবসময় তার পাশে থাকে এখনও। দাদা চাকরির জন্য বাইরে-বাইরে থাকত বলে পুল্‌দা এই দায়িত্ববহনের কাজটা বড়োভাইয়ের মতো করেই সামলাত। আমার বাবার অসুস্থতা ও মৃত্যুর সময়েও মাকে নিয়ে কৃষ্ণনগরে যাওয়া থেকে শুরু করে সব কাজ শেষ না-হওয়া পর্যন্ত পুল্‌দার ছুটি নেই। আমি যখন ফুটবলার রঞ্জিত সিনহাকে বিয়ে করতে চাইলাম তখনও পুল্‌দাই বাড়িতে মা-বাপিকে রাজি করিয়ে সব ব্যবস্থা করেছিল। পরবর্তীকালে আমার স্বামীর heart attack ও মৃত্যুর সময়ে আমার পরিবারের দেখাশোনার দায়িত্ব নেওয়ার ব্যাপারেও পুল্‌দা আর ওর স্ত্রী দীপা আমার পাশে ছিল। শরীরখারাপ বা ব্যস্ততা যাই থাকুক, আজও সব ব্যাপারেই পুল্‌দা আর দীপাকে একবার জিজ্ঞেস না-করে ঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারি না।

দীপার কথা বলতে গিয়ে আমার ছোটোবেলার বন্ধুদের কথা মনে পড়ে যাচ্ছে, কারণ এখন আমার বৌদি হলেও ও তো আগে আমার বন্ধুই ছিল। হাওড়ায় যখন আমরা থাকতাম তখন আমার স্কুলে আমার সঙ্গেই দীপা পড়ত। স্কুল বাসে আমরা একসঙ্গে যাতায়াত করতাম। খুব মজা করতাম আমরা দুজনে মিলে। দুষ্টুমি করতাম। একসঙ্গে টিফিন খেতাম। সেই

সূত্রেই পুল্‌দার সঙ্গে ওর আলাপ আর প্রেম জমে উঠল। পুল্‌দা তখন এইট বা নাইনে পড়ে। সেই বয়স থেকেই ওরা প্রেম করত। আমাকে মাঝখানে রেখে ফোন করা, চিঠি দেওয়া-নেওয়া, ইত্যাদি সবকিছুই চলত। পরে তো ওদের বিয়েই হয়ে গেল; আমার বন্ধু আমার বৌদি হল।

শুধু দীপা নয়, আমরা যখন যেখানেই থেকেছি, সেখানেই আমাদের ভাইবোনদের এরকম অনেক বন্ধু জুটে যেত। কৃষ্ণনগরেও আমাদের পাশের বাড়ির শেলি ছিল আমার বন্ধু, আর ওর দাদা ছিল পুল্‌দার বন্ধু। পরবর্তীকালে হাওড়ায় থাকার সময়ে পুল্‌দার বন্ধু হল অশোকদা। অশোকদার বোন রেবা ছিল আমার বন্ধু, আর ওদের ভাই বুড়ো ছিল খোকনের বন্ধু। আমরা সব ভাইবোন আর বন্ধুরা মিলে খুব হইহই করে খেলা করতাম। আমার পুতুলের বিয়ের সময়ে পুল্‌দা আর অশোকদাও লুচি ভেজেছিল। খুব খাওয়াদাওয়া হল সেই বিয়েতে, আজও সব ছবির মতো মনে পড়ে। সেই অশোকদাই পরবর্তী জীবনে হল অধ্যাপক ও আবৃত্তিশিল্পী অশোক পালিত। আজও পুল্‌দার অভিন্নহৃদয় বন্ধু অশোকদা।

লিখতে লিখতে এত কথা মনে পড়ে যাচ্ছে যে, বোধহয় ঘটনাগুলো ঠিক সাজিয়ে-গুছিয়ে বলা হচ্ছে না। একটা কথা বলাই হয়নি, এখন মনে পড়ছে। ছোটোবেলায় আমাদের জন্মদিনে মা-বাপি গল্পের বই দিতেন আমাদের। আমরা ভাইবোনরাও একে অন্যকে বই উপহার দিতাম। আমার বিয়ের পরও পুল্‌দা আমায় একবার *সঞ্চয়িতা* দিয়েছিল। সেটায় ও আমাকে 'খুশি' বলে সম্বোধন করেছে। আসলে আমি ছোটোবেলায় খুব আদুরে ছিলাম বলে পুল্‌দা আমায় 'খুশি' বা কখনও 'খুবই খুশি' বলে ডাকত। বাড়িতে আমার ডাকনামি অবশ্য 'খুকু'। আমি ওকে ডাকতাম 'ফ-এ হ্রস্ব উ' বা 'ফয়েসু'। আমাদের দাদা আবার আমাকে 'ন্যাকা' বলে ডাকত। আসলে একা বোন বলে আমি খুব আদর পেতাম তো! এখন স্বীকার করছি, খুব ন্যাকামো করতামও।

আমি যখন রাজাবাজারে ব্রাহ্ম বালিকা শিক্ষালয়ে পড়তাম তখন ও আমায় আনতে গেলেই বন্ধুদের সামনে খুব লজ্জায় পড়ে যেতাম। ওরা পুল্‌দাকে আমার 'দিদি' বলত। কেন জানেন? ও তখন খুব বড়ো-বড়ো চুল রাখত, আর চুড়িদারের মতো করে বাঁধা-বাঁধা পিরান পড়ত।

ছোটোবেলার কথা বলতে গেলে আরও অনেক কথাই বলা যায়। তবে আমি তার থেকে বেছে বেছে বিশেষ কিছু ঘটনার কথাই পাঠকদের সামনে তুলে ধরলাম। এখনকার কথা কিছু লিখলাম না। সেসব তো অনেক লোকেই জানে। খবরের কাগজে ও অন্যান্য জায়গায় পুল্‌দার কথা পড়ে বা ছবি দেখে ওর জন্য এত গর্ব হয় যে বলার নয়। আজ ওর কথা লিখতে পেরে আমার আনন্দও হচ্ছে খুব।

সেইসঙ্গে ভয়ে সিটিয়ে আছি। পুল্‌দাকে এখনও ভয় পাই তো খুব! এই বোধহয় বকা খেয়ে গেলাম—"এসব লিখতে কে বলেছে, শুনি?" কিরে পুল্‌দা, বকবি না তো এইসব গল্প করলাম বলে?

আলাপচারিতা ও অনুলিখন: **অনির্বাণ দে**

আমার পুল্‌দা

অভিজিৎ চট্টোপাধ্যায়

অভিনেতা সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় আমার মেজদা। আমি তাকে 'পুল্‌দা' বলেই ডাকি। পুল্‌দার শৈশব কাটে কৃষ্ণনগরে দাদুর (আমাদের ঠাকুরদাদা ললিতকুমার চট্টোপাধ্যায়ের) তত্ত্বাবধানে। বাপি (আমাদের বাবা মোহিতকুমার চট্টোপাধ্যায়) যখন ক্লাস টেনে পড়েন তখন আমার ঠাকুরমা (শিক্ষাবিদ মদনমোহন তর্কালঙ্কারের দৌহিত্রী এবং যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণের কন্যা সুধাময়ী দেবী) মারা যান। আমার বাপিরা চার ভাইবোন ছিলেন। এই চারটি মাতৃহারা শিশুকে দাদু বড়ো করে তোলেন এবং পরবর্তীকালে এঁদের সন্তানদের (অর্থাৎ আমাদের চার ভাইবোনকে) মানুষ করার দায়িত্বও ছিল তাঁর। বাপি কলকাতায় থেকেই ওকালতি করতেন। কৃষ্ণনগর সেই সময়ে যেমন সাংস্কৃতিক দিক থেকে অনেক অগ্রসর ছিল, অন্যদিকে তেমনই মদ্যপান, আনন্দ-ফুর্তি—এসবের প্রচলনও খুবই ছিল। মানে, বখে-যাওয়ার প্রচুর উপাদানও মজুত ছিল সেখানে। সেই 'হাওয়া' থেকে আমাদের রক্ষা করার জন্য দাদু ছিলেন সদাসচেষ্ট। কোনো অন্যায়কেই তিনি কখনও প্রশ্রয় দেননি। পুল্‌দার জীবনে দাদুর প্রভাব খুব বেশি।

পরবর্তীকালে (সম্ভবত ১৯৪৬-এ) আমরা চলে আসি বাপির কর্মস্থল বারাসতে। ওখানে দাদা (আমার বড়দা সম্বিৎকুমার) আর পুল্‌দা পড়ত বারাসতে গভর্নমেন্ট হাই স্কুলে। আমি তখনও স্কুলে ঢুকিনি। বারাসতের পর বাপি বদলি হয়ে যান হাওড়ায়। তখন দাঙ্গার সময়। আমার একটু-একটু মনে পড়ে, আমি তখন বাড়ির কাছেই একটা প্রাইমারি স্কুলে ক্লাস ওয়ানে পড়ি। হাওড়ার পর বাপি বদলি হয়ে যান দার্জিলিংয়ে এবং পরে সেখান থেকে আবার হাওড়ায়। দ্বিতীয় বার আমরা যখন হাওড়ায় আসি তখন আমাদের বাড়ি ছিল শালকিয়ায়, ঠিক গঙ্গার ধারে একটা বড়ো লবণগোলার উপরে। বাপি নদী পেরিয়ে সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউতে অফিস করতে যেতেন। দাদা তখন প্রেসিডেন্সি কলেজে ভরতি হয়েছে। আমি আর পুল্‌দা ভরতি হলাম হাওড়া জেলা স্কুলে—আমি ক্লাস থ্রিতে, আর ও নাইনে।

পুল্‌দার নাটকের ঝোঁক বরাবরই ছিল। পুল্‌দা স্কুলে-কলেজে নাটকে অভিনয় করত। সন্ধেবেলায় নাটক দেখে এসে বাড়িতে সংলাপ আওড়াত। আমরা সবাই তাই নিয়ে অনেক হাসাহাসিও করতাম। ও কিন্তু সেসব পাত্তা দিত না, নিজের মতো চেষ্টা করে যেত। একবার নিউ এম্পায়ারে পাড়ার দাদাদের নাটকের অভিনয় হবে। আমার দাদার এক বন্ধু সুবীরদার সেই নাটকে একটা ছোটোখাটো চরিত্রে অভিনয় করার কথা ছিল। কিন্তু নাটকের ঠিক আগের দিন সে এসে জানাল, কোনো-একটা কারণে (আসলে ছোটো রোল বলেই) সে নাটক করতে পারবে না! তখন তারা পুল্‌দাকে সেই চরিত্রে অভিনয় করার জন্য 'ভাড়া

করে' নিয়ে যায়। পুল্‌দাও এক রাতের মধ্যে পার্ট মুখস্থ করে সেই নাটকে অভিনয় করে। মনে আছে, একটা চাদর টাঙিয়ে ওরা মঞ্চ সাজিয়েছিল।

পরে আমরা যখন মির্জাপুর স্ট্রিটে আমার মা আশালতা দেবীর মামাবাড়িতে থাকতে শুরু করি তখন আমি হেয়ার স্কুলে ভরতি হলাম। পুল্‌দা তখন আমহার্স্ট স্ট্রিটের সিটি কলেজে পড়ত। দাদা তো প্রেসিডেন্সিতেই। একবার তো ফোর্ট উইলিয়ামে এনসিসি-র কাজে যাবার নাম করে। স্কুল-পালিয়ে বন্ধুদের সঙ্গে সিনেমা দেখতে গিয়ে পুল্‌দার চোখে ধরাই পড়ে গিয়েছিলাম! দাদাকে ডেকে পুল্‌দা বলেছিল, "ওই দ্যাখ্, খোকন পালাচ্ছে।"

আমি যখন ফার্স্ট ইয়ারে পড়ি তখন পুল্‌দা অভিনয় করেছিল মার্কাস স্কোয়ার ময়দানে শিশির ভাদুড়ীর সঙ্গে *প্রফুল্ল* নাটকে। সেখানে আমরা বাড়ির সব লোক মিলে গিয়েছিলাম পুল্‌দার নাটক দেখতে। বাপির নাটকের ব্যাপারে খুবই উৎসাহ ছিল, যদিও বাইরে খুব কঠোর একটা ভাব দেখাতেন। বাপি নিজেও দু-একবার অভিনয় করেছেন। বাপি শিশিরবাবুর পাশে পুল্‌দার অভিনয় দেখে মনে-মনে খুবই খুশি হয়েছিলেন।

আজ থেকে বাইশ-তেইশ বছর আগে আমি সেনাবাহিনীর চাকরি নিয়ে কলকাতার বাইরে চলে যাই। তাই পুল্‌দার সিনেমা বা নাটক কোনোটাই আমার দেখা হয়নি ভালো করে। বন্ধুদের মুখে পুল্‌দার সিনেমার কথা, নাটকের কথা যখন শুনতাম, খুবই ভালো লাগত; মনে-মনে খুবই গর্ব অনুভব করতাম। তবে আশ্চর্যের কথা, কলেজে পড়ার সময়ে আমিও পুল্‌দার সঙ্গে একটি ছবিতে অভিনয় করেছি। মানিকদার *অপুর সংসার* ছবির নায়িকা অপর্ণার ভাই মুরারির কথা বোধহয় আপনাদের মনে আছে—যে অপুকে অপর্ণার মৃত্যুসংবাদ দেয় এবং অপু তাকে তার জন্য চড় মারে। হ্যাঁ, আমিই পুল্‌দার হাতে সেই চড় খেয়েছিলাম, আর তা নিয়ে দেশবিদেশে আলোচনার ঝড় উঠেছিল। সৌমিত্র ও শর্মিলার প্রথম ছবি আমারও প্রথম ও একমাত্র ছবি, তাও বিশ্ববরেণ্য চলচ্চিত্রকার সত্যজিৎ রায়ের পরিচালনায়!

পুল্‌দা আজও নাটকে এবং চলচ্চিত্রে অভিনয় করে চলেছে। আমি ওর নীরোগ দীর্ঘজীবন কামনা করি।

আলাপচারিতা ও রেকর্ডিং: **অনির্বাণ দে**
অনুলিখন: **সুশান্ত চট্টোপাধ্যায়**

বাপি

সৌগত চট্টোপাধ্যায়

বাপির বয়স হল ছিয়াত্তর।
পেশাদার অভিনেতা হিসাবে পঞ্চাশ বছরেরও বেশি অতিক্রান্ত হল।
অভিনীত শেষ প্রযোজনা *তৃতীয় অঙ্ক, অতএব*।*

বাপির অভিনয় প্রথম আমি দেখি অভিনেতৃ সংঘের নাটকে—*বিদেহী, রাজকুমার, অন্ধযুগ*।
কিছুদিন বাদে কলকাতার সিনেমা হলে *চারুলতা, অপুর সংসার*।
অশনি সংকেত-এর শুটিংয়ের সময় আমরা শান্তিনিকেতনে যাই।
সেই প্রথম বোলপুর টুরিস্ট লজে থাকা।
তবে *সোনার কেল্লা*-র শুটিংয়ের সময় ইচ্ছে থাকলেও রাজস্থান যাওয়া হয়নি।
তবু স্টুডিয়োতে একটা রেলগাড়ি-কামরার সিকোয়েন্স শুট করতে দেখেছি।

বাপি বরাবরই অভিনয়, লেখাটেখা নিয়ে ব্যস্ত।
পেশা অভিনয়, শখ লেখালেখি।
স্কুলকলেজের পড়াশুনার ফাঁকে-ফাঁকে বাপির ব্যক্তিগত সংগ্রহের প্রচুর বই মন দিয়ে পড়েছি।

এবার কবিতা প্রসঙ্গে আসা যাক।
কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায় বাপির বিশেষ বন্ধু ছিলেন।
এ ছাড়া সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, অমিতাভ দাশগুপ্ত, প্রভৃতি।
প্রণবেন্দু দাশগুপ্তকে দেখেছি।
এক্ষণ-এর সম্পাদক নির্মাল্য আচার্য তো আছেনই।
বাপির প্রথম কবিতার বই *জলপ্রপাতের ধারে দাঁড়াব বলে*।
পরে *ব্যক্তিগত নক্ষত্রমালা*।

বাপির নাটক *নাম জীবন* আমরা কলেজ থেকে দলবেঁধে কাশী বিশ্বনাথ মঞ্চে দেখতে যাই।
এ ছাড়া *নীলকণ্ঠ, আর একটি দিন, কুরবানি, আরোহণ, হোমাপাখি, আত্মকথা*, ইত্যাদি।
বোন পৌলমী বাপির বহু নাটকে অভিনয় করেছে।

ও খ্যাতিমান নর্তকীও বটে।
বাপির অভিনীত বহু ছবি—যেমন *কোনি*, *একটি জীবন*, *ফাদার*, *প্রতিমা*, *সাঁঝবাতির রূপকথার*, *দেখা*, *আবার অরণ্যে*—দেখেছি।
মৃণাল সেন, সত্যজিৎ রায়ের ছবি তো বটেই—*চারুলতা*, *আকাশকুসুম*, *অপুর সংসার*, *অভিযান*, *মহাপৃথিবী*, *অশনি সংকেত*, ইত্যাদি।

তপন সিংহ-পরিচালিত *আতঙ্ক*, *অন্তর্ধান*—এই ছবিদুটির শুটিংয়ের সময় বাপিকে কাজ করতে দেখেছি।
শান্তিনিকেতনে *ফাদার* ছবির শুটিংয়ের সময় বাপির সাথে গিয়েছিলাম।
তরুণ মজুমদার-পরিচালিত *সংসার সীমান্তে* স্মরণীয় হয়ে আছে।

বাপি বেস্ট অ্যাক্টর অ্যাওয়ার্ড পাওয়ায় বাঙালি দর্শকের বহুদিনের সাধ পূর্ণ হয়েছে।
বাপির দীর্ঘজীবন কামনা করে এই নিবন্ধ শেষ করছি।

আমার বাপি, আমার পরিচালক

পৌলমী বোস

অনেকেই মনে করেন, আমার 'পৌলমী' নামটার সঙ্গে বাপির 'পুলু' ডাকনামটার কোনো সম্পর্ক আছে হয়তো। কাকতালীয় হলেও ব্যাপারটা কিন্তু আদৌ সত্যি নয়। আমার নামটা আমার মা রেখেছিলেন। নামটা মায়ের খুব পছন্দ ছিল।

ছোটো থেকেই কিন্তু আমি বাপির সঙ্গে নাটকের rehearsal দেখতে যেতাম। খুব ছোটোবেলার থিয়েটারসংক্রান্ত ঘটনা আমার বিশেষ মনে নেই। শুধু এইটুকু তখন জানতাম যে, বাপি তখন অভিনেতৃ সংঘ থেকে মঞ্চে অভিনয় করতেন। তবে এত জনপ্রিয় শিল্পী হলেও, আমার মনে হয়, অফিসকাছারিতে-কাজ-করা আর-পাঁচটা বাবার থেকে অনেক বেশি করে আমরা—মানে আমি আর আমার দাদা (কবি সৌগত চট্টোপাধ্যায়)—বাপিকে কাছে পেয়েছি, কারণ উনি কখনও একসঙ্গে অনেক ফিল্‌মে কাজ করতেন না, বেছে বেছে অভিনয় করতেন; ফলে বিকেলের পর থেকে কিন্তু আমরা বাপিকে প্রায় সবসময়ই কাছে পেতাম। তখন সাধারণত সন্ধেবেলায় আমাদের হারমোনিয়াম বাজিয়ে সংগীতের চর্চা করতে হত। আবৃত্তিরও চর্চা চলত সেই সময়ে। তখন থেকেই আমাদের উচ্চারণের স্পষ্টতার ওপর উনি নজরদারি করতেন। আর আমরা ছোটোবেলা থেকেই ইংরেজি মাধ্যমে পড়াশুনা করেছিলাম বলে (যদিও স্কুলে বাংলাই ছিল আমার প্রথম ভাষা) আমাদের বাংলা উচ্চারণে একটু-আধটু সমস্যা শুরুর দিকে থাকলেও বাপির সান্নিধ্যে থাকার জন্যই পরবর্তীকালে আর সেই সমস্যা হয়নি। ভুল উচ্চারণ উনি কিছুতেই সহ্য করতে পারেন না। নিজেও খুব সুন্দর বাংলা উচ্চারণ করেন। অভিনেতা দ্বিজেন বন্দ্যোপাধ্যায়ের উচ্চারণ খুব স্পষ্ট। তাই বাপির সবসময় দ্বিজেনবাবুকে খুব পছন্দ। এখন তো বলা যায়, অধিকাংশ নাটকেই আমি আর দ্বিজেনবাবুই বাপির দুই ল্যাংবোট।

তবে শিল্পী সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়কে আমি কিন্তু চিনেছি অনেক পরে, আর সেটাও কিছুটা ঘটনাচক্রেই বলা যেতে পারে। আমি নাচ করতাম। কোনোদিনও যে অভিনয় করব, সেটা নিয়ে আমার খুব-একটা আকর্ষণ ছিল না। আমি তখন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজি নিয়ে পড়ছি। এমন সময়ে বিষ্ণুপ্রিয়া জার্মানি চলে যাওয়ায় উৎপল দত্ত-র পিএলটি-তে আমি অভিনয় শুরু করি *আজকের শাজাহান* নাটক দিয়ে। বিষ্ণুপ্রিয়ার জায়গায় দু-বছর

আমি অভিনয় করি। এরপর বিষ্ণুপ্রিয়া ফেরার পর ওরই পরিচালনায় *একলা চলো রে* নামে একটা নাটকেও কিছুদিন অভিনয় করেছি। তারপর বাপির সঙ্গে একেবারে professionally নাটক করতে শুরু করলাম *নীলকণ্ঠ* দিয়ে। সেই থেকে বাপির সঙ্গে আমার একসঙ্গে কাজ করা শুরু।

বোর্ডে *নীলকণ্ঠ* অভিনয় করার পর আমার অভিনয়ে অনেক দিনের একটা বিরতি ছিল। পারিবারিক কারণেই আমাকে ছুটি নিতে হয়েছিল। তারপর আবার ২০০০ সাল নাগাদ *নীলকণ্ঠ* নাটকটাকে আবার নতুনভাবে আমরা করতে শুরু করলাম। তারপর থেকে *আর একটি দিন*, *আরোহণ*, *হোমাপাখি* ও *তৃতীয় অঙ্ক*, *অতএব* নাটকে আমি বাপির সঙ্গে অভিনয় করেছি।

পদ্ধতিগতভাবে পরিচালক হিসাবে বাপির মধ্যে সত্যজিৎ রায় ও তপন সিংহ দুজনেরই প্রভাব আছে। তপন সিংহ অভিনয়টা করে দেখাতেন, আর বলতেন, "এইভাবে করো।" কিন্তু সত্যজিৎ রায় গোটা ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিয়ে অভিনেতা বা অভিনেত্রীর নিজস্ব অভিনয়টাকে বের করে আনতেন। বাপি সময়বিশেষে দুজনকেই follow করেন। উনি প্রথমে পুরো ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিতেন; তারপরে যদি বোঝেন যে, একেবারেই হচ্ছে না, তখনই নিজে দেখিয়ে দেন। পরিচালক হিসাবে উনি কিন্তু ভীষণ কঠোর। আর নিজের মেয়ে বলে আমার জন্য সেটা যেন আরও বেশি! মেয়ে হিসাবে আমি অন্তত কোনোদিন ওঁর কাছ থেকে বাড়তি সুবিধা পাইনি। আর সেটা আমি পেতেও চাইনা।

যেমন *আরোহণ* নাটকটার কথাই বলা যেতে পারে। সেখানে আমার কিন্তু একটা পার্শ্বচরিত্র ছিল। মূল চরিত্রে অভিনয় করেছিল খেয়ালী দস্তিদার। তখনও পর্যন্ত কিন্তু আমাকে উনি সবটা দেখিয়ে দিতেন। হয়তো তখনও আমার অভিনেতাসত্তাটা অতটা তৈরি হয়নি, অন্তত উনি যে-level-টা চাইছিলেন, আমার মধ্যে সেটা পাচ্ছিলেন না। তারপর থেকে অন্যান্য নাটকের ক্ষেত্রে কিন্তু দেখেছি, উনি আমাকে অনেকটাই ছেড়ে দিচ্ছেন। Just নাটকের situation-টা বুঝিয়ে দিয়ে বলছেন, "এবার তুমি নিজের মতো করে করো।" তবে ভুলটুল হলে এখনও তো অবশ্যই শুধরে দেন।

আরোহণ-এ এই ছোটো চরিত্রটা পেয়েছিলাম বলে বাপিকে কারণটা জিজ্ঞেসও করেছিলাম। কিন্তু কপালে শুধুমাত্র ছোট্ট করে একটা বকুনি জুটে গেল! বললেন—"তুমি এত কথা বলছ কেন? আমি পরিচালক—আমি যাকে ভালো বুঝেছি তাকেই দিয়েছি।"

আমার চরিত্রটা ছিল এক মদ্যপ মহিলার। সে এক বনেদি বাড়ির স্ত্রী, সমাজে তার

সম্মান আছে; তবু সে মদ্যপান করে। আসলে চরিত্রটা আমার ঠিক আসছিল না। তাই বাপিকে বললাম—"আমাকে ছেড়ে দাও। ঠিক হচ্ছে না। আমি বোধহয় পারব না।" বাপি তখন ব্যাপারটা আমাকে বোঝালেন, আর বললেন—"এটা তুমি ঠিক পারবে। দেখবে, দর্শকের প্রশংসাও পাবে।"

তাও দেখলাম, ব্যাপারটা ঠিকঠাক হচ্ছে না। মদ্যপ ব্যাপারটা বাইরে প্রকাশ পেয়ে যাচ্ছে। উনি তখন বললেন, "তুমি এইরকমভাবে সংলাপগুলো বলছ কেন? তুমি কে সেটা আগে বোঝবার চেষ্টা করো। তুমি কি হরিশ্চন্দ্রপুরের পেঁচো মাতাল যে তুমি এইভাবে কথা বলবে? তুমি একটা ভালো বাড়ির ভালো মেয়ে, লক্ষ্মী মেয়ে। তাই তুমি কীভাবে কথা বলবে সেটা তোমার background তোমাকে বলে দেবে। সেদিকে stress দাও।"

সেই চরিত্রটা বুঝতে আমার অনেক সময় লেগেছিল। প্রায় বলা যায়, stage rehearsal-এর আগে গিয়ে ব্যাপারটা আমার কাছে পরিষ্কার হয়েছিল। আর সত্যিই দর্শকের কাছে চরিত্রটা প্রশংসাও পেয়েছিল খুব। বাপির দূরদৃষ্টির পরিচয়ও পেয়েছিলাম সেদিন।

দূরদর্শনেও বাপির পরিচালনায় দুটো কাজ করেছিলাম। একটা হল *মহাসিন্ধুর ওপার* হতে বলে একটা টেলিছবি; আর দূরদর্শনের National Network-এর জন্য হিন্দিতে করেছিলাম *স্ত্রী কা পত্র*। দুটোই খুব ভালো চলেছিল। দ্বিতীয়টায় রূপা গাঙ্গুলি মৃণাল হয়েছিল, আর আমি বিন্দু হয়েছিলাম। Film director হলেও বাপি কিন্তু স্বনামধন্য হতে পারতেন।

বাপির সঙ্গে আমরা সহ-অভিনেতারা কিন্তু একেবারে পাল্লা দিয়ে অভিনয় করার সুযোগ পাই। *হোমাপাখি*-র review-তে কয়েকটা পত্রপত্রিকায় এ কথাটাও লেখা হয়েছে যে, আমিও নাকি বাপির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে অভিনয় করেছি! আসলে ওঁর সঙ্গে সহ-অভিনেতা হিসাবে মঞ্চে অভিনয় করাটা কিন্তু খুব সহজ। উনি কখনও কাউকে ভুল cue দেন না। ছিয়াত্তর বছর বয়স হয়ে গেল, আজ পর্যন্ত কখনও কোনো সহ-অভিনেতাকে মঞ্চে বিপদে ফেলেননি। তবে পরিচালক হিসাবে উনি কিন্তু খুব কঠোর। নাটক পুরোপুরি তৈরি হয়ে-যাওয়ার পরেও যদি কেউ ভুলভাল করে তখন কিন্তু উনি খুব বকাবকি করেন। আর নিজের মেয়ে হিসাবে আমার ভাগ্যে তো সেটা চিরকালই একটু বেশি জুটেছে। তবে হ্যাঁ, দ্বিজেনবাবুকে উনি কক্ষনো কিছু বলেন না! দ্বিজেনবাবুকে উনি ভীষণ ভালোবাসেন। দ্বিজেনবাবু নাটকে থাকলে বাপি ভীষণ খুশি।

এ কথা ঠিক, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়কে নিয়ে চর্চা অনেক কম হয়েছে। নাটকের কথা তো ছেড়েই দিলাম, চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রেও যেন একইরকম উদাসীনতা! ওঁর বহু ছবির নাম

অনায়াসে বলা যেতে পারে যেগুলির প্রত্যেকটিতে উনি বিশ্বমানের অভিনয় করেছেন; যেমন—*অপুর সংসার*, *অশনি সংকেত*, *ঝিন্দের বন্দী*, *ক্ষুধিত পাষাণ*, *কোনি*—আর কত নাম করব? একজন মাছওয়ালা সেদিন আমাকে বললেন *আতঙ্ক* ছবিতে বাপির অভিনয়ের কথা! মানে ভাবুন, উনি সমস্ত স্তরের মানুষের মাঝে পৌঁছেছেন নিজের অভিনয়ের মাধ্যমে।

এই যে চলচ্চিত্রের জাতীয় পুরস্কারটা এতদিন পরে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়কে দেওয়া হল, সেটা খুবই দুঃখজনক। মানে, এটা তো ওঁর peak from-এই পাওয়া উচিত ছিল! ভাবখানা এমন যেন এতদিন উনি কিছু কাজ করেননি, আজ থেকে হঠাৎ করতে শুরু করেছেন!

বাপির নিজের কাছে অবশ্য এইসব জিনিস কোনোদিনই কিছু matter করত না। জাতীয় পুরস্কারটা ঘোষণা করবার পর প্রথমে তো নেবেনই না ঠিক করেছিলেন। কিন্তু পরে সকলের অনুরোধে আর দর্শকদের কথা ভেবে উনি সেই সম্মান গ্রহণ করতে রাজি হন। দর্শকদের উনি সবসময় গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে দেখেন। তাঁদের ভালোবাসার জন্যই যে তিনি আজ এই জায়গায় এসেছেন, এ কথাটা আজও বাপি বারবার বলেন।

আলাপচারিতা ও রেকর্ডিং: অনির্বাণ দে
অনুলিখন: অনন্যা দাস ও অনিন্দ্য বন্দ্যোপাধ্যায়

মানুষ সৌমিত্রঃ
বাইরের চোখে

পাদপূরণ

সুভাষ মুখোপাধ্যায়

গারস্টিন প্লেস। রেডিও স্টেশন।
সিঁড়ির এককোণে
নামতে উঠতে হঠাৎ
প্রথম দেখা

সৌমিত্র দাঁড়িয়ে আছে
তখন সবে পা দিয়ে
যৌবনে

পায়ের নীচে এখন আমার বাকি
একটিমাত্র ধাপ—
কালের স্রোতে মুছে যায়নি তবু
সেদিনের সেই ছাপ।

পৌঁছে দোরগোড়ায়
পেছন ফিরে দেখি
তার মধ্যে কখন
সৌমিত্র উঠে গিয়েছে চূড়ায়।
যেখানে নাগাল পায় না
আমার হাত।

খুঁড়িয়ে হাঁটি। কে যেন আমায় দেখে
গাড়ি থামায় হঠাৎ—
জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দীপা।
পৌঁছে দেয় বাড়ি।
ভালো তো সব? ভালো।

ঘরে যখন রেখেছি পা
গড়িয়ে গেছে সন্ধ্যে।

জ্বলছে আলো।

টিভিতে রাখি চোখ
চম্‌কে উঠে দেখি—
কবিকন্যা করুণাবিগলিত
মুক্ত হস্তে
ফিরিয়ে দিচ্ছে নাটকের শেষ অঙ্কে
একজনকে
চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে
হারানো তার ঐশ্বর্য
পায়ের নীচে জমি—
কী আশ্চর্য,
আমাদের সেই ছোট্ট পৌলমী।

সৌমিত্র ও আমি: বন্ধুত্বের অর্ধশতক পেরিয়ে

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

আমরা দুজনেই সিটি কলেজে পড়তাম। সৌমিত্র ছিল আমার থেকে একটু জুনিয়র। ও আমার থেকে ঠিক এক বছর নীচে পড়ত। তবে ওর সঙ্গে পরিচয় অভিনয়ের সূত্রে। সে আজ থেকে প্রায় ছাপান্ন-সাতান্ন বছর আগের কথা। আমাদের কলেজের সোশ্যালে আমরা প্রতিবছর কোনো-না-কোনো একটা নাটক অভিনয় করতাম। আমাদের ছোট্ট একটা নাটকের দল মতন ছিল—ওই কলেজের ছেলেরা মিলেই করেছিলাম। সেবার আমরা জে. বি. প্রিস্টলে-র বিখ্যাত নাটক *An Inspector Calls* বাংলায় অনুবাদ করে অভিনয় করব ঠিক করলাম।* সেই অভিনয়ের সূত্রেই সৌমিত্র-র সঙ্গে আমার আলাপ। আমিও অভিনয় করেছিলাম সেবার ওর সঙ্গে।

তখন অবশ্য অভিনয়টা সৌমিত্র-র শুধু একটা শখ ছিল এই পর্যন্ত। হয়তো ওর স্বপ্ন ছিল ভবিষ্যতে একজন প্রতিষ্ঠিত কবি হওয়ার। সেই সময় অভিনয়ের পাশাপাশি কবিতাও লিখত ও। বেশ ভাল লিখত। এখনও তো ও কবিতার চর্চা করে। সেই সময়ে ওর কয়েকটা কবিতা ছাপাও হয়েছিল আমাদের *কৃত্তিবাস* পত্রিকায়। কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গেও ওর খুব বন্ধুত্ব ছিল।

কলেজ ছাড়ার পর অনেকদিন ওর সঙ্গে কোনো যোগাযোগ ছিল না। তারপর তো ও আকাশবাণীতে চাকরি করতে ঢুকে গেল। তখনও ও আজকের মতো খ্যাতনামা হয়ে ওঠেনি।

পরে সত্যজিৎ রায়ের হাত ধরে ও প্রথম *অপুর সংসার* ছবিতে অভিনয় করল এবং প্রথম ছবিতেই ওর প্রতিভা জগতের কাছে প্রকাশ পেল। সেই সময়ে উত্তমকুমার বাংলার চলচ্চিত্রজগতের মধ্যগগনে। সৌমিত্রও তখন উঠে আসতে লাগল উত্তমবাবুর পাশাপাশি। নিজের প্রতিভায় উত্তমকুমারের পাশাপাশি সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ও হয়ে উঠলেন এক জীবন্ত কিংবদন্তী। এ আপনাদের সকলেরই জানা। আমরা তখন ছিলাম সৌমিত্র-র ভক্ত, যদিও উত্তমবাবুও খুব ভালো অভিনয় করতেন।

সৌমিত্র বোধহয় তখন নাটকে বিশেষ-একটা অভিনয় করত না। সেই সময়ে ও শুধু সিনেমাতেই অভিনয় করত। নাটকে ও আবার অভিনয় করতে শুরু করল অনেক পরে। বেশকিছু বিদেশি নাটককের বঙ্গীকরণ করে ও কাজ শুরু করল। তার মধ্যে ওই *Sleuth* বলে ব্রিটিশ নাটকটার রূপান্তর তো খুবই নাম করেছিল। ও আর কৌশিক মিলে সেই *টিকটিকি* নাটকটার অনেকগুলো শো করেছিল বিভিন্ন জায়গায়। ওর রূপান্তরিত নাটকগুলি বাংলার নাট্যসাহিত্যের ইতিহাসে এক নবদিগন্তের উন্মোচন ঘটিয়েছে।

শিল্পী হলেও সৌমিত্র কিন্তু যথেষ্ট সমাজসচেতন। সমাজে যখন-যখনই কোনো অন্যায় বা অনাসৃষ্টি ঘটেছে তখন-তখনই কিন্তু ও ওর মতন করে প্রতিক্রিয়া কিংবা প্রতিবাদ জানিয়েছে। সেইসব অনেক ঘটনাই আপনাদের জানা।

পরবর্তীকালে ওর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা আরও বেড়ে ওঠে। প্রায়শই এখন আমাদের দেখাসাক্ষাৎ হয়। ওর স্ত্রী দীপাকেও আমি বিয়ের আগে থেকেই চিনতাম। ওরা এখন আমার পারিবারিক বন্ধুর মতনই আপন।

এই প্রসঙ্গে একটা কথা মনে পড়ছে, যেটা হয়তো বাঙালিরা এখানে অনেকেই জানেন না। দু-তিন বছর আগে লন্ডনপ্রবাসী এক বাঙালি অমিতরঞ্জন বিশ্বাস নীরার কবিতা নিয়ে একটা script লিখেছিলেন। সৌমিত্র গিয়েছিল তখন ওখানে অমিতবাবুর আমন্ত্রণে। উনি পেশায় ডাক্তার। আমিও সেই সময়ে ছিলাম লন্ডনে। আমি অবশ্য গিয়েছিলাম বইমেলা উপলক্ষ্যে। ওঁরা ওখানে একটা হল ভাড়া করেছিলেন ওখানে সৌমিত্র সেই নাটকটাতে অভিনয় করেছিল আর আমিও তাতে সৌমিত্র-র সঙ্গে অভিনয় করেছিলাম। লন্ডনের মঞ্চে সৌমিত্র-র সঙ্গে অভিনয় করতে খুব রোমাঞ্চ লেগেছিল আমার।

সৌমিত্র নিজে কিন্তু খুব জমিয়ে আড্ডা মারতে পারে; গল্পও করে খুব সুন্দর। আমরা একবার একসঙ্গে বেড়াতে গিয়েছিলাম। জায়গাটা একটু অভিনব; অনেক লোকেই সেখানে যায় না। কানাডাতে ভ্যাঙ্কুভার (Vancouver) থেকে ক্যালগ্যারি (Calgary) পর্যন্ত একটা রাস্তা আছে। সেই রাস্তার দুইধারে হল পাহাড়। পাহাড়গুলোর সব অদ্ভুত আকার। বায়ুর ক্ষয়কার্যে অসাধারণ সব ভাস্কর্যের সৃস্টি হয়েছে সেইসব পাহাড়গুলোতে। কোনো পাহাড়কে দেখে মনে হয় গির্জা, কোনোটাকে আবার মনে হয় দুর্গ। কখনও আবার কোনো পাহাড়কে দেখে মনে হয় মোষের মাথা। আমাদের সঙ্গে ফ্রান্সের ও কানাডার দুজন সাহিত্যিক বন্ধুও ছিলেন। আমরা সবাই মিলে গিয়েছিলাম ভ্যাঙ্কুভার শহরের একটা সাহিত্যসমাবেশে। আমরা একটা গাড়ি ভাড়া করে ভ্যাঙ্কুভার থেকে ক্যালগ্যারি পর্যন্ত একটা long drive-এ রওনা হলাম। তখন সৌমিত্রও এসে যোগ দিয়েছিল আমাদের দলে। পার্বত্য রাস্তা, অপূর্ব তার সৌন্দর্য—যেন পটে-আঁকা ছবি। রাস্তার পাশে-পাশে অনেক মোটেল আর সরাইখানা আছে। সর্বত্রই খাওয়াদাওয়ার অতিউত্তম ব্যবস্থা। এমনকি ইচ্ছে করলে রাত্রিবাসও করা যায়। পাঁচ দিন ধরে আমি, স্বাতী, সৌমিত্র আর বাকি সবাই সেখানে পৌঁছোলাম। তবে টানা যাত্রা নয়, রাতটা মোটেলে কাটিয়েই সকালে আবার বেরিয়ে পড়তাম। সেই পাঁচটা দিন সৌমিত্রকে একেবারে অন্যভাবে পেয়েছিলাম। মজার-মজার গল্প বলে মাতিয়ে রেখেছিল আমাদের। সেইসঙ্গে প্রচুর গান গেয়েছিল। যদিও প্রকাশ্যে ও খুব-একটা গান গায় না, কিন্তু আড্ডার ফাঁকে-ফাঁকে আমরা ওর অনেক গান শুনি। আপনারা হয়তো জানেন না, ওর

গানের গলা খুব সুন্দর। আমি হলফ করে বলতে পারি, ও অভিনয় না-করেও যদি ছবিতে প্লেব্যাক গাই তাহলেও ও বিখ্যাত হত—এতটাই সুন্দর ওর গানের গলা। সেই সফর আমার জীবনে একটা স্মরণীয় ঘটনা হয়ে যাবে।

সৌমিত্র যখনই নাটক করে তখনই আমি সময় পেলেই সেটা দেখতে যাই। আমি ওর প্রায় সবগুলো নাটকই দেখেছি। ওর ওই *হোমাপাখি* নাটকটা বেশ নাম করেছিল, কিন্তু আমার অনেকদিন ধরেই সেটা দেখা হচ্ছিল না। যখনই ওটার কোথাও শো থাকত তখনই আমি কোথাও-না না-কোথাও ব্যস্ত থাকতাম, নয়তো বাংলার বাইরে থাকতাম। দেখা হলেই সৌমিত্র আমাকে শুধু জিজ্ঞেস করত, "দেখেছ?" আর আমি লজ্জিত হয়ে বলতাম "না।" শেষে একরকম প্রতিজ্ঞাই করে নিয়েছিলাম যে, ওটা দেখবই দেখব। শেষপর্যন্ত দেখেওছিলাম। আর বাকিগুলো তো সবই দেখেছিলাম।

এই সেদিন *তৃতীয় অঙ্ক অতএব*-ও দেখলাম। অনেকটা আত্মকথামূলক। দেখে সৌমিত্রকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, এই নাটকটা "কেন লিখলে? কেন হঠাৎ এটা করলে বলো তো?" ও বলল, "কেন এ প্রশ্ন?" আমি বললাম, "এতে মৃত্যুচিন্তাটা বড়ো বেশি করে প্রকাশ পেয়েছে। অত মৃত্যুচিন্তা না থাকলেই বোধহয় ভালো ছিল, আমার মনে হয়।"

আমার সঙ্গে সেদিন ও একমত হতে পেরেছিল কি না জানি না, তবে আপামর বাংলার জনসাধারণের কাছে নাটকটি খুবই সমাদৃত হয়েছে বলেই মনে হয়।

সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের অভিনয়জীবনের পঞ্চাশ বছর অতিক্রান্ত হয়েছে। সৌমিত্র আর আমার বন্ধুত্বের বয়সও অর্ধশতাব্দি পেরিয়েছে বেশ কয়েক বছর আগেই। হীরকজয়ন্তী হতেও আর বেশি দেরি নেই। এখনও আমরা আমাদের বন্ধুত্ব নিয়ে গর্বিত। ও সুস্থ শরীরে আরও অনেক কাজ করে আমাকে আরও গর্বিত করুক—এটুকুই আমার বাসনা।

আলাপচারিতা ও রেকর্ডিং: **অনির্বাণ দে**
অনুলিখন: **সুজয় মণ্ডল ও অনিন্দ্য বন্দ্যোপাধ্যায়**

আমহার্স্ট স্ট্রিট থেকে

গৌরমোহন মুখোপাধ্যায়

এমনই এক সকালে প্রথম দেখি পুলুকে। সিটি কলেজের দোতলার বারান্দায়। বেলাশুরুর রোদ্দুর এসে পড়েছে সেখানে। নানা ছাত্রের আনাগোনায়, চলাফেরায় করিডর তখন জমজমাট হয়ে পড়ছে। তার মধ্যে একটা ষোলো-সতেরো বছরের তরুণ এসে আমার সঙ্গে সরাসরি কথা বলতে এগিয়ে এল। তার মুখে একরাশ হাসি। ও তখন ফার্স্ট ইয়ারে, আমি থার্ড ইয়ারে।

"গৌরদা, আমার নাম সৌমিত্র। আমার বন্ধু অশোকের কাছে আপনার কথা শুনে আলাপ করতে এলুম।" সম্ভ্রমের ভঙ্গিতে কথাটা বলল ও। দু-চোখ ধরে রাখতে পারছে না হাসি। যতদূর মনে আছে, গায়ে বোধহয় এন সি সি-র জামা। গায়ের রং উজ্জ্বল গৌর, কবি যাকে বলেছেন 'কনকগৌর'। সুন্দর মুখ ঘিরে সেই হাসি। মনে হয় যেন রাশি-রাশি আলো।

কিন্তু আরম্ভের আগেও আছে আরম্ভ। এর বেশ কয়েক মাস আগে আমহার্স্ট স্ট্রিটের পথে একদিন দেখা হয়েছিল অশোকের সঙ্গে। হঠাৎ পথে আলাপ। তারিখটা আজও মনে আছে—২০ এপ্রিল ১৯৫১। প্রথম আলাপেই অশোককে দারুণ ভালো লেগেছিল। সাহিত্যে কত উৎসাহ! বিভূতিভূষণের *পথের পাঁচালী*-র নিদারুণ ভক্ত। প্রথম আলাপেই অশোক বলেছিল ওর বন্ধুদের কথা। পুলু ওর একান্ত বন্ধু। পুলু, লালু, শ্যামল।

সেই শুরু। সেতারের আলাপের শুরু। সে-সুর আজও ঘিরে রয়েছে। আমাদের সকলকে। আমাকে তো বটেই।

তারপর দিন এল, দিন গেল, সন্ধ্যা হল, রাত্রি নেমে এল। দেখা আর দেখা, কথা আর কথা। হ্যামলেটের সেই—words words words। সকলেই থাকে আমহার্স্ট স্ট্রিটের চারিধারে। সিটি কলেজ—আমহার্স্ট স্ট্রিট—হৃষীকেশ পার্ক। পথই ছিল সেদিন আমাদের মঞ্চ। সেই পথ শুরু হয়েছে আমহার্স্ট স্ট্রিট থেকে। যত দাপাদাপি আমহার্স্ট স্ট্রিটের বুকে, হৃষীকেশ পার্কের ঘাসের বিছানায়। কখনও ভরদুপুরে, কখনও সন্ধ্যায়। সেদিন গান বেঁধেছিলাম এই বলে, "মরিলে তুলিয়া রেখো আমহার্স্ট স্ট্রিটের ডালে।"

সে—আমহার্স্ট স্ট্রিটকে এখন আর চিনতে পারি না। সবকিছু কত বদলে গেছে! আমাদের পথচলা ছিল দুরন্ত। আকাশে মধ্যাহ্নসূর্যের ছটা চাবুকের মতো লাগছে। আমরা চলেছি পথ হেঁটে। আমহার্স্ট স্ট্রিটে পিচ গলছে। ঠা-ঠা রোদে চারিদিক জ্বলছে। সেই জ্বলন্ত দুপুরে আমাদের কথা বলতে বলতে হেঁটে-চলার কিন্তু কোনো বিরাম নেই! মাঝে-মাঝে পথের সরাইখানায় গিয়ে বসে-পড়া। আমহার্স্ট স্ট্রিটের চায়ের দোকান। দোকানগুলো তখন থাকত ঝাপটা-দেওয়া। কারণ বাইরে তো লু বইছে। কলেজে ক্লাস চলছে। ক্লাস শেষ হলে ঘণ্টা

বাজছে।

দেখতে দেখতে আমরা সংখ্যায়ও ভারী হয়ে গেলাম। যে যার কলেজ থেকে এসে আসরে বসেছে। কিরীটী আসত আর জি কর থেকে। ডাক্তারি-পাঠের ছাত্র। সাহিত্যে তার অপার টান, অগাধ আসক্তি। এ ছাড়া ছিল প্রথম ত্রয়ী—অশোক, পুলু আর শ্যামল। পরে এসে হাজির হল নির্মাল্য আচার্য। তাকে এখানে আসতে অনেক কাঠখড় পোড়াতে হয়েছে। পরে সে-কথা সে বারবার আমায় শোনাত। এল প্রবীর—সি-এ-র ছাত্র। আর প্রভাত। মাঝেমাঝে আসত লালু (সুশান্ত), স্কটিশ থেকে। সকলেই উৎসুক। উদ্‌বেল। এ ছাড়া সীমান্তে তখন অনেক রসিক বন্ধু। অথই আনন্দ, অফুরান কথা। বিষয় ছিল বিচিত্র। "Nothing human is foreign to me." হাসির হররা, টিটকিরির গিটকিরি থেকে 'গবেষণার কূটৈষণা'। 'গবেষণার কূটৈষণা' কথাটা ছিল পুলুর। আমাদের কোনো সাথিকে সে এই বলে বিদ্ধ করত। পুলুকে আমরা বলতাম *অচলায়তন*-এর পঞ্চক'। যেখানে রস, যেখানে আনন্দ, সেখানেই পুলু। কিন্তু আমাদের গোষ্ঠীতে আলোচনা যখন তত্ত্বারণ্যে প্রবেশ করত, পুলু তখন কৌতুকস্নিগ্ধ চোখে তাকাত।

আমহার্স্ট স্ট্রিটের 'নরেন কেবিন' সেদিন ছিল এলিজাবেথান 'মারমেড টাভার্ন'। এই নরেন কেবিন সেদিন ছিল আমাদের দলের ঠিকানা। পরে সেটা চলে যায় কফি হাউসের দিকে। আমহার্স্ট স্ট্রিট থেকে কফি হাউস। নরেন কেবিনে ছিল আমাদের অবাধ অধিকার। দু-এক কাপ চা নিয়ে পাঁচজনে ভাগাভাগি করে বসে-যাওয়া। কখনো-কখনো শুধুই এক গ্লাস করে জল। পকেটে তখন কোনো রেস্ত নেই। আমাদের টিউশনির দু-দশ টাকা। তাও তো ন-মাসে ছ-মাসে তা হাতে আসত। পুলুর হাতখরচার টাকা পেলে সেদিন হত দলের মোচ্ছব। চা, টোস্ট, অথবা দু-আনা প্লেটের ঘুগনি নরেন কেবিনে কেউ আমাদের উঠতে বলত না। মাঝেমাঝে নরেনদার চোখদুটো দেখে আমাদের মায়া হত। আমরা 'সিট' ছেড়ে আবার পথে নামতাম। বিকেলের দিকে আসর বসত জমজমাট। আলোচনার আসর। আলোচনার বিষয় ছিল বিদেশি সাহিত্য। কখনো-কখনো দর্শন। একদিন ঠিক হল 'ফরাসি বিপ্লব' নিয়ে আলোচনা হবে। পরের সপ্তাহে হবে 'বৌদ্ধধর্ম ও দর্শন'। বেশ মজা করে পুলু ঘোষকের মতো বলল—"কাল আলোচনা হবে 'ওল্ডেনবার্গের দুটি ভুল'।" ব্রাহ্মসমাজ লাইব্রেরিতে একটা নির্দিষ্ট টুল আর টেবিল ছিল আমার। দর্শন পাঠ করতাম। রোহিণী নাথ ছিলেন লাইব্রেরিয়ান। তিনি ব্রজেন শীলের কথা বলে বই পেড়ে দিতেন। দুরূহ-দুরূহ দর্শনের বই। পুলু সঙ্গেই থাকত। সে তো নিত্যসঙ্গী। পড়াশোনা সেরে আবার নরেন কেবিনে চা-সহযোগে তত্ত্বালোচনা। দর্শনে বেশ উৎসাহী ছিল শ্যামল ও কিরীটী। নানা প্রশ্ন, নানা কথা, কথান্তর। কোনো বিশেষ বিষয় বাঁধা ধরা ছিল না। জ্ঞানচর্চার মুক্তাঙ্গন। আমাদের আদর্শ

ছিল বিরাট। বিশুদ্ধ জ্ঞানচর্চার অ্যাকাডেমির মতো হয়ে উঠেছিল নরেন কেবিন। আড্ডা চলত অনেক রাত পর্যন্ত। অশোক-পুলুর বিভূতি-সম্মোহন থেকে রোলাঁ-র *জাঁ ক্রিস্তফ*-এ উত্তরণ ছিল সত্যই বড়ো উদ্দীপনার। জাঁ ক্রিস্তফ তখন আমাদের অস্তিত্বের সঙ্গে মিশে গিয়েছিল। তখন অবশ্য রোলাঁ-উন্মাদনারই বয়স। বার্নাড শ ছিলেন আমাদের আর-এক দেবতা যাঁকে নিয়ে আমাদের সেদিন উচ্ছ্বাসের শেষ ছিল না। বার্নাড শ প্রসঙ্গে একদিন সন্ধ্যায় নরেন কেবিনে জোর আলোচনা চলছে। আলোচনাটা ছিল আর্ভিং স্টোনের আর বার্নাড শয়ের Lust for Life Major Barbara'-র প্রত্যয়গত বৈপরীত্য নিয়ে। কিরীটা আমার আলোচনার মাঝেমাঝে 'সংগত' করত, মাঝেমাঝে 'রেপার্টি' ছুড়ত। ওর সঙ্গে বানার্ড শ নিয়ে বেশ কথা-কাটাকাটি চলছে। হঠাৎ দেখি সেন্ট পল'স-এর ইংরেজির একজন বাঘা অধ্যাপক আমাদের দিকে থাবা বাড়িয়ে এগিয়ে এলেন—"But Bernard Shaw was equally romantic in conclusion" পুলু-অশোক তো স্তব্ধ। কিরীটী আর আমার মধ্যে যে কথা-কাটাকাটি হচ্ছিল সেটা থেমে গেল। আমরা তখন দলবদ্ধ হয়ে সেই অধ্যাপকের সঙ্গে যুদ্ধ লড়তে শুরু করলাম। ভদ্রলোক উঠে যাবার সময়ে আমাদের ফতোয়া দিয়ে গেলেন—"খুব আনন্দ হচ্ছে এসব দেখে যে, বাংলাদেশের চায়ের দোকানে এইরকম আলোচনা হয়।" আজ আর বলতে দ্বিধা নেই, সেই মান্য অধ্যাপকের নাম শিশির চট্টোপাধ্যায়। এই ছিল আমাদের আড্ডার 'অ্যাকাডেমি'। পুলু *সধবার একাদশী* দেখে এসে মজা করে বলত, আমরা গৌরমোহন আড্যের টোল থেকে এসেছি।"

আমরা ছিলাম সুহৃদ, সহযাত্রী—একই পথের পথিক। পথের লক্ষ্য ছিল জীবনসন্ধান। সাহিত্য ছিল নিয়ত স্বপ্ন। সাহিত্য ছিল অস্তিত্ব। সাহিত্য আর জীবন ছিল একার্থক। 'কল্লোল যুগ' পড়তে পড়তে আমাদের মধ্যে স্বপ্ন ঘনিয়ে আসত। সেই স্বপ্ন নিয়ে আমরা শিল্পের নানা মহলে ঘুরতাম। সাহিত্য শুধু 'mighty minds of the old'-এ বন্দি থাকেনি। তা ছড়িয়ে পড়েছে আলাউদ্দিনের বাজনায়, গোলাম আলির ঠুংরিতে, রবিশঙ্কর–বিলায়েৎ খানের রাত-জাগানিয়া দুখ-জাগানিয়া রাগে, আর শিশিরকুমারের নট-রঙ্গমের বৈভবে। সে একটা এমন বয়স যে-বয়সে আমরা নিজেদের মধ্যে অন্তহীনকে খুঁজে পেয়েছিলুম। তাই 'পথের মোড়ে' এক-একজন দেবতাকে আমরা আরতি করেছিলুম। রবীন্দ্রনাথ তো আমাদের সত্তার গভীরে। এ ছাড়া রোলাঁ–বার্নাড শ আমাদের দারুণভাবে আবিষ্ট করেছিলেন। আলাউদ্দিন খাঁ, বড়ে গোলাম আলি, অবনীন্দ্রনাথ, নন্দলাল, আর শিশিরকুমার।

বেশ মনে পড়ে শীতের রাতে রঙমহলের বাইরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আলাউদ্দিন খাঁর বাজনা শোনা। শীতের রাত। পুলু, অশোক, শ্যামল আর আমি রঙমহলের বাইরে দাঁড়িয়ে বাজনা শুনছি। চোখগুলো সব সুরের নেশায় টলমল। অনেক পরে ওদের এক বন্ধু—যতদূর

মনে পড়ে, বাবলা তার নাম—মাইহারে যখন গুরুজির শিষ্য হবার ছাড়পত্র পেল, তখন আমরা দলবেঁধে গিয়েছিলাম সে-যুগের আড়িয়াদহের আরণ্যকে। আমাদের উচ্চাঙ্গ সংগীতের টান ছিল দুরন্ত। তাই ঠনঠনের এক পুরোনো বাড়িতে রেকর্ড শুনতে যাওয়ার আমন্ত্রণ আমাদের কাছে ছিল অকাট্য। শোনা গেল, আবদুল করিম খাঁর ঠুংরির রেকর্ড আছে তাঁদের সংগ্রহে। আমাদের গানের সন্ধ্যা সেদিন পূর্ণ হয়েছিল। পুলুর জীবনতৃষ্ণা ছিল অসীম। এইসব অভিজ্ঞতার সুরবাহারে মনটাকে সেদিন সে পূর্ণ করেছিল। তাই উত্তরকালের সৃষ্টিক্ষেত্রে সংগীত যখন হল তার প্রেক্ষাপট, তার সহযোগী, তখন অভিনেতা হিসেবে তার প্রতিক্রিয়া দেখতে দেখতে মনে হত তার কৈশোর-তারুণ্যে সুর ও সংগীতকে ভালোবাসার কথা।

পুলুর গানের গলা ছিল ভারী সুন্দর। আমাদের আসরে তত্ত্বচর্চায় যখন ক্লান্তি নামত, 'যুদ্ধং দেহি' বেজে উঠত কখনো-কখনো। তখন হঠাৎ শুরু হত গান, আবৃত্তি। কোনো-কোনো সন্ধ্যায় এর-ওর বাড়িতে গিয়ে আবৃত্তির আসর বসত। পুলু আবৃত্তি করত। আমাকেও আবৃত্তি করতে হত। অশোকও যোগ দিত। শিশিরকুমারের আবৃত্তির মান ছিল আমাদের চোখের সামনে। আবৃত্তি নিয়ে আমাদের ছিল দারুণ একটা উদ্দীপনা। রেড রোড দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে আমরা আবৃত্তি করতাম। কখনো-কখনো পুলু গান গেয়ে উঠত—আমরা নূতন যৌবনেরি দূত।" এ-গানটা পুলুকে ভারী মানাত। মনে হত, দেহমন দিয়ে পুলু গানটা গাইছে। সত্যি ও ছিল 'যৌবনেরি দূত'। 'চঞ্চল', 'অদ্ভুত'। পুলু ছিল মূর্তিমান বসন্ত। আজও।

আমাদের দলের প্রত্যেকের মনোবীণায় সেদিন বেজেছিল একটি সুর—এ জীবন লইয়া কি করিব?" বঙ্কিমচন্দ্রের উনিশ বছর বয়সের এই জিজ্ঞাসা সেদিন আর-একদল উনিশকে রাঙিয়ে দিয়েছিল। সত্যি, জীবন আমাদের কাছে সেদিন অশেষ সম্ভাবনায় ভরে উঠেছিল। তাই বিশ্বসাহিত্যের পাতা থেকে আমরা তুলে এনেছি এক-একটি উপলব্ধির সংগীত। নানা সুভাষিতাবলি।

দলে একদিন আলোচনা হচ্ছিল আঁদ্রে মরোয়ার ডিসরেলির জীবনী নিয়ে। দুষ্প্রাপ্য বইটা প্রেসিডেন্সি কলেজের রেলিং থেকে আমি কয়েক আনা দিয়ে কিনে এনেছিলুম। প্রথম পাতায় একটা উদ্ধৃতি দেখে সকলে ঝাঁপিয়ে পড়ল বইটার জন্য। পুলুর মনপ্রাণ উত্তাল হয়ে উঠত, বারবার আবৃত্তি করত—"Life is too short to say little." মনে পড়ছে এইরকম আর-একটা উক্তি। লুডভিগের *Life of Napoleon* 'আমার' প্রিয় বই। আমার মানে আমাদের। একাধিকবার বইটা পড়েছি তখন। বইটার এক জায়গায় একটা দারুণ কথা আছে—What is happiness?" নেপোলিয়ান উত্তরে বলেছেন, "The highest development of my talent." এই উক্তিটি আমাদের দলে যে কী তোলপাড় তুলেছিল তা আজ আর বোঝাতে পারি না। পুলু তো খুশিতে তুমুল উচ্ছ্বাস করে উঠত। পরে সে

ভোলেনি এই উক্তি। এইসব উদ্ধৃতির কোলাজ নিয়ে উত্তরকালে তার নাটকের অনেক সংলাপ তৈরি হয়েছে *নামজীবন*, *রাজকুমার*-এর অনেক সংলাপে আমাদের সেই সময় যেন ঘুম থেকে জেগে উঠেছে। কখনো-কখনো শীতের রোদ ভেঙে আমরা চলে যেতাম অ্যাকাডেমির চত্বরে। নন্দলাল বসুর ছবির প্রদর্শনী। গোপাল ঘোষের রেখাচিত্র। এসব প্রদর্শনী দেখায় ছিল আমাদের তীব্র উৎসাহ। কিরীটী আর পুলুর খাতা ভরে থাকত নানা আঁকিবুকিতে। অলস মনের খেলায় সুন্দর-সুন্দর ছবি আঁকত পুলু। বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলার ক্লাস করতে করতে তার ভাবী থিয়েটারের নানা স্কেচ বয়ে আনত তার আসন্ন স্বপ্নের দিন, স্বপ্নের রাত।

এসবের মধ্যে দিয়ে একটা কথা তখন জীবন্ত হয়ে উঠেছিল আমাদের কাছে। তা হচ্ছে জীবনায়ন—art of living। আমরা জীবনকে তীব্রভাবে অনুভব করতে চেয়েছিলুম—the agony and ecstasy। এইজন্য আর্ভিং স্টোনের *Lust for Life, The Agony and Ecstasy* বইগুলো ছিল আমাদের মণিকোঠায়। সমস্ত ব্যাপারটা ছিল 'a great movement of feeling'। তাই professionalism-এর স্পর্শ রহিত ছিল বলেই আমরা চটজলদি-সাময়িকী লেখালেখির থেকে না-লেখায় বেশি বিশ্বাসী হয়ে পড়েছিলাম। সমাজতত্ত্বের 'বইতে দেখেছি, professionalism বন্ধ্যা। এই ব্যাপারটা আমাকে ও কিরীটিকে পেয়ে বসেছিল। অশোক-শ্যামলও চলেছিল এই পথে। কিন্তু পুলু ছিল স্বতন্ত্র। সে 'চরৈবেতি'-তে বিশ্বাসী ছিল বলেই সৃষ্টিপ্রাচুর্যে সে এতখানি নিজেকে উজাড় করে দিয়েছিল। এই মন্ত্র পেয়েছিল তার স্বভাবের গভীর অর্ন্তদৃষ্টি থেকে।

ছবি-গান-সাহিত্যের সম্ভার নিয়ে একদিন আমরা গিয়ে উঠলাম শিশিরকুমারের শ্রীরঙ্গমে। সে আর-এক উপলব্ধি। আর-এক উৎসবের সন্ধ্যা। আর-এক সমারোহ।

শিশিরকুমারের তখন অপরাহ্ণবেলা। আমরা ভাগ্যবান। সেদিন গিয়ে উঠেছিলাম শ্রীরঙ্গমের দর্শক-গ্যালারিতে। *সীতা*, *আলমগীর*, *ষোড়শী*, *জীবনরঙ্গ*, *সধবার একাদশী*, *চন্দ্রগুপ্ত*, *সাজাহান* দেখতে যাওয়ার আনন্দ পুলুকে, সঙ্গীদের পৌঁছে দিতে না-পারলে তো জীবন অসম্পূর্ণ! তাই ওদের নিয়ে ধাওয়া করলাম শ্রীরঙ্গম। নির্জন অভিমানের মতো শ্রীরঙ্গমের বাড়িটা তখন মেদুর, কিন্তু ভেতরে তখন কী যে উৎসবের সমারোহ! কী অপূর্ব অভিনয়! অন্ধকার প্রেক্ষাগৃহে বসে আমাদের সে কী শিহরণ, অনুভূতির উন্মাদনা! হলে আমার দু-পাশে বসত দুজন—পুলু আর অশোক। কখনো-কখনো সারবেঁধে পাঁচজন। অশোক, পুলু, শ্যামল, কিরীটী, নির্মাল্য। প্রবীর বা লালু। অভিনয় শেষে বাইরে বেরিয়ে এসে কত আলোচনা! সেদিন থেকে শুরু হয়েছিল পুলুর উত্তরজীবনের প্রস্তুতি। শ্রীরঙ্গমের 'বিশ্ববিদ্যালয়' থেকে অভিনয়ের পাঠপ্রস্তুতি নিয়ে পুলু যে নিজেকে গড়ে তুলেছে, সেটা

তার প্রাণশক্তিরই পরিচয়। পুলু ছিল প্রাণবান, উচ্ছল। নানা ব্যাপারে শিশিরকুমার তখন আমাদের কাছে জাতীয় বিবেকের প্রতীক। আমরা তখন তাঁকে কেবল শ্রেষ্ঠ অভিনেতা বলে মনে করিনি, মনে করেছিলুম বাঙালির জাতীয় চেতনার প্রতিভূ হিসেবে। তাঁর ব্যক্তিত্ব, তাঁর সংগ্রামী মন—সবই হয়ে উঠেছিল আমাদের কাছে আদর্শ। আমরা তখন শিশির-তন্ময়। কল্লোল যুগের অচিন্ত্যকুমারের ভাষায়, তখন আমরা এই 'শিল্পাদিত্য'-র দ্যুতিতে দীপ্ত। পুলু এই আদর্শকে জীবনে প্রোথিত করেছিল। শিশির-দীক্ষা তার জীবনে হয়ে গেল নিয়তির এক অদৃশ্য নির্দেশিকা। শিল্পী হিসেবে যে-সংস্কৃতি, স্বাতন্ত্র্যের জন্য সে আজ সমগ্র দেশবাসীর কাছে শ্রদ্ধেয়, সেই যে বিবেকের দীক্ষা, সেদিন সে পেয়েছিল শিশির-সান্নিধ্যে।

পুলুর কথা ভাবতে বসলে আমার পল ভ্যালেরি-র একটা কবিতার কথা মনে হয়। কবিতাটির নাম 'Palme'। ভ্যালেরি-র পামগাছের মতো পুলু জীবনের নানা পরিবেশ থেকে তার রসদ সংগ্রহ করে একদিন ফুলে-পাতায় বিকশিত হয়েছে। জীবনের সব ক্ষেত্র থেকে, সব অবস্থা থেকেই সে পাঠ নিয়েছে। তারপর তাকে সৃষ্টির ঐশ্বর্যে প্রকাশ করেছে। তা দেখে দেশবাসী আজ মুগ্ধ। আর ব্যক্তিগতভাবে আমিও তৃপ্ত এবং গর্বিত।

মনে হয় যেন সেদিনের কথা

অদ্রীশ বর্ধন

তখন 'সায়ান্স-ফিকশন সিনে ক্লাব' উদ্বোধনের তোড়জোড় চলছে। বিশ্বের প্রথম শুধু-কল্পবিজ্ঞান-নিয়ে ফিল্ম সোসাইটি। আইডিয়াটা আমিই দিয়েছিলাম মানিকদা-কে (সত্যজিৎ রায়), ভারতের একমাত্র কল্পবিজ্ঞানের মাসিক পত্রিকা *আশ্চর্য*!-র প্রচার আর বিক্রি বাড়ানোর জন্যে।

ফিল্ম সোসাইটির লোগো-টা উনিই এঁকে দিচ্ছিলেন এক সন্ধ্যায় ঘরোয়া বৈঠকে বসে, তিন নম্বর লেক টেম্পল রোডের বাড়িতে। মুখোমুখি-পাতা সোফায় বসে সত্যজিৎ রায়, জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায়, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, বৌদি (মানিকদার স্ত্রী), আর আমি।

জোর গুলতানি চলছে রকমারি বিষয় নিয়ে। মানিকদা খুব রসিক ছিলেন, যদিও বাইরে রাশভারী থাকতেন। মেপে-মেপে কথা বলতেন। সেদিনের সান্ধ্য আড্ডায় উনি কিন্তু এক্কেবারে প্রাণখোলা। হাতে কলম, চোখ কাগজের দিকে, মুখে সরস কথা।

হঠাৎ বললেন সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়কে—"বলো তো, ওয়ার্ল্ডে-র ব্ল্যাকেস্ট ম্যান কে?"

সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় মুখ খোলবার আগেই ঝটিতি জবাব দিয়ে দিলেন জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায় নিজেই—"আমি!"

অতঃপর হাসি-বোমার বিস্ফোরণ!

সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের সেই প্রাণখোলা হাসির দৃশ্য আজও চোখের সামনে ভাসছে। হাসি অত সুন্দর বলেই মানুষটা অত স্ফটিক-স্বচ্ছ। অভিনয়কে অভিনয় বলে মনে করান না। পর্দায় এরপর যখনই তাঁর হাসি দেখেছি, ঘরোয়া আড্ডায় সেই ভেতর-থেকে-উৎসারিত হাসিটা স্মৃতির পর্দায় ভেসে ওঠে। মজলিশি হাসি কাকে বলে, সেই সন্ধ্যায় উনি যেমন দেখিয়েছিলেন, পরে অনেক ছায়াছবিতেও উনি সেই প্রাণখোলা হাসি হেসে গেছেন। অভিনয় বলে একেবারেই মনে হয়নি। যতবার সেই হাসি দেখি ততবার মনে পড়ে যায় গম্ভীর মুখে গম্ভীর গলায় মানিকদার সেই আড্ডা জমানোর সরস প্রশ্ন, মনে পড়ে যায় ঈশ্বরদত্ত গুণে ক্ষমতাবান সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের হাসি-ঝলকিত মুখাবয়ব, পরক্ষণেই সবাই মিলে অট্টহাসির অট্টরোল।

এরপরেও, সায়ান্স-ফিকশন সিনে ক্লাবের উদ্বোধন-দিবস সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের উপস্থিতিতে সমুজ্জ্বল থেকেছে।

বড়ো নিরহঙ্কার মানুষ ইনি। প্রাণবন্ত পুরুষ। জহুরি জহর চেনে, বেগুনওলা বেগুন।

জহুরি সত্যজিৎ রায় সঠিক রত্নকে চিনেছিলেন। তাই, আজও তিনি অপ্রতিদ্বন্দ্বী সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়।

একাধারে ডগলাস ফেয়ারব্যাঙ্ক, মার্লোন ব্র্যান্ডো, এরল ফ্লিন, জেমস স্টুয়ার্ট।

সবার সঙ্গে মিশে চলেন, অথচ মাথা উঁচু রাখেন। মুখে হাসি, সর্বদা।

সৌমিত্র-চিত্র

পারিবারিক অ্যালবাম

পরিবারের সকলের সঙ্গে ছোট্ট সৌমিত্র (দ্বিতীয় সারিতে বাঁদিক থেকে দ্বিতীয়), বাবা (প্রথম সারিতে তৃতীয়) ও মা (দ্বিতীয় সারিতে একেবারে ডানদিকে বসে)

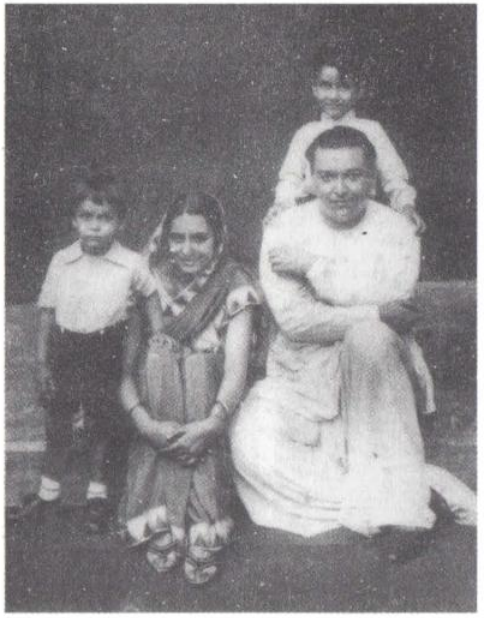

বাবা-মায়ের সঙ্গে সৌমিত্র (বাঁদিকে দাঁড়িয়ে) ও সম্বিৎকুমার (বাবার পিছনে দাঁড়িয়ে)

নাটকের অ্যালবাম

মঞ্চে নায়িকা লিলি চক্রবর্ত্তীর সঙ্গে নায়ক সৌমিত্র

নীলকণ্ঠ নাটকে সৌমিত্র ও পৌলমী

ঘটক বিদায় নাটকে রবি ঘোষ (বাঁদিকে) ও কৌশিক সেনের সঙ্গে সৌমিত্র

চন্দনপুরের চোর নাটকে সোমা দে (চেয়ারের পিছনে দাঁড়িয়ে) ও অন্যান্যদের সঙ্গে চোরের বেশে সৌমিত্র [একেবারে ডানদিকে লাঠি হাতে দাঁড়িয়ে]

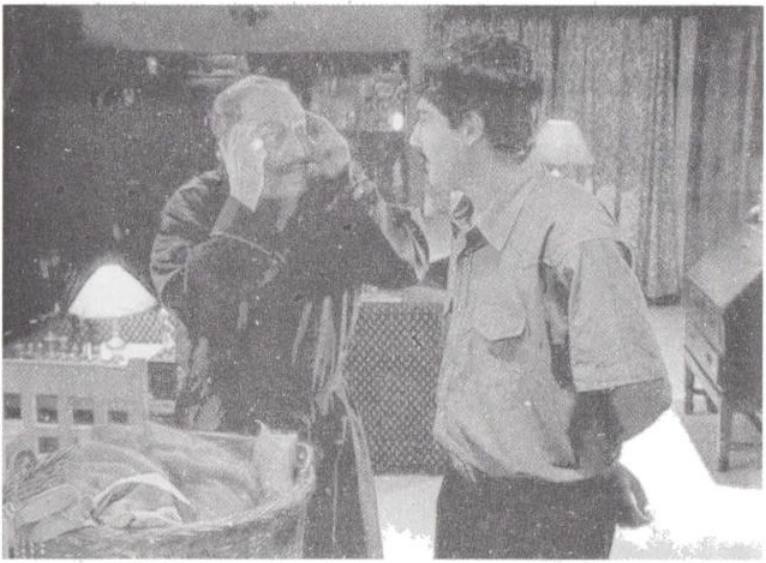

টিকটিকি নাটকে কৌশিক সেনের সঙ্গে সৌমিত্র

হোমাপাখি নাটকে পৌলমী ও সৌমিত্র

তৃতীয় অঙ্ক, অতএব নাটকে পৌলমী ও দ্বিজেন বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে সৌমিত্র

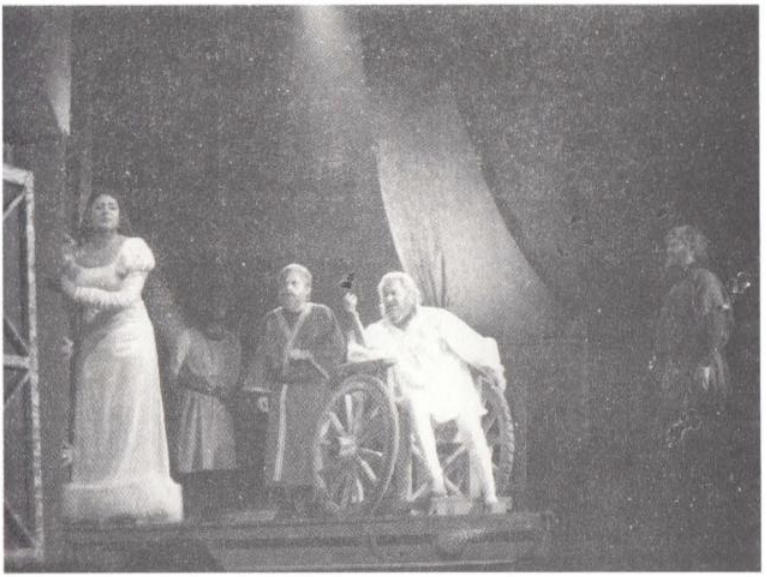

রাজা লিয়ার নাটকে বিমল চক্রবর্তী (একেবারে ডানদিকে) ও অন্যান্যদের সঙ্গে সৌমিত্র

সৌমিত্র-তথ্য

চট্টোপাধ্যায় পরিবারের বংশপঞ্জি

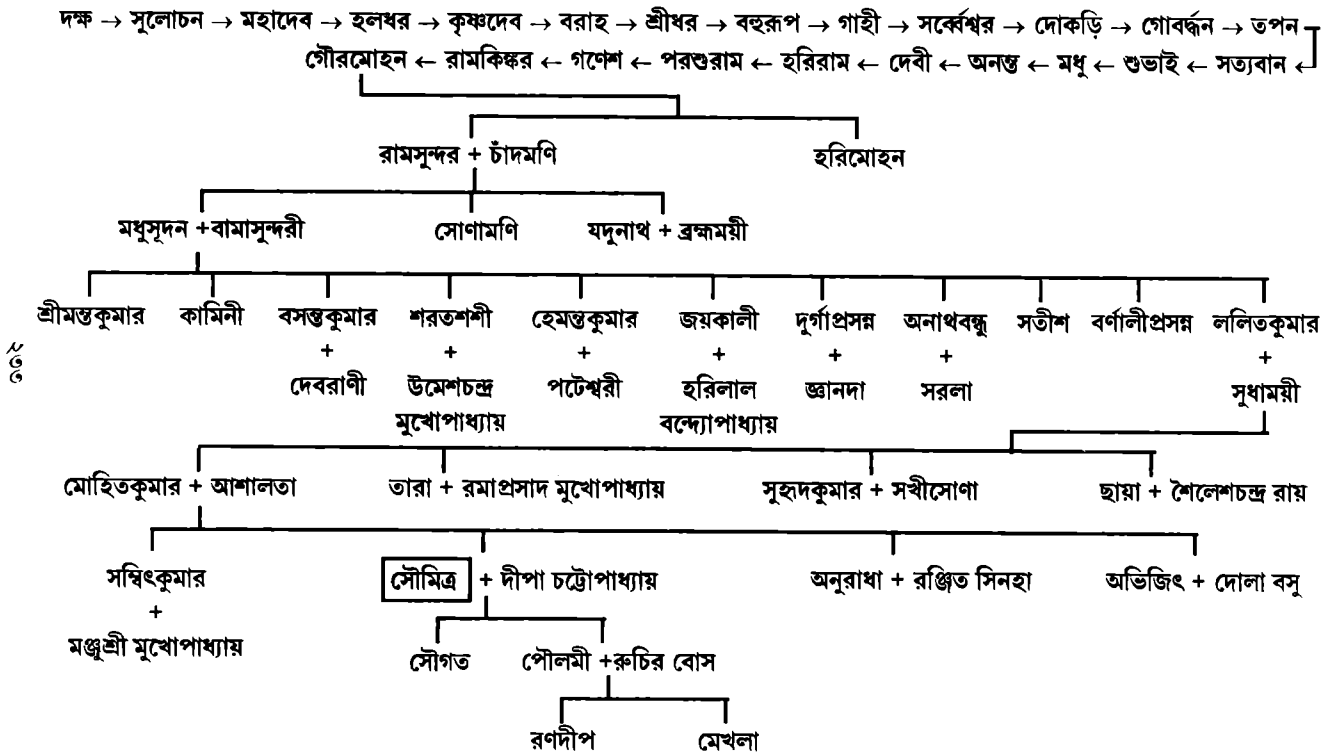

চট্টোপাধ্যায় পরিবারের আরও কয়েকজন বিখ্যাত মানুষের পরিচয়:

১। সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের পিতামহী সুধাময়ী দেবী ছিলেন তৎকালীন বাংলার বিখ্যাত সমাজসংস্কারক, শিক্ষাবিদ ও সাহিত্যসেবী যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ (১৮৪৫–১৯০৪)-এর কন্যা। সুধাময়ী দেবীর মাতামহী (অর্থাৎ যোগেন্দ্রনাথের শ্বশুরমশায়) ছিলেন সে-যুগের আর-এক বিখ্যাত শিক্ষাবিদ ও সমাজসংস্কারক পণ্ডিত মদনমোহন তর্কালঙ্কার (১৮১৭–১৮৫৮)। এঁরা ছিলেন যথাক্রমে পণ্ডিত বিদ্যাসাগরের সহযোগী ও সহপাঠী।

২। সৌমিত্রবাবুর পিতামহ ললিতকুমার চট্টোপাধ্যায়ের দিদি শরতশশী* দেবী ছিলেন ভারতবর্ষের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিপ্লবী শহিদ জ্যোতিন্দ্রনাথ† মুখোপাধ্যায় (১৮৭৯–১৯১৫), যিনি 'বাঘাযতীন' নামেই বেশি পরিচিত। সেইসূত্রে বাঘাযতীন ছিলেন সৌমিত্রবাবুর পিসতুতো জ্যাঠামশায়।

৩। সৌমিত্রবাবুর বড়োপিসি তারা দেবী ছিলেন বাংলার বাঘ স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় (১৮৬৪–১৯২৪)-এর পুত্রবধূ। এই কারণে বিচারপতি রমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় (১৮৯৬–১৯৮৪) ছিলেন সৌমিত্রবাবুর বড়োপিসেমশায় এবং বিচারপতি চিত্ততোষ মুখোপাধ্যায় (জ. ১৯২৯) হলেন তাঁর পিসতুতো দাদা।

৪। সাহিত্যিক সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় (১৮৮৪–১৯৬৬) ছিলেন সৌমিত্র-জননী আশালতা দেবীর নিজের পিসেমশায়। সৌরীন্দ্রমোহন-তনয়া বিখ্যাত রবীন্দ্রসংগীতশিল্পী সুচিত্রা মিত্র (১৯২৪–২০১১) ছিলেন সৌমিত্রবাবুর ছোটোমাসি। সৌরীন্দ্রমোহনের অন্য-এক জামাতা আইনজীবী স্নেহাংশুকান্ত আচার্য (১৯১৩–১৯৮৬) ছিলেন সৌমিত্রবাবুর মেসোমশায়।

৫। ভারতের বিখ্যাত ফ্যাশন সুপারমডেল নয়নিকা চট্টোপাধ্যায় হলেন সৌমিত্রবাবুর দাদা সম্বিৎকুমারের কন্যা এবং সেই কারণে সৌমিত্রবাবুর ভাইঝি।

* ললিতবাবু তাঁর বইয়ে নিজের দিদির নামের এই বানানই ব্যবহার করেছেন।

† পরবর্তীকালে 'যতীন্দ্রনাথ' বানানটি ভুলবশত প্রচলিত হলেও তিনি কিন্তু নিজের নামের বানান 'জ্যোতিন্দ্রনাথ'-ই লিখতেন।

তথ্যসূত্র:

ললিতকুমার চট্টোপাধ্যায়, *পারিবারিক কথা* (কৃষ্ণনগর: সরস্বতী প্রেস, ১৯৪৭)

সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের একটি প্রায়-সম্পূর্ণ নাট্যপঞ্জি

অনির্বাণ দে

সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের ভাষায়, "থিয়েটার এক এবং অদ্বিতীয়।" সাধারণ রঙ্গালয় (public theatre) ও গ্রুপ থিয়েটার (group theatre)-এর প্রচলিত লড়াইয়ে শামিল হতে নারাজ তিনি। বরং অন্য-এক লড়াইয়ের অক্লান্ত সৈনিক তিনি। সাধারণ রঙ্গালয়কেও তিনি যেমন মুক্তি দিয়েছিলেন নিম্নরুচির অর্থগৃধ্নুতার অভিশাপ থেকে, তেমনই গ্রুপ থিয়েটারকেও তার হাস্যকর উন্নসিকতা থেকে মুক্ত করে আপামর দর্শকের কাছে আকর্ষণীয় ও গ্রহণযোগ্য করে তুলেছেন। বিশেষ কোনো ধরনের থিয়েটারকে 'ব্যাবসায়িক' বা 'বাণিজ্যিক' ('commercial') কিংবা বিশেষ কোনো থিয়েটারকে 'শৈল্পিক' ('artistic') বা 'অবাণিজ্যিক' ('noncommercial') বা 'সমান্তরাল' ('parallel') ইত্যাদি তকমা দেওয়ার ঘোরতর বিরোধী সৌমিত্র। তাঁর মতে, পাড়া-অফিস-ক্লাবে অনুষ্ঠিত শখের থিয়েটার (amateur theatre) বাদ দিলে যা পড়ে থাকে তার সবটাই হল পেশাদার থিয়েটার (professional theatre)। আর থিয়েটারকে প্রকৃত অর্থে পেশাদার হতে গেলে তার মধ্যে যেমন শিল্পের কিছু ঘাটতি থাকলে চলবে না, তেমন তাকে টিকিট বিক্রি করে ব্যাবসাও করতে হবে। এই পেশাদার থিয়েটারের আঙ্গিক বা আকার (form), বিষয় (subject), ইত্যাদির রকমফের থাকতেই পারে, কিন্তু কখনোই তা থিয়েটারের বিভাজন-তত্ত্বকে সমর্থন করে না। পরবর্তী পৃষ্ঠাগুলিতে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের যে-নাট্যতালিকা প্রস্তুত করা হল সেগুলিতেও আমরা তাই এই ধরনের কোনো বিভাজন করার চেষ্টা করিনি, শুধু যথাসম্ভব কালানুক্রমিকভাবে নাটকগুলিকে সাজানো হয়েছে। মঞ্চে তাঁর রচিত, অভিনীত ও নির্দেশিত নাটকগুলির মধ্যে তিন-দিক-খোলা মঞ্চের নাটক ('one-wall theatre' নামে যা জনপ্রিয়), অভিনেতৃ সংঘের শিল্পীদের নিয়ে চলচ্চিত্রকাহিনি-অবলম্বনে অভিনীত বিভিন্ন আমন্ত্রণমূলক নাটক, ইত্যাদিও স্থান পেয়েছে। মঞ্চে অভিনীত নাটক ছাড়াও বেতার-নাটক, শ্রুতিনাটক, নাট্যপাঠ, পুতুলনাটকে নেপথ্য কণ্ঠদান, ইত্যাদি যাবতীয় নাটকসংক্রান্ত তথ্য এখানে সংকলিত হয়েছে। সৌমিত্র-রচিত যেসব নাটক এখনও মঞ্চস্থ হয়নি সেগুলির তালিকাও দেওয়া হয়েছে। তবে এখানে চলচ্চিত্রবিষয়ক তথ্যাবলি সচেতনভাবেই বাদ রাখা হয়েছে। কালানুক্রমিক তালিকা প্রস্তুত করতে গিয়ে অনেক ক্ষেত্রেই সাল-তারিখের সঠিক তথ্যাদি পাওয়া যায়নি। তাই এই নাট্যপঞ্জিকে আমরা সম্পূর্ণ বলে দাবি করছি না। বরং এই 'প্রায়-সম্পূর্ণ' নাট্যপঞ্জি আগামী দিনের সৌমিত্র-গবেষকদের সহায়তা করবে সম্পূর্ণতর তালিকানির্মাণে—এটুকুই আমাদের আশা। এই তো এখনও মঞ্চ দাপিয়ে বেড়াচ্ছেন রাজা লিয়ার। একদিনে রাজকুমারের রাজ্যাভিষেক হল। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় যথার্থই বলেছেন—"সৌমিত্র এখন বাংলা মঞ্চের রাজা।"

সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের নির্দেশিত ও অভিনীত মঞ্চনাটকের তালিকা

নাটক	নাট্যকার/ অনুবাদক	মূল নাটক/ কাহিনি	মূল নাট্যকার/ কাহিনিকার	প্রথম অভিনয়ের তারিখ ও মঞ্চ	প্রযোজক	নির্দেশক	সৌমিত্রবাবুর ভূমিকা
প্রফুল্ল (১৮৮৯)	গিরিশচন্দ্র ঘোষ	—	—	২৭ মার্চ ১৯৫৭; বঙ্গসংস্কৃতি সম্মেলন মঞ্চ, মার্কাস স্কোয়ার	?	নাট্যাচার্য শিশিরকুমার ভাদুড়ী	অভিনয় (চরিত্র: সুরেশ)
তাপসী	দেবনারায়ণ গুপ্ত	—	নীহাররঞ্জন গুপ্ত	১৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৩; স্টার মঞ্চ	স্টার থিয়েটার	দেবনারায়ণ গুপ্ত	অভিনয় (চরিত্র: দীপক)
শেষরক্ষা (১৯২৮)	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	—	—	৩০ এপ্রিল ১৯৬৮; রঙমহল মঞ্চ	অভিনেতৃ সংঘ	অনুপকুমার	অভিনয়
অন্ধযুগ	প্রণতি বন্দ্যোপাধ্যায়	*অন্ধা যুগ* (১৯৫৪)	ধর্মবীর ভারতী	৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৭১; রঙ্গনা মঞ্চ	অভিনেতৃ সংঘ	অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়	অভিনয় (চরিত্র: অশ্বত্থামা)
বিধি ও ব্যতিক্রম	সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়	*The Exception and the Rule* (1936) [জার্মান নাম: *Die Ausnahme and die Regel*]	Bertolt Brecht	জুন ১৯৭২; মুক্ত অঙ্গন মঞ্চ	প্রতিকৃতি	সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়	নাটক (রূপান্তর) ও নির্দেশনা
শ্রীহরি সহায়	রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত	—	Alan Alexander Milne	জুন ১৯৭২; মুক্ত অঙ্গন মঞ্চ	প্রতিকৃতি	সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়	নির্দেশনা

নাটক	নাট্যকার/ অনুবাদক	মূল নাটক/ কাহিনি	মূল নাট্যকার/ কাহিনিকার	প্রথম অভিনয়ের তারিখ ও মঞ্চ	প্রয়োজক	নির্দেশক	সৌমিত্রবাবুর ভূমিকা
বিদেহী	ধনঞ্জয় বৈরাগী	—	—	২৭ আগস্ট ১৯৭২; রবীন্দ্রসদন মঞ্চ	অভিনেতৃ সংঘ	?	অভিনয়
রাজকুমার	সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়	*The Big Knife*	*Clifford odets*	৪ ডিসেম্বর ১৯৭৩; রবীন্দ্রসদন মঞ্চ	অভিনেতৃ সংঘ	সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়	নাটক (রূপান্তর) নির্দেশনা সঙ্গীতঅভিনয় (চরিত্র: চিত্রতারকা রাজকুমার মুখোপাধ্যায়)
বিদেহী	সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়	*Ghosts* (1881)	Henrik Ibsen	৭ ডিসেম্বর ১৯৭৩; রবীন্দ্রসদন মঞ্চ	অভিনেতৃ সংঘ	সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়	নাটক (অনুবাদ) নির্দেশনা, সংগীত ও অভিনয় (চরিত্র: ওসওয়াল্ড)
ক্রুশবিদ্ধ কুবা (১৯৬৭)	উৎপল দত্ত	—	—	১০ ডিসেম্বর ১৯৭৩; রবীন্দ্রসদন মঞ্চ	অভিনেতৃ সংঘ	উৎপল দত্ত	অভিনয় (চরিত্র: ইবানেজ)

নাটক	নাট্যকার/ অনুবাদক	মূল নাটক/ কাহিনি	মূল নাট্যকার/ কাহিনিকার	প্রথম অভিনয়ের তারিখ ও মঞ্চ	প্রয়োজক	নির্দেশক	সৌমিত্রবাবুর ভূমিকা
হারিয়ে পাওয়া	গৌতম বসু	—	—	?	?	নির্মল ঘোষ	অভিনয়
ছোটো বকুলপুরের যাত্রী	মিহির চৌধুরী	*ছোটো বকুলপুরের যাত্রী*	মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়	১ অক্টোবর ১৯৭৪; মুক্ত অঙ্গন মঞ্চ	প্রতিকৃতি	সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়	নির্দেশনা
হিমালয়ে জীবন্ত মানুষ	উৎপল দত্ত	—	—	১ অক্টোবর ১৯৭৪; মুক্ত অঙ্গন মঞ্চ	প্রতিকৃতি	সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়	নির্দেশনা
রাজকুমার (১৯৭৫)	সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়	*The Big Knife*	Clifford Odets	১৯৭৪; স্টার মঞ্চ	স্টার থিয়েটার	সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়	নাটক (রূপান্তর), নির্দেশনা, সংগীত ও অভিনয় (চরিত্র: চিত্রতারকা রাজকুমার মুখোপাধ্যায়)
বিশে জুন	বীরু মুখোপাধ্যায়	?	?	২৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৫; রবীন্দ্রসদন মঞ্চ	অভিনেতৃ সংঘ	জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায়	অভিনয় (চরিত্র: জুলিয়াস রোজেনবার্গ)
নাম জীবন	দীপা ও সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়	*Moon on a Rainbow Shawl* (1958)	Errol Hohn	২১ ডিসেম্বর ১৯৭৮; কাশী বিশ্বনাথ মঞ্চ	কাশী বিশ্বনাথ মঞ্চ	সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়	নির্দেশনা ও অভিনয় (চরিত্র: বিশ্ব

নাটক	নাট্যকার/ অনুবাদক	মূল নাটক/ কাহিনি	মূল নাট্যকার/ কাহিনিকার	প্রথম অভিনয়ের তারিখ ও মঞ্চ	প্রয়োজক	নির্দেশক	সৌমিত্রবাবুর ভূমিকা
রাজকুমার	সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়	*The Big Knife*	Clifford odets	১ অক্টো ১৯৮৩; কাশী বিশ্বনাথ মঞ্চ	কাশী বিশ্বনাথ মঞ্চ	সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়	নাটক (রূপান্তর) নির্দেশনা, সংগীত ও অভিনয় (চরিত্র: অভিনেতা রাজকুমার মুখোপাধ্যায়)
ওরা থাকে ওধারে	?	ওরা থাকে ওধারে	প্রেমেন্দ্র মিত্র	?	ক্যালকাটা ক্লাব	সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়	নির্দেশনা
রত্নদীপ	সমীর মজুমদার	রত্নদীপ	প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়	১৪ নভেম্বর ১৯৮৪; মহাজাতি সদন মঞ্চ	পরমা এন্টার-প্রাইজ	সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়	নির্দেশনা ও অভিনয়
দুর্গেশনন্দিনী	গিরিশচন্দ্র ঘোষ	*দুর্গেশনন্দিনী* (১৮৬৫)	বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	?	?	সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়	নির্দেশনা ও অভিনয়
নাম জীবন	দীপা ও সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়	*Moon on a Rainbow Shawl* (1958)	Errol Hohn	১ মে ১৯৮৬; যোগেশ মাইম অ্যাকাডেমি মঞ্চ	অনুপকুমার	সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়	নির্দেশনা ও অভিনয়
শ্রীযুক্ত বাবুমশাই	বীরু ও সৌমিত্র মুখোপাধ্যায়	*বাবুমশাই*	?	?	?	সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়	নির্দেশনা ও অভিনয়

নাটক	নাট্যকার/ অনুবাদক	মূল নাটক/ কাহিনি	মূল নাট্যকার/ কাহিনিকার	প্রথম অভিনয়ের তারিখ ও মঞ্চ	প্রয়োজক	নির্দেশক	সৌমিত্রবাবুর ভূমিকা
ঝিন্দের বন্দী	শ্যামল সেন	*ঝিন্দের বন্দী*	শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়	?	?	সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়	নির্দেশনা ও দ্বৈতঅভিনয় (চরিত্র: শঙ্কর সিংহ ও গৌরীশঙ্কর রায়)
নরক গুলজার	মনোজ মিত্র	—	—	?	?	বিভাস চক্রবর্তী	অভিনয়
হীরালাল পান্নালাল	উৎপল রায়	—	—	?	?	নির্মল ঘোষ	অভিনয়
জীবনসারথী	উৎপল রায়	—	—	?	?	উৎপল রায়	অভিনয়
হারজিত	গৌতম বসু	—	—	?	?	কৌশিক সেন	অভিনয়
মুক্তির উপায় (১৯৪৮)	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	—	—	?	অভিনেতৃ সংঘ	অনুপকুমার	অভিনয়
পুনর্জন্ম	দ্বিজেন্দ্রলাল রায়	—	—	?	অভিনেতৃ সংঘ	অনুপকুমার	অভিনয়
ফেরা	সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়	*The Visit* (1956) [জার্মান নাম: *Die Besuch der alten Dame*]	Friedrich Durrenmatt	২২ জানুয়ারি ১৯৮৭; বিশ্বরূপা থিয়েটার সংগীত	বিশ্বরূপা থিয়েটার	সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়	নাটক (রূপান্তর) নির্দেশনা, অভিনয় (চরিত্র: কাশীনাথ)

নাটক	নাট্যকার/ অনুবাদক	মূল নাটক/ কাহিনি	মূল নাট্যকার/ কাহিনিকার	প্রথম অভিনয়ের তারিখ ও মঞ্চ	প্রয়োজক	নির্দেশক	সৌমিত্রবাবুর ভূমিকা
নীলকণ্ঠ	সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়	*A Poor Gentleman* (1848)	Ivan Sergeeich Turgenev	১৫ জুলাই ১৯৮৮; রঙমহল থিয়েটার মঞ্চ	রঙমহল থিয়েটার	সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়	নাটক (রূপান্তর), নির্দেশনা, সংগীত ও অভিনয় (চরিত্র: নীলকণ্ঠ)
ঘটক বিদায়	সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়	*The Matchmaker* (1954)	Thornton Niven Wilder	৯ সেপ্টেম্বর ১৯৯০; স্টার থিয়েটার মঞ্চ	স্টার থিয়েটার	সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়	নাটক (রূপান্তর) নির্দেশনা, সংগীত ও অভিনয় (চরিত্র: আড়তদার দামোদর সিংহ), গ্রন্থগীত
দর্পন শরৎশশী	মনোজ মিত্র	—	—	২৬ নভেম্বর ১৯৯২; তপন থিয়েটার মঞ্চ	নিভা আর্ট্স	সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়	নির্দেশনা, সংগীত ও অভিনয় (চরিত্র: নট সিতিকণ্ঠ)
যদুবংশ	সমীর লাহিড়ী	*যদুবংশ*	বিমল কর	২৯ মে ১৯৯৩; অ্যাকাডেমি অব ফাইন আর্ট্স	স্বপ্নসন্ধানী	কৌশিক সেন	
চন্দনপুরের চোর	সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়	*Thieves' Carnival* (1938)	Jean Marie Lucien Pierre Anouilh	১৫ আগস্ট ১৯৯৪; বিজন থিয়েটার মঞ্চ	?	সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়	নাটক (রূপান্তর), নির্দেশনা, সংগীত গীতচরনা ও আহব অভিনয় (চরিত্র: চোর হারান)

নাটক	নাট্যকার/ অনুবাদক	মূল নাটক/ কাহিনি	মূল নাট্যকার/ কাহিনিকার	প্রথম অভিনয়ের তারিখ ও মঞ্চ	প্রয়োজক	নির্দেশক	সৌমিত্রবাবুর ভূমিকা
প্রতীক্ষা	গৌতম বসু	—	—	বিজন থিয়েটার মঞ্চ	বিজন থিয়েটার	কৌশিক সেন	অভিনয় (চরিত্র: মাস্টারমশাই)
টিকটিকি	সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়	*Sleuth* (1970)	Anthony Joshua 'Tony' (1962-2001)	২৯ মে ১৯৯৫; অ্যাকাডেমি অব ফাইন আর্ট্স মঞ্চ	স্বপ্ন সন্ধানী	সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়	নাটক (রূপান্তর), নির্দেশনা, মঞ্চ, সংগীত ও অভিনয় (চরিত্র: সত্যসিন্ধু চৌধুরী)
ন্যায়মূর্তি	সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়	—	—	১৯৯৬; বিশ্বরূপা থিয়েটার মঞ্চ	বিশ্বরূপা থিয়েটার	সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়	নাটক (রচনা), নির্দেশনা ও অভিনয়
বিল্বমঙ্গল ঠাকুর	গিরিশচন্দ্র ঘোষ	—	—	জুন ১৯৯৭; রঙ্গনা থিয়েটার	রঙ্গনা	সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়	নির্দেশনা ও অভিনয়
প্রাণতপস্যা (১৯৯৯)	সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়	*Life support* (1997)	Simon James Holliday Gray	১৯৯৮; রবীন্দ্রসদন মঞ্চ	আধুনিক নাট্যসংস্থা	সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়	নাটক (রূপান্তর), নির্দেশনা ও অভিনয় (চরিত্র: অলকেন্দু বোস)
নীলকণ্ঠ	সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়	*A Poor Gentleman* (1848)	Ivan Sergeevich Turgenev	১৪ এপ্রিল ২০০০; গিরিশ মঞ্চ	আয়ন্দা	সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়	নাটক (রূপান্তর), নির্দেশনা, সংগীত ও অভিনয় (চরিত্র: লাহিড়ী)

নাটক	নাট্যকার/ অনুবাদক	মূল নাটক/ কাহিনি	মূল নাট্যকার/ কাহিনিকার	প্রথম অভিনয়ের তারিখ ও মঞ্চ	প্রয়োজক	নির্দেশক	সৌমিত্রবাবুর ভূমিকা
আর একটি দিন (২০০৪)	সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়	*One Day More* (1904)	Joseph Conrad	২০০২; ?	আয়ন্দা	সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়	নাটক (রূপান্তর), নির্দেশনা ও অভিনয় (চরিত্র: শরৎ
কুরবানি (২০০৪)	সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়	*Report from Contreros* (1962)	Michael Dines	২০০৩; ?	আয়ন্দা	সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়	নাটক (রূপান্তর), নির্দেশনা ও অভিনয় (চরিত্র: সুবিনয় মুস্তাফি)
প্রাণতপস্যা (১৯৯১)	*Life support* (1997)	Simon James Holliday Gray	১৯৯৮; রবীন্দ্রসদন মঞ্চ	মুখোমুখি	?	সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়	নাটক (রূপান্তর), নির্দেশনা ও অভিনয় (চরিত্র: অলকেন্দু বোস)
আরোহণ (১৯৯৪)	সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়	*The little Foxes* (1939)	Lillian Hellman	২০০৪; ?	মুখোমুখি	সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়	নাটক (রূপান্তর), নির্দেশনা ও অভিনয় (চরিত্র: অমিতাভ গুহ)
হোমাপাখি	অমিত রঞ্জন বিশ্বাস	—	—	২০০৬; ?	সিনেটেল ও নিভা আর্ট্‌স	সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়	নির্দেশনা ও অভিনয় (চরিত্র: অধ্যাপক নিরঞ্জন)

নাটক	নাট্যকার/ অনুবাদক	মূল নাটক/ কাহিনি	মূল নাট্যকার/ কাহিনিকার	প্রথম অভিনয়ের তারিখ ও মঞ্চ	প্রয়োজক	নির্দেশক	সৌমিত্রবাবুর ভূমিকা
আত্মকথা	সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়	*Auto-biography* (1988) [মারাঠি নাম: *আত্মকথা*]	Mahesh Elkunchwar	২০০৮; তপন থিয়েটার মঞ্চ	মুখোমুখি ও নিভা আর্ট্স	সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়	নাটক (রূপান্তর), নির্দেশনা ও অভিনয় (চরিত্র: সাহিত্যিক শুভঙ্কর)
তৃতীয় অঙ্ক (২০১০)	সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়	—	অতএব	১২ জানুয়ারি ২০১০; মদুসূদন মঞ্চ	প্রাচ্য	সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়	নাটক (রচনা), নির্দেশনা ও অভিনয় (চরিত্র: সৌমিত্র ১)
রাজা লিয়ার	সুনীল চট্টোপাধ্যায়, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় দেবাশিস মজুমদার	*King Lear* (1608)	William Shakespeare	১৪ নভেম্বর ২০১০; মিনার্ভা থিয়েটার মঞ্চ	মিনার্ভা রোপর্টরি থিয়েটার	সুমন মুখোপাধ্যায়	অভিনয় (চরিত্র: রাজা লিয়ার)

নাটক	নাট্যকার/ অনুবাদক	মূল নাটক/ কাহিনি	মূল নাট্যকার/ কাহিনিকার	প্রথম অভিনয়ের তারিখ ও মঞ্চ	প্রযোজনা	নির্দেশনা	সৌমিত্রবাবুর ভূমিকা
রামায়ণ	?	*রামায়ণ*	মহর্ষি বাল্মীকি	?	ক্যালকাটা পাপেট থিয়েটার	সুরেশ দত্ত	নেপথ্য কণ্ঠদান (ভূমিকা: রাম)
শেষের কবিতা	—	*শেষের কবিতা*	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	রবীন্দ্রসদন মঞ্চ	?	বিকাশ রায়	অভিনয় (ভূমিকা: অমিত রায়)
চলচ্চিত্তচঞ্চরি	—	*চলচ্চিত্তচঞ্চরি*	সুকুমার রায়	?	?	?	নাট্যপাঠ
মালিনী	—	*মালিনী*	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	?	?	?	নাট্যপাঠ
নিরুপম যাত্রা	সৌম্যদেব বসু	?	জীবনানন্দ দাশ	বেতার	আকাশবাণী, কলকাতা	শ্যামল ঘোষ	একক অভিনয় (ভূমিকা: প্রভাত)
তিন বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথা রূপকথা উপকথা	অমর্ত্য মুখোপাধ্যায় ও সৌমিত্র মিত্র	—	—	৩১ ডিসেম্বর ২০১০; রবীন্দ্রসদন মঞ্চ	পূর্ব-পশ্চিম	সৌমিত্র মিত্র	ভাষ্যপাঠ
অলীকবাবু	জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর	—	—	ক্যাসেট	গাথানি	?	নাট্যপাঠ
সংক্রান্তি	?	—	—	ক্যাসেট	CBS		কাব্যনাট্যপাঠ

নাটক	নাট্যকার/ অনুবাদক	মূল নাটক/ কাহিনি	মূল নাট্যকার/ কাহিনিকার	প্রথম অভিনয়ের তারিখ ও মঞ্চ	প্রযোজনা	নির্দেশনা	সৌমিত্রবাবুর ভূমিকা
শেষের কবিতা	?	*শেষের কবিতা*	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	ক্যাসেট	HMV	বিকাশ রায়	অভিনয় (ভূমিকা: অমিত রায়)
আরব্যরজনী	?	?	?	ক্যাসেট	গাথানি	?	?
?	?	*The Threepenny Opera*	Bertolt Brecht & Kurt Weill	বেতার	?	রমাপ্রসাদ বণিক	অভিনয়
বিল্বমঙ্গল ঠাকুর	—	*বিল্বমঙ্গল ঠাকুর*	গিরিশচন্দ্র ঘোষ	?	?	?	নাট্যপাঠ
বাক্স-রহস্য	সত্যজিৎ রায়	*বাক্স-রহস্য*	সত্যজিৎ রায়	বেতার	বিবিধ ভারতী	সত্যজিৎ রায়	অভিনয় (ভূমিকা: ফেলুদা)
গোঁসাইপুর সরগম	সত্যজিৎ রায়	*গোঁসাইপুর সরগম*	সত্যজিৎ রায়	বেতার	বিবিধ ভারতী	সত্যজিৎ রায়	অভিনয় (ভূমিকা: ফেলুদা)
অনিঃশেষ প্রাণ (Life Unending...)	—	—	—	২৫ ফেব্রুয়ারি ২০১১; রবীন্দ্রসদন মঞ্চ	আবৃত্তিলোক ও প্রভা খৈতান ফাউন্ডেশন	সৌমিত্র মিত্র	ভাষ্যপাঠ
রেখো মা দাসেরে মনে	?	—	—	?	অশোক পালিত	সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়	নির্দেশনা ও ভাষ্যপাঠ
একটু সুখের জন্য	?	—	—	?	?	?	নাট্যপাঠ

সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়-রচিত অনভিনীত নাটকের তালিকা

নাটক	সৌমিত্রবাবুর ভূমিকা	মূল নাটক/ কাহিনি	মূল নাট্যকার/ কাহিনিকার
ভুল	নাটক (বাংলায় রূপান্তর)	?	Albert Camus
বৃহন্নলা	নাটক (বাংলায় রূপান্তর)	*The Shadow of a Gunman* (1923)	Sean O'Casey
জন্মান্তর	নাটক (উপন্যাসের নাট্যরূপ)		প্রফুল্ল রায়
বিশ্বাসঘাতক	নাটক (বাংলায় রূপান্তর)	*Betrayal* (1978)	Harold Pinter
খাঁচা	?	?	?
টাইপিস্ট	নাটক (বাংলায় রূপান্তর)	*The Typists* (1964)	Murray Schisgal

তথ্যসূত্র:

১। Michael Patterson, *Oxford Guide to Plays* (Oxford: Oxford University Press, 2nd edn: 2007)

২। বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায় (সম্পা.), *সংসদ বাংলা নাট্য অভিধান* (কলকাতা: সাহিত্য সংসদ, জানু. ২০০০)

৩। সন্ধ্যা দে, *বাংলা নাট্যকোষ* (কলকাতা: প্রতিভাস, ২০১০)

৪। রঞ্জন মিত্র ও অনসূয়া রায় চৌধুরী, 'সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় তথ্য সংকলন', (কলকাতা: চিত্রবীক্ষণ, ২০১০) [*নাটকের নেপথ্যে* ডিভিডি-র সঙ্গে বিনামূল্যে বিতরিত]

৫। অরুণেন্দ্র মুখোপাধ্যায়, *নাম সৌমিত্র* (কলকাতা: অর্কদীপ, ১৯৯৫)

নাট্য-পত্র

প্রিয় পাঠক,

যদিও আমরা বলি যে, *নাট্যকল্প* পত্রিকার বিভিন্ন রচনার মতামতের জন্য সম্পাদক ও প্রকাশক কোনোভাবেই দায়ী নন, তবু একটা দায় বা দায়িত্ব আমাদের থেকেই যায়; সেটা হল লেখকের সঙ্গে পাঠকের সেতুবন্ধন ঘটাবার দায়িত্ব। সেই দায়িত্বপালনের উদ্দেশ্যেই এই নতুন বিভাগের সূচনা করলাম আমরা। নাম দিলাম 'নাট্য-পত্র' (মাঝের হাইফেনের সেতুটা খেয়াল করুন—'নাট্যপত্র' বললে কিন্তু অর্থটাই বদলে যেতে পারে)।

সোজা কথায়, এটা হল পাঠকদের চিঠিপত্রের বিভাগ। তবে বলা বাহুল্য, এখানে যাঁরা চিঠি লিখবেন তাঁরা তো সাধারণ পত্রলেখক হবেন না, তাঁরা হলেন আমাদের *নাট্যকল্প* পত্রিকার বিদগ্ধ ও নাট্যচিন্তক পাঠকসমাজ। তাই আপনাদের **নাট্যকল্পক** নামে সম্বোধন করতে খুব ইচ্ছে করছে। আপনারা রাজি তো?

এই বিভাগ নাট্যকল্পকদের চিন্তাভাবনা ও মতামতের আদানপ্রদান তথা বিতর্কের মঞ্চ (forum) হয়ে উঠুক। ভালো লেখার প্রশংসা শুধু নয়, পত্রিকার উন্নতিসাধনের জন্য যে-কোনো ধরনের সুচিন্তিত সমালোচনাও আমরা সাদরে গ্রহণ করব। ভবিষ্যতে পত্রিকাটির শ্রীবৃদ্ধি কীভাবে ঘটতে পারে সে-ব্যাপারেও আপনাদের মতামত আমরা প্রার্থনা করি। কী-কী প্রচ্ছদকাহিনি আপনারা দেখতে চান, জানাতে ভুলবেন না সেটাও।

প্রথম চিঠি লেখার ভার সম্পাদককেই নিতে হল। এরপর থেকে আপনারা যে নিজেরাই সফল করে তুলবেন 'নাট্য-পত্র' নামক মঞ্চটিকে, সে-বিশ্বাস আমাদের পুরোমাত্রায় আছে।

ভালো থাকবেন।

সম্পাদক

নীচের ঠিকানায় চিঠি পাঠান:

Editor,
Nâṭyakalpa
(a theatre magazine published by Kalyani Kalamandalam)
B-6/98, Kalyani.
PO: Kalyani 741 235.
Dist: Nadia.
State:West Bengal.
INDIA

অথবা বৈ-পত্র (email) পাঠান:

ed.natyakalpa.kk@gmail.com

নাট্যকল্প পত্রিকায় ব্যবহৃত শব্দাবলির বানানরীতি এবং অন্যান্য ব্যবহারবিধি

আমাদের পত্রিকার আগের সংখ্যার 'সম্পাদকীয়'-তেই স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছিল, "বাংলা বানান নিয়ে আমাদের যথেষ্ট অতৃপ্তি ছিল, কারণ এখনও পর্যন্ত একাধিক বানানরীতি সমান্তরালভাবে ও সযত্নে তাদের অস্তিত্ব রক্ষা করে চলেছে। বানানের এই বৈষম্য দূর করার উদ্দেশ্যে আমরা মূলত অনুসরণ করেছি পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি—অনুমোদিত বানানবিধি; অর্থাৎ একটি আধুনিক নাট্যপত্রিকার বানানের ক্ষেত্রেও আমরা যথাসম্ভব আধুনিক হতে চেষ্টা করেছি। কিছু ক্ষেত্রে অবশ্য সামান্য ব্যতিক্রমও ঘটেছে।" এবার আর-একটু সাহস সঞ্চয় করে আমরা এইসব ছড়িয়ে-ছিটিয়ে-থাকা নিয়ম ও বেনিয়মগুলোকে পাঠক, লেখক, মুদ্রক ও সম্পাদকের সুবিধার্থে জড়ো করে একটা পাকাপোক্ত রূপ দেওয়ার চেষ্টা করলাম:

- প্রয়াত লেখকদের লেখা পুনর্মুদ্রণের ক্ষেত্রে আমরা ঐতিহাসিকতা বজায় রাখার প্রয়োজনে অবশ্যই তাঁদের ব্যবহৃত পুরোনো বানানরীতি হুবহু রক্ষা করব। এমনকি, পূর্বে প্রকাশিত এইসব লেখার ক্ষেত্রে কোনো মুদ্রণপ্রমাদ থাকলেও আমরা তা সংশোধন করার কোনো চেষ্টা করব না, কারণ বাংলা সাহিত্যের প্রামাণ্য দলিল হিসাবেই এগুলি বিবেচিত হবে।
- বর্তমান লেখকদের বাংলা লেখার ক্ষেত্রে আমরা সামান্য কিছু ব্যতিক্রম-সহ মূলত আকাদেমি-অনুমোদিত বানানরীতি অনুসরণ করব। উল্লেখ্য, এঁদের পূর্বে প্রকাশিত লেখা পুনঃপ্রকাশের ক্ষেত্রেও আমরা প্রয়োজনীয় সম্পাদকীয় পরিমার্জনা করব।
- বিদেশি শব্দের বাংলা বানানের ক্ষেত্রে যথাসম্ভব মূলানুগ উচ্চারণ বজায় রাখার চেষ্টা করা হবে, আকাদেমি-প্রস্তাবিত বানান অগ্রাহ্য করেই।
- ব্যক্তিনামের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির নিজস্ব লিখনরীতিই অনুসৃত হবে। তাই 'ভট্টাচার্য', 'চক্রবর্তী', 'মুখার্জি', 'ভাদুড়ি', 'চৌধুরি', ইত্যাদি আধুনিক বানানের পাশাপাশি 'ভট্টাচার্য্য', 'চক্রবর্ত্তী', 'মুখার্জী', 'ভাদুড়ী', 'চৌধুরী', ইত্যাদি পুরোনো ধরনের বানানও চোখে পড়তে পারে পাঠকদের। শুধু তাই নয়, বাংলা ও ইংরেজি নামের বানানের ক্ষেত্রেও আমরা ব্যক্তির নিজস্ব পছন্দকেই নিখুঁতভাবে রক্ষা করার ব্যাপারে সচেষ্ট থাকব। তাই 'রায়চৌধুরী' ও 'রায় চৌধুরী', 'চট্টোপাধ্যায়' ও 'চ্যাটার্জি', 'বসু' ও 'বোস', 'Mookerjea' ও 'Mukhopadhyay' 'Santanu' ও 'Shantanu', 'দেবাশীষ' ও 'দেবাশিস', 'সিংহ' ও 'সিনহা', ইত্যাদি বানান-প্রভেদ সতর্কভাবে রক্ষিত হবে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, অবাঙালি ভারতীয় নামের বাংলা বানানের ক্ষেত্রেও মূলানুগ বানান ব্যবহৃত হবে। তাই বাঙালির-চোখ-সওয়ানো 'বংশী কল', 'প্রতিভা আগরওয়াল', 'গিরিশ কারনাড', ইত্যাদি নয়, বিখ্যাত এই নাট্যব্যক্তিত্বদের নামের বানান তাঁদের নিজস্ব লিখনরীতি অনুযায়ী 'বংসী কৌল', 'প্রতিভা অগ্রবাল', 'গিরীশ কার্নাড', ইত্যাদি লেখা হবে।
- ভারতীয় স্থাননামের ক্ষেত্রে অবশ্য আমরা আকাদেমি-প্রস্তাবিত আধুনিক বাংলা বানানই ব্যবহার

করেছি। তাই 'দিল্লি' ('দিল্লী' নয়), 'গোয়ালিয়র' ('গ্বালিয়র' নয়), 'নদিয়া' ('নদীয়া' নয়), ইত্যাদি বানান লেখা হবে।

- লেখকের গল্প বলার ঢং (style) অক্ষুণ্ণ রাখার উদ্দেশ্যে অনেক কথ্য শব্দের ব্যবহারের ক্ষেত্রে বানানবিধির রক্তচক্ষুর বাইরে যেতে চাই আমরা। সেই কারণে 'অভ্যেস', 'হিসেব', 'মধ্যে দিয়ে', 'করবার', 'সাথে', 'দেয়া', 'মধ্যে থেকে', 'জন্যে', 'ভেতর', 'বয়েস', 'বাচ্ছা', 'ওপর', 'পেছন', প্রভৃতি অনেক অস্বীকৃত (nonstandard) শব্দের ব্যবহারে আমরা নিষেধাজ্ঞা জারি করব না। লেখককে এটুকু স্বাধীনতা সাহিত্যের স্বার্থেই দেওয়া উচিত বলে আমাদের বিশ্বাস।
- মূলত আকাদেমি-অনুমোদিত বানানবিধি অনুসরণ করলেও আমরা যুক্তবর্ণের ক্ষেত্রে আকাদেমি প্রস্তাবিত স্বচ্ছ (transparent) হরফ ব্যবহার করে উঠতে পারিনি উপযুক্ত সফ্‌টওয়্যারের অভাবে। তাই যুক্তবর্ণের প্রচলিত অস্বচ্ছ রূপই আপাতত ব্যবহৃত হচ্ছে।
- ইংরেজি বানানের ক্ষেত্রে মূলত ব্রিটিশ ইংরেজি (এবং কোনো-কোনো ক্ষেত্রে মান্য ভারতীয় ইংরেজি) অনুসৃত হবে।
- বিজ্ঞাপনের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত বানান, ভাষা ও তথ্যের ভ্রান্তির জন্য প্রকাশক বা সম্পাদক কোনোভাবেই দায়ী নন, কারণ এক্ষেত্রে বিজ্ঞাপনদাতা-প্রদত্ত হুবহু প্রতিলিপিই ব্যবহৃত হবে।

শেষে একটি অনুরোধ—ভবিষ্যতে এই পত্রিকায় যাঁরা লেখা পাঠাবেন তাঁরা যদি উপরে বর্ণিত বানানরীতি ও ব্যবহারবিধি অনুসরণ করেন তাহলে আমাদের কাজটা অনেক সহজ হবে, পত্রিকার প্রকাশও ত্বরান্বিত হবে।

University of Kalyani

DIRECTORATE OF OPEN & DISTANCE LEARNING

B-12/195, Kalyani 741 235

Phone: (033) 2502 2213, Fax: (033) 2502 2212

Websites: www.dodl.klyuniv.ac.in; www.klyuniv.ac.in

The Directorate of Open & Distance Learning, University of Kalyani offers the following courses:

1. **Two-year postgraduate degree courses**
   Bengali, English, History, Education, and Public Administration. Eligibility: Hons/Spl Hons/3-year general (incl. bridge-course) graduates having at least 300 marks in the relevant sub., or (for Education only) graduates with B,Ed.
2. **One-year postgraduate diploma courses**

(a) Environmental Mgt. Eligibility: 3-year graduates in science

(b) Mass Comm. & journalism, Cultural Tourism & Folklore, and Computer Applications. Eligibility: 3-year graduates in any discipline

3. **One-year bridge courses**
   Bengali, English, History, and Political Science. Eligibility: 2- graduates in the relevant sub., or (for Education only) graduates with B,Ed.

Courses offered at the headquarters:

PG dip. and M.A. in Pub. Admn

Courses offered at the study centres:

2-year PG deg. (except M.A. in Pub. Admn) and 1-year bridge courses

Names & addresses of the study centres:

Dwijendra Lal College, Krishnanagar 741 101, Nadia. Ph: (03472) 255 2240 * Haringhata Mahavidyalaya, Subarnapur, Nadia. Ph: (03473) 23 3318 * srikrishna College, Bagula 741 502. Ph; (0342) 27 0543 * RKVM Sarada Maa Girls' College, Talikhola, Barasat 700 124. Ph: 6519 6590/2524 1835 * Kanchrapara College, Kanchrapara 743 145, N. 24-Pgs. Ph: 2585 5159 * Dr B.R. Ambedkar College, Betai 741 163, Nadia. Ph: (03472) 25 4110 * S.R. Fatepuria College, Beldanga 742 133, Murshidabad. Ph: (03482) 26 4040/26 6323 * Dinabadhu Mahavidyalaya, Bangaon 743 235, N. 24-Pgs. Ph: 94332 61927 * Dum Dum Motijheel Rabindra Mahavidyalaya, 208/B/2 Dum Dum Rd, Kol 700 074. Ph: 2551 5921 * Nabadwip Vidyasagar College, Pucatola Rd, Nabadwip 741 302, Nadia. Ph: (03472) 24 0014/92327 05205 * Acharya P.C. College, New Barrackpore, Kol 700 131, N. 24-Pgs. Ph: 2537 3297/8797 * Berhampore College, 20 C.R. Das Rd, Berhampore 742 101, Murshidabad. Ph: 94743 19266 * Kayani Mahavidyalaya, City Centre Complex, Kalyani 741 235, Nadia. Ph: 2582 1390 * (only for Env. Mgt and Comp. Appl.) Employees Devt Centre, NTPC Ltd, Farakka, Pubarun 732 215, Malda. Ph: (03512) 22 4259/22 8232

Prof. J.K. Sarkhel
Director, DODL

NĀṬYAKALPA–3 • MARCH 2011 • KALYANI KALAMANDALAM, a theatre group registered under the West Bengal Societies Registration Act 1961 (registration no.: S/92162 of 1998–99) • INR 120.00 / BDT 170.00

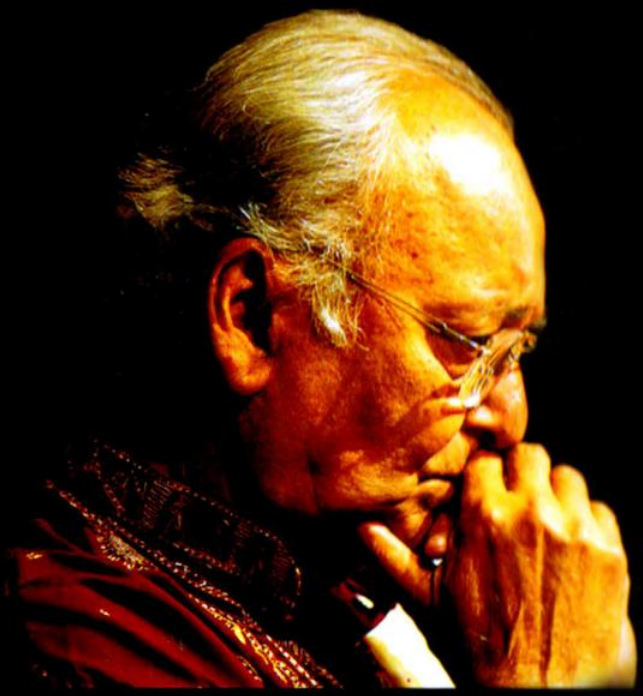

COVER STORY

Soumitra in the Theatre

Published by Santanu Das, Secretary, Kalyani Kalamandalam, B-6/98, Kalyani 741 235, West Bengal, and printed at Gita Printers, 51A Jhamapukur Lane, Kolkata 700 009

EDITOR **Anirban De**